পরিবর্তন

২২-২৮ জুন ১৯৮৮



হাওড়া ব্রিজের বিপর্যয়ের আগে হুগলি ব্রিজের কাজ শেষ হবে কি ?

গ্যাটিং কেচ্ছা

ভারতীয় ক্রিকেটাররাও পিছিয়ে নেই





বিবাহিত নারীপুরুষের ব্রহ্মচর্য আন্দোলন

ভাংগনের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছে সি পি আই (এম) ত্রিপুরা সরকারকে



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

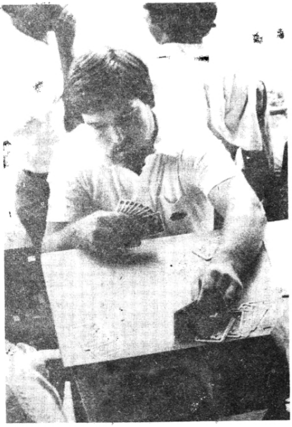
একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন ।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পরিবর্তন

২২-২৮ জুন ১৯৮৮, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৩২
প্রতি সংখ্যা ৪.৫০ টাকা
বিমান মাসুল : পূর্বাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ২৫ পয়সা



এই সংখ্যায়

প্রচ্ছদ : অরুণ চট্টোপাধ্যায়
রঙিন ফটো : মাইক গ্যাটিং: অচিন্ত্য রায়
হাওড়া ব্রিজ: সৌগত রায় বর্মন

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সেন্টার-টেবিলে বিশ্ব

কৃত্রিম উপগ্রহ কারিগরি-কৌশলে সমস্ত বিশ্ব এখন আপনার দূরদর্শনের পর্দায় – শুধু চাবি ঘোরানোর অপেক্ষায়। কিন্তু দূরদর্শনের ছবির মিছিল তাৎক্ষণিক। আপনার প্রয়োজনের এই মুহূর্তে বিশ্বের ধমনীর গতি স্থায়িভাবে রেকর্ড করে সুদৃশ্য পাতার মোড়কে

পরিবর্তন



আপনার ড্রইং রুমের সেন্টার টেবিলে। পাতা উল্টে দেখুন....

....আসল ব্যাপারটা কী ?

প্রাত্যহিক প্রভাতী সংবাদপত্রে সংবাদের মিছিল। সংবাদপাঠের পর আপনার তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু মনে জাগে অতৃপ্তি। আপনার মনে হয় এসব তো ঘটনার রিপোর্ট মাত্র। ঘটনাটা ঘটল কেন ? আড়ালে আসল ব্যাপারটা কী? যেমন ধরুন, কলকাতা এবং আশেপাশের বাজারগুলি একের পর এক আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। এ খবর আপনি জানেন। কিন্তু পুড়ে কেন যাচ্ছে জানেন কি? 'পরিবর্তন' উল্টে দেখুন, ঘটনার নেপথ্যে ঘটনার অন্তর্তদন্তমূলক দুঃসাহসী প্রতিবেদন।

মাসের শেষে সাড়ে তিন টাকা কেজি

মাসের শেষে সারা মাসের সংবাদপত্রের স্তূপকে আপনার মনে হয় জঞ্জাল। তখন ডাক পড়ে কাগজওয়ালার। সাড়ে তিন টাকা কেজি দরে সে আপনার জঞ্জাল সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 'পরিবর্তন' আপনার সেন্টার টেবিল থেকে ঢুকে যাবে বইয়ের আলমারিতে – সপ্তাহের পর সপ্তাহ – মাসের পর মাস – বছরের পর বছর। কারণ 'পরিবর্তন'-এ প্রকাশিত হাজারো তথ্য যে কোন সময় আপনার প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে।

রাজীব গান্ধী ও ফুলগ্রামের নীলিমা সোম

রোনাল্ড রেগন, মিখাইল গর্বাচেভ, রাজীব গান্ধী সংবাদের কেন্দ্রে। যে কোন সংবাদ সাময়িকীর মত 'পরিবর্তন'-এও এঁদের জন্য ব্যয়িত হয় পাতার পর পাতা – কিন্তু আমরা মনে করি – এই জটিল সময়ে, এই সব রথী-মহারথীদের পাশাপাশি জীবনযুদ্ধের অতি সাধারণ যোদ্ধারও জীবনকথা না বলা হলে একটি সাময়িকপত্র সম্পূর্ণ হয় না। তাই ফুলগ্রামের নীলিমা সোমের কথা এখানে স্থান পায় সমমর্যাদায় রাজীবের পাশাপাশি। তাতে রাজীব গান্ধী যাই মনে করুন না কেন।

'পরিবর্তন' অপরিবর্তনীয়

আর তাই 'পরিবর্তন' অপরিবর্তনীয়। আপনি একবার 'পরিবর্তন' পড়া শুরু করলে আর অন্য কোনো কাগজে আপনার পাঠাভ্যাস পরিবর্তন করতে পারবেন না। যে কোনো সংখ্যা থেকেই পড়া শুরু করে দেখুন না কেন!

অথ চৈনিক মৎস্য কথা



বামফ্রন্টের মেজো শরিক ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম নেতা ভক্তিভূষণ মন্ডল দীর্ঘদিন এই রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং তাঁর মৎস্য-জ্ঞান কম, এই অপবাদ দেওয়া যায় না। গভীর সমুদ্র থেকে ডোবাজাত তাবৎ মাছের নাড়ি নক্ষত্র তাঁর নখদর্পণে। সুতরাং মাছ সম্পর্কিত কোন ভুল তথ্য পরিবেশন করে তাঁর কাছে পার পাওয়া যায় না। তা সে তথ্য দেশের মাছ সম্বন্ধেই হোক আর বিদেশের মাছ সম্বন্ধেই হোক। সম্প্রতি তেমন একটি ঘটনাই ঘটেছে। মাছ সম্পর্কিত একটি তথ্য তাঁকে উত্তেজিত করে দিয়েছে। সে মাছ অন্য দেশের হলে কথা ছিল না, খোদ চীন দেশের মাছ। চীন সম্পর্কেও ভক্তিবাবুর রয়েছে একেবারে যাকে বলে 'প্রথম হাত অভিজ্ঞতা'। কারণ তিনি দীর্ঘদিন ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির সভাপতি হওয়ার সুবাদে নিদেনপক্ষে চারবার চীনে গেছেন। সুতরাং চৈনিক মাছ সম্বন্ধেও যে ভক্তিবাবুর জ্ঞানের কোন ঘাটতি আছে এমন অপবাদও দেওয়া যাবে না। সুতরাং চৈনিক মাছের বিষয়ে কোন তথ্যকে তিনি যদি চ্যালেঞ্জ জানান তাহলে ধরে নিতে হবে তার মধ্যে সারবস্তু রয়েছে।

এবার ঘটনার বিস্তারে আসা যাক। রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চীন থেকে ফিরে রাজ্যের সাংবাদিকদের সামনে চীনের এক পদ রান্নার কথা সবিস্তারে বলেছেন। রান্নাটি মাছের। এবং রান্না করা মাছেরও নাকি মাথা নড়ছিল। এই সুস্বাদু রান্নার পদটি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকেও পরিবেশন করা হয়েছিল। কিন্ত তিনি সেটা খেতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেববাবু খেয়েছেন এবং সাংবাদিকদের কাছে সেই রান্নার তারিফ করেছেন। ব্যস, এই পর্যন্তই।

এই রান্নার কথা শুনে রাজ্যের প্রাক্তন মৎস্যমন্ত্রী রীতিমত হম্বিতম্বি শুরু করলেন। কারণ এটা তাঁর এক্তিয়ারে পড়ে। দীর্ঘদিন তিনি মৎস্যসঙ্গ করেছেন। তাই অবলীলাক্রমে তিনি বলে দিলেন, 'এটা গপ্পো ছাড়া কিছু নয়। রান্না করা মাছেরা যদি নড়ে তাহলে তো মেঘনাদের কাটা মুন্ডও কথা বলে'।

বুদ্ধদেববাবু অবশ্য এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য করেননি। বা ভক্তিবাবুকে অভক্তি করে কোন বিবৃতিও দেননি। সুতরাং এখন পর্যন্ত এক তরফাই চলছে। বুদ্ধদেব হয়ত বা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করছেন। কারণ ঘটনাটির একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এখন দেশের বাইরে। তিনি ফিরে এলে ভক্তিবাবুর অভিযোগের উত্তর দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিচার বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসার পর তিনিও যদি রান্না করা মাছের মাথা বা ঠোঁট নড়ার কথা বলেন তখন ভক্তিবাবু কি বলবেন ? তখনও কি তিনি বলবেন, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী,এটা গপ্পো ছাড়া কিছু নয়'। নাকি বলবেন, তথ্যমন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করতে পারিনি, আপনি বলেছেন বলেই বিশ্বাস করলাম।

সে যাই হোক। ভক্তিবাবু অন্য একটা ব্যবস্থাও হয়ত করতে পারেন। তাহল তাঁর দলের পাঁচ নেতা চীনে গেছেন। তাঁদের হয়তো ভক্তিবাবু বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন এই বিশেষ রান্না সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে। ঐই নেতারা চীন থেকে ফেরার পর হয়তো ভক্তিবাবু আবার মুখ খুলবেন। তবে তাঁর দলের লোকরাও যদি ঐ মাছের রান্না খেয়ে আসেন তাহলে অবশ্য তিনি আর মুখ খুলবেন বলে মনে হয় না।

আমরা বলি কি, মন্ত্রীতে-মন্ত্রীতে এ ধরনের বাগযুদ্ধ ঠিক নয়, শোভনও নয়। এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। কারণ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সামান্য একপদ রান্না নিয়ে পরস্পরকে এভাবে আক্রমণ করবেন, এটা জনগণ আশা করে না। জনগণ আশা করেন, মন্ত্রীরা তাঁদের কষ্ট লাঘব করবেন, সমস্যার সুরাহা করবেন। তার বদলে মন্ত্রীরা যদি এরকম বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করেন তাহলে তো কপাল চাপড়ান ছাড়া জনগণের আর কিছু করার থাকে না। রাজ্যের জনগণ নিশ্চয়ই এই বিষয় নিয়ে এখানে ওখানে প্রচুর মুখরোচক আলোচনা করছেন। তা করুন। আমাদের কিছু বলার নেই। কারণ মন্ত্রীই সেই সুযোগ করে দিয়েছেন।

আমাদের বলার কথা অন্য। তা হল, মন্ত্রিসভার আলোচ্য বিষয়বস্তু ঠিক করে দেওয়ার কোন এক্তিয়ার আমাদের নেই। সেই এক্তিয়ার থাকলে আমরা বলতাম রাজ্যের মন্ত্রিসভার পরবর্তী সভায় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন। মন্ত্রীরা বিশদ ভাবে আলোচনা করে, তথ্য-প্রমাণ পরীক্ষা করে এবং সাক্ষী সাবুদ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন রাজ্যের জনগণ নির্বিবাদে সেটা মেনে নেবেন। আমরাও এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন তুলব না।

এছাড়া আর তো কোন উপায় আমরা দেখছি না। রাজ্যে যখন আর কোন সমস্যা নেই, সমবায় মন্ত্রী ভক্তিভূষণের যখন হাতে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নেই তখন মন্ত্রিসভার অধিবেশন ডেকেই ঠিক করা হক চীনে তথ্যমন্ত্রীর পাতে দেওয়া মাছের মুড়ো বা ঠোঁট সত্যি নড়েছিল কি না। তবে হ্যাঁ সেখানে চীনের একজন প্রতিনিধিকে রাখা অবশ্যই দরকার। নতুবা এই সামান্য ব্যাপারটাই হয়ত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তখন কি কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারকে ছেড়ে কথা কইবে ?

পুলিশ আজও বিশৃঙ্খল কেন ?



২৫ – ৩১ মে সংখ্যায় পরিবর্তনের প্রচ্ছদ কাহিনীতে 'সরকারি বদান্যতা সত্ত্বেও পুলিশ বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা ও পুলিশই পুলিশকে ঘুষ দেয়' প্রতিবেদনটি পড়ে খুব ভাল লাগল। আমি একজন সাধারণ পুলিশ কর্মী হয়ে বলতে চাই পুলিশ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা সত্য। ঘুষ খোর দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ কিছু পুলিশ অফিসার আছেন, যারা টাকার লোভে ঘুষের লোভে দিনকে রাত করতে সবসময় ব্যস্ত। অধিকাংশ পুলিশ অফিসারের নামে বেনামে বাড়ি-গাড়ি ও নানারকম ব্যবসা আছে। এ ব্যাপারে জ্যোতিবাবুর কি কিছুই করার নেই ? তার শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার এই কি নমুনা অবশ্য জ্যোতিবাবুকে পুলিশের স্বার্থ দেখতেই হবে। কারণ পুলিশকে তার পার্টির স্বার্থে ব্যবহার করতে হচ্ছে। সি পি আই এম-এর স্বার্থ নষ্ট হলে সে যত বড় সৎ পুলিশ অফিসার হোক না কেন, তার কোন দাম নেই। তাকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। একটি ছোট উদাহরণ দিচ্ছি। শিলিগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নূরুল ইসলাম অত্যন্ত সৎ ছিলেন। কিন্তু দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় সি পি আই এম-এর স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় তাকে বদলী হতে হল।

দেবাশিস বসু

বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি

■

'সরকারি বদান্যতা সত্ত্বেও পুলিশবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা' শিরোনামে বিশেষ প্রতিনিধির প্রতিবেদনটি এককথায় জ্বলন্ত দলিল। যা পড়ে পুলিশ বিভাগের কানা চোরা পথের অনেক গল্প জানা গেল।

এ রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষ রাজ্য সরকারের ১৯৮৭-৮৮ বাজেট ২০৫ কোটি টাকার শান্তি প্রশাসন বাহিনীটির উপর দীর্ঘদিন ধরে আস্থা হারিয়েছেন আর তাই তাঁরা বিচারের জন্য গণপিটুনির রাস্তা বেছে নিয়েছেন। গত মে মাসের মাঝামাঝি ২৪ পরগনার তালদিতে জনরোষের বলি হয়েছে ছয় ডাকাত। আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে ১৯৮৫ সালে ডায়মন্ডহারবারের কাছে নেত্রাহাটে গণধোলাইয়ের বলি হয়েছিল এগারজন। আজ পর্যন্ত এই ঘটনার সর্বকালীন রেকর্ড। কিন্তু প্রশ্ন করি, কেন এই ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ? কেন আজ সাধারণ মানুষ আইনের রক্ষাকর্তাদের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছেন ? গত এগার বছরে পুলিশ জনগণের বন্ধু আখ্যা পেলেও তারা কিন্তু জনসাধারণের প্রকৃত বন্ধু হতে পারেননি। গ্রাম ও শহরে চোর, ডাকাত বা চোরাচালানকারীদের সংগেই পুলিশের বেজায় ভাব। তাই সাধারণ মানুষ গণ পিটুনির আশ্রয় নিয়েছেন। আজও পুলিশ ক্রিমিনালদের হাতে পায় মৃত অবস্থায়।

মানব বিশ্বাস

শংখনগর, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি

কমিউনিস্ট আন্দোলন

'ভাঙনই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের নিয়তি ?' শীর্ষক লেখাটি সময়োপযোগী। লেখক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেক অজানা তথ্য পরিবেশন করেছেন।

লেখক প্রবাসে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির উল্লেখ করেছেন। মেক্সিকো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি অঞ্চলের কথা বলেছেন। এদের নেতাদের মধ্যে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু এই দু নেতার কর্মস্থল ছিল 'বার্লিন' সেটা লেখা থেকে বাদ গেছে। এটা বোধহয় লেখকের অনবধানতাবশত বলেই মনে হয়।

এম এন রায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কর্মকৌশল প্রসংগে তিনটি প্রধান দলিল তখনকার কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাছে দাখিল করেছিল বলে উল্লেখ আছে। লেখক এই তিনটি দলিল নিয়ে যদি বিশদভাবে আলোচনা করতেন, তাহলে আমার মত অনেক পাঠকই উপকৃত হত বলে মনে হয়। এছাড়া এম এন রায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের যদি একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই লেখায় উল্লেখ থাকত তাহলে মন্দ হত না। ভবিষ্যতে লেখক এ বিষয়ে আমাদের আরো অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

মাদল কর

কলকাতা-১২

পাপকে নয় পাপীকে ঘৃণা করা উচিত

২৫ মে, পরিবর্তনে প্রকাশিত 'বিহারে পাঁচ ছাত্রী ধর্ষিতা ! শিক্ষকরা ফেরার' শীর্ষক সংবাদটি নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আপাদমস্তক লজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। বিহার সরকারের উচিত এইসব তথাকথিত শিক্ষিত পাঠাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা। শিক্ষার আলো যাদের অন্তরের অন্ধকারকে দূর করতে পারেনি সেইসব পাপী মূঢ়রা যেভাবে রাজনৈতিক দাদাদের প্রশ্রয় পাচ্ছে তা নিন্দনীয়।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, পাপকে ঘৃণা করো পাপীকে নয়। আমার মতে, পাপকে নয় পাপীকেই ঘৃণা করা উচিত। কেন না কেউ জেনে শুনে যদি পাপ করে তাকে ঘৃণা করাই সমীচীন। অতএব শিক্ষাব্রতীর ভেকধারী এইসব পাপীদের ক্ষমা করার কোনো প্রশ্নই আসে না। বরং সমাজ জীবনে এদের একঘরে করাই হলো উচিত শাস্তি।

মিঠু মাইতি

কলকাতা ৩৮

পুঁজিবাদের নয়া কৌশল

পুঁজিবাদ তার শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্য নূতন কৌশল অবলম্বন করছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ঘোষণার মধ্যে দিয়ে শাসকশ্রেণী সে দেশে অন্যধর্মাবলম্বি মানুষদের মধ্যে বিভেদের বীজ রোপণ করলেন। শোষিত মানুষ যাতে শোষণের বিরুদ্ধে এক হয়ে লড়াই করতে না পারে, তার জন্য-ই বোধহয় এই ঘোষণা। বাংলাদেশে কি অন্য কোনো সমস্যা নেই ? অভাবের তাড়নায় মানুষ যখন কাতারে কাতারে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসছেন তখন এমন কি প্রয়োজন পড়ল এরশাদ সরকারের যে, ইসলাম ধর্মকে স্বীকৃতি দিতে হলো ? যেখানে স্বাধীনতার তের বছর পরও অন্নের জন্য মানুষকে দেশ ছেড়ে চলে আসতে হয়, সেখানে আর যাই হোক ধর্মের দ্বারা শোষণ মুক্ত করা সম্ভব নয়।

মাধাই দাস

বজবজ, ২৪ পরগনা দক্ষিণ

কত বিষ খাচ্ছেন রোজ?

পরিবর্তনে অদ্রীশ বর্ধনের 'কত বিষ খাচ্ছেন রোজ?' পড়তে গিয়ে অবাক হলাম। কেন না এই লেখাটি ১৯৮৭ সালের ৬ জুন 'পুরশ্রী' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি দ্বিতীয়বার পড়ে বিস্মিত হলাম। শুধু বিষয়বস্তু-ই নয়, কোন কোন জায়গায় তার হুবহু নকল বেশ বিরক্তিকর। 'পুরশ্রী' থেকে ১১টি খাদ্য রং হুবহু টুকে দেওয়া, এমন কি 'পুরশ্রী'র ভুল বানান (অথবা misprint! 'First Red')টি পর্যন্ত ভয়ানক দৃষ্টিকটু। পুরশ্রী বর্ণিত ১৯৭২ সালের ভেজাল সর্ষের তেল খাওয়ার দরুন মৃত্যুর উদাহরণটি বাদ যায়নি। ক্রেতাদের অর্থাৎ পাঠকদের এভাবে বঞ্চিত করছে কেন আপনাদের পত্রিকা? 'পুরশ্রী' ও 'পরিবর্তন' দুটোই তো আলাদা করে কিনতে হয়? এবং তা নির্ভেজাল পয়সায়। ১৯৮৭-র পুরশ্রীর পুরোন লেখাটি পরিবর্তনে কেন পড়তে হবে পাঠকদের? তাহলে 'পরিবর্তন' নামের সার্থকতা কোথায়?

নার্গিস সাত্তার
কলকাতা-১৪

প্রতিবেদকের বক্তব্য

'কত বিষ খাচ্ছেন রোজ' নিবন্ধটি লেখবার আগে নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলীর জন্যে গেছিলাম কলকাতা পৌরসংস্থার পাবলিক অ্যানালিস্ট শ্রীকমলকুমার সেনগুপ্তর কাছে। উনি এবং ওঁর সহকর্মী শ্রীপ্রদোষকুসুম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত আগ্রহের সংগে বিস্তর তথ্য এবং ঘটনা আমাকে বলে গেছিলেন যা আমি লিখে নিয়েছিলাম। আমার শোনার এবং লেখার ভুলে যাতে রচনার মধ্যে প্রমাদ না থেকে যায়, তাই মুদ্রিত কাগজপত্র চাইতে উনি আমাকে পরের দিনই দিয়েছিলেন 'কলকাতা পুরশ্রী' আর 'দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর দুটি সংখ্যা যার মধ্যে প্রকাশিত ওঁর দুটি প্রবন্ধ থেকে প্রয়োজন মত তথ্য এবং ঘটনা আমি গ্রহণ করতে পারি – এই মৌখিক অনুমতিও উনি আমাকে দিয়েছিলেন।

তথ্যসমৃদ্ধ রচনা পরিবেশন করতে গিয়ে নির্ভুল তথ্যের জন্যে একাধিক পত্রিকা এবং কোষগ্রন্থের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। যেমন, আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির নাম উল্লেখ করেছি কার্টুন চিত্রের পাশে। কমলবাবুর নাম একাধিকবার টেনে এনেছি রচনার মধ্যে। লেখাটা শুরু হয়েছে কমলবাবুর কথা দিয়ে এবং শেষও হয়েছে কমলবাবুর দেওয়া খবর দিয়ে। মাঝেও অনেক প্রশ্নের জবাব যে উনিই দিয়েছেন ওঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আর প্রগাঢ় জ্ঞান থেকে একাধিকবার নামোল্লেখ করে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

কিছু তথ্য আমার নিজের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া। কিছু অন্য সূত্রে পাওয়া। বানান বিভ্রান্তির জন্যে আমি দুঃখিত। ১১টি খাদ্য রঙ-এর তালিকা পেয়েছি কেবল 'কলকাতা পুরশ্রী' পত্রিকাতেই – জনস্বার্থে তার অনুলিপি দিয়েছি। ঘটনা এবং তথ্যের অনুবৃত্তি এই কারণেই ঘটেছে। শ্রীমতী নার্গিস সাত্তার প্রকৃতই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারিণী বলে এবং পাঠ্যবস্তুর গভীরে প্রবেশ করতে পারেন বলেই এগুলিকে নজরে আনতে পেরেছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। 'First Red'এর সঠিক বানানটি কিন্তু উনি জানাননি। এটি হবে "Fast Red" জানালেন প্রদোষবাবু।

ডাইনি সন্দেহে অত্যাচার চলছে

২৫ – ৩১ মে সংখ্যায় ডাইনি নিয়ে সারাদাপ্রসাদ কিসকুর প্রতিবেদনটি পড়লাম শ্রীকিসকু নিজ সম্প্রদায়ের কুসংস্কারমূলক দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করতে প্রয়াসী হয়েছেন দেখে খুশী হলাম।

আমাদের বেলপাহাড়ী, বিনপুর এলাকায় আজও শত শত নিরপরাধ মহিলার উপর ডাইনি সন্দেহে ব্যক্তিগত স্বার্থে নির্দ্বিধায় অত্যাচার চালাতে দেখেছি। এ জিনিসটা মাহাতোদের মধ্যে অনেকখানি থাকলেও আদিবাসীদের মধ্যে প্রবল। আর, এ ব্যাপারে মাহাতোদের কিছু বলা গেলেও আদিবাসীদের কিছুই বলা যায় না। কারণ, ধর্মীয় রীতি-নীতি তাঁদের কঠিন – কঠোর।

চিত্ত মাহাতো
আশাকাথি, ঝাড়গ্রাম

বাকরুদ্ধ নজরুলকে জানতে চাই

২৫ – ৩১ মে পরিবর্তনে নজরুল স্মরণে বিনয় চৌধুরীর লেখাটি পড়লাম। বহু অজানা তথ্যদানে লেখককে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ নজরুল আকাদেমির কর্তৃপক্ষকে। এদেশে কিছু আদর্শ ও নিরপেক্ষ লেখক ও পত্রপত্রিকা ছাড়া প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নজরুল অবহেলিত।

নজরুল সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু করার চেষ্টা করি, অনেক কিছু ভাবি, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমরা একটা বিষয়ে কোন চিন্তা বা গবেষণা চালাই না। সেটা হল কী কারণে তিনি বাকরুদ্ধ হলেন বা সেন্সলেস হলেন? এর পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়া ছিল নাকি ষড়যন্ত্র ছিল? এ বিষয়ে কোন গবেষক চেষ্টা চালাচ্ছেন কিনা কে জানে?

আমজাদ আলি হালসানা
হাটখোলা, মহেশখোলা, নদীয়া

মন্ত্রীর চেয়ে সভাধিপতি, পঞ্চায়েত প্রধানের ক্ষমতা কম নয়

নিশীথ দে

রাজ্য প্রশাসন চলছে এখন সি পি আই (এম)-এর বকলমে কো-অর্ডিনেশন কমিটি আর শিক্ষক সংগঠনের দাপটে। সি পি আই (এম)-এর অবস্থা প্রায় রবার স্ট্যাম্প।

সরকারি অফিসে যিনি কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা, পাড়ায় তিনিই ডাকসাইটে যুব নেতা বা পার্টির নেতা। স্কুলে শিক্ষক, পাড়ায় তিনিই পার্টির জবরদস্ত নেতা, পুরসভা বা পঞ্চায়েতে তিনিই কর্মকর্তা। স্কুল বোর্ডে তিনিই বিধাতা।

সরকারি অফিসে যেমন হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট আর সেকশন অফিসাররা ফাইল তৈরি করে দেন আর ওপরওয়ালারা সই করে দেন, ঠিক তেমনি অবস্থা পার্টিতে। পার্টির মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি-দের ডানা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। সব ক্ষমতা কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পঞ্চায়েত আর পুরসভার হাতে।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হবার পর নয়, বিরোধী দলে থাকার সময়েই বুঝেছিলেন, ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল নয়, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়, সরকারি কর্মচারী এবং শিক্ষক-অশিক্ষককর্মচারীরা। এঁদের হাতে রাখার জন্য কিছু ক্ষমতা দিতে হবে। তা হলেই ক্ষমতা হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসবে। প্রশাসনিক ক্ষমতার জোরেই এরা পার্টিকে শক্তিশালী করে তুলবে।

জ্যোতিবাবু এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। এম এল এ, এম পি, মন্ত্রীদের ডানা কেটে দিলে হৈ চৈ করার বেশি সুযোগ পাবে না যদি জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার নাম করে পঞ্চায়েত এবং পুরসভায় পার্টির উঠতি নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়।

জ্যোতিবাবু খুব ভাল করে বুঝেছেন, এম এল এ, এম পি আর মন্ত্রী সাকুল্যে আড়াই শো। এঁদের প্রভাব কতটুকু? পঞ্চায়েতের হাজার পঞ্চাশেক সদস্য, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, অশিক্ষক, পুরসভা সদস্য – সব মিলিয়ে আট লাখ লোককে ছিটে ফোঁটা ক্ষমতা দিয়ে কেনা গোলাম করে রাখতে পারলে ঠেকায় কে?

জ্যোতিবাবু আর একটা জিনিস ভাল করেই জানেন, সরকারি ক্ষমতায় থাকলে পার্টিতে দুর্নীতি, গোষ্ঠী রাজনীতি থেকে শুরু করে সব রকম নোংরামি বাড়বেই। রাইটার্স বিল্ডিংসের গদি দখলে রাখতে হলে পার্টির মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখতে হবে, আর না হয় তাঁর বশংবদ করতে হবে। এম এল এ, এম পি-দের সংগে পঞ্চায়েত-পুরসভার পার্টি সদস্য সমর্থকদের ঝগড়াকে কাজে লাগাতে হবে।

সাধারণ মানুষ জানতো, কংগ্রেস চলে মন্ত্রীদের নির্দেশে। মন্ত্রীরাই তাঁর জেলায় দলের সর্বাধিকর্তা। কংগ্রেস দলের কর্মকর্তারা ঠুঁটো জগন্নাথ। এখনও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির চেয়ে মন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশি। সি পি আই (এম) বা বামপন্থী দলে মন্ত্রী, এম এল এ, এম পি, পঞ্চায়েত, পুরসভার কর্মকর্তা – সবাইকে পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলার কথা।

আজকে অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে? বামফ্রন্ট সরকার চলছে জ্যোতিবাবুর মর্জি মাফিক। আর পার্টি চলছে কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং শিক্ষক সংগঠনের নেতাদের হুকুমে। জ্যোতিবাবু এম এল এ, এম পি-দের থোড়াই কেয়ার করেন। বরং এম এল এ, এম পি-দের চলতে হয় জ্যোতিবাবুর দয়ায়। নির্বাচনে কে টিকিট পাবেন আর কে পাবেন না সেটা নির্ভর করে জ্যোতিবাবুর দয়ার উপর।

আজকে একজন এম এল এ বা এম পি টিকিট না পেলে বিশেষ কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান বা পুরসভার চেয়ারম্যান নিজের ক্ষমতার জোরে টিকিট আদায় করে নেবেন। তার কারণ পঞ্চায়েত বা পুরসভার হাতে কোটি কোটি টাকা। এম এল এ, এম পি এমন কি পার্টির নেতা একটা প্রাথমিক স্কুলে কোন ছাত্রকে ভর্তি করিয়ে দিতে পারবেন না। কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান দরকার হলে নতুন একটা স্কুল করিয়ে দেবেন।

পঞ্চায়েত এবং পুরসভার সদস্যদের শতকরা পঁচাত্তরজনই শিক্ষক। পার্টির লোকাল কমিটি, জোনাল কমিটি, জেলা কমিটিতে এঁরাই এখন সংখ্যা গরিষ্ঠ, এঁরাই পার্টিকে চালান। পঞ্চায়েত সদস্য হলে স্কুলে যেতে হবে না। বরং অন্য শিক্ষকরা স্কুলে তাঁদের নির্দেশ মত না চললে শাস্তি দিতে পারবেন। দরকার হলে স্কুলে ঢোকা বন্ধ, মাইনে বন্ধ হয়ে যাবে। ডি আই এবং তাঁর অফিসের কর্মচারীদের চলতে হয় পঞ্চায়েতের হুকুম মত। ইংরেজ আমলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারকে পঞ্চায়েত এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে সদর হাসপাতাল সর্বত্র ছড়ি ঘোরাচ্ছে পঞ্চায়েত। এই ছড়ি ঘোরাবার সরকারিভাবে ক্ষমতা দিয়েছেন জ্যোতিবাবু। ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী – সবাইকে চলতে হবে পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির নির্দেশে। ওষুধ কেনা থেকে রোগী ভর্তি সব কিছু চলবে কমিটির হুকুমে। এর নাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর জ্যোতিবাবু সবার আগে সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির। ১৯৭৮ সালের বন্যায় সরকারি অফিসারদের ওপর হুকুম হল, কো-অর্ডিনেশন কমিটির সংগে পরামর্শ করে কাজ করুন। বন্যা ত্রাণের জন্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যে তালিকা করে দিয়েছে সেই তালিকা অনুযায়ী বন্যার্তদের সাহায্য দেওয়া হয়েছে। বেছে বেছে কংগ্রেস এমন কি বামফ্রন্টের অন্য শরিক দলের সমর্থকদের বাদ দেওয়া হয়েছে।

সংকীর্ণ দলবাজি শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সাল থেকে। ১৯৮৮-তে দলবাজী এসে দাঁড়িয়েছে পার্টির সংকীর্ণ গোষ্ঠীবাজীতে।

সি পি আই (এম)-এর যে মন্ত্রী কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদের তোষামোদ করতে পারবেন না, তিনিই টাইট খাবেন।

রাইটার্স বিল্ডিংস এবং সমস্ত সরকারি অফিসের দেয়ালে লেখা হয়েছে, 'সময়মত অফিসে আসুন, হাতের কাজ শেষ করুন, নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখুন, প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করুন'। প্রশ্ন হল, কো-অর্ডিনেশন কমিটির ক'জন নেতা এটা মেনে চলেন ক'জন দুর্নীতিমুক্ত ক'জন কাজ করেন?

বারবার সরকারি সার্কুলার দেওয়া হয়েছে অফিসের ভিতর কোন সময় মিটিং করা, শ্লোগান দেওয়া বা প্রচার করা চলবে না। এমন কী কোন কর্মচারী নিজের চেয়ার ছেড়ে যেতে পারবেন না, কোনরকম আলোচনা করা এমনকী খবরের কাগজও পড়তে পারবেন না।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা এসব কোন দিন মানেন? কর্মচারীরা যখন কাজে ব্যস্ত, সেকশন অফিসার বা অন্য অফিসারের অনুমতি না নিয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা দলবল নিয়ে ঢুকে পড়লেন, হুকুম জারি করে বক্তৃতা শুরু করে দিলেন, কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর চাঁদা যাঁরা দেয় তাঁরা দিয়ে দেবেন। এর সংগে একদিনের বেতন দিয়ে দিন। অফিস ছুটির পর সমাবেশে যোগ দিন।

সরকারি কর্মচারীদের একটা বড় অংশ এখনও নিষ্ঠার সংগে কাজ করতে চান, সততার সংগে চলতে চান, দুর্নীতিকে ঘৃণা করেন। তাঁরা কো-অর্ডিনেশন কমিটির উঠতি নেতাদের সহ্য করতে পারছেন না, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠছেন।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিষ্ঠাবান কর্মী সমর্থকরাও উঠতি নেতাদের দাপটে অতিষ্ঠ। আজকে কো-অর্ডিনেশন কমিটি টিকে আছে শুধু জ্যোতিবাবুর আশীর্বাদে। যদি নিরপেক্ষভাবে সরকারি কর্মচারীদের অবস্থা ভোট নেওয়া হয় তাহলে কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে। তবে জ্যোতিবাবুরা কোনদিনই সে রাস্তায় যাবেন না। সরকারি কর্মচারীরাই সেই রাস্তায় টেনে নিয়ে যাবে। সেদিন আসছে। □

পথচলতি

ওরা দুজন

ডিগবয়ে এই দম্পতিকে চেনে না এমন লোক খুব কমই আছে। সকালে দেখা যাবে দুজনে হাত ধরাধরি করে মুলিয়াবাড়ি অঞ্চল থেকে চারালি বাজারের উদ্দেশ্যে চলেছে। সেখানে পৌঁছে বাজারের আবর্জনাগুলো সাফ করবে।

ওর নাম প্যারে সিং। যখন ওরা স্বামী-স্ত্রী পথ দিয়ে চলে মনে হয় দুজনে দুজনকে ধরে ব্যালান্সের খেলা খেলতে খেলতে চলছে।প্যারে হলো বাজারের ঝাড়ুদার। এখানে সকালে কোন বাজার বসে না। আগের দিনের বিকেলে বাজারের আবর্জনাগুলো সাফ করে ওরা দুজনে।

দেখা যায় প্যারে বালতিতে আবর্জনা নিয়ে চলেছে, ওর বৌ তাকে হাত ধরে ডাস্টবিনের কাছে নিয়ে যায়। প্যারের শরীরে এতটুকু শক্তি নেই। দেশী মদ খেয়ে শরীরটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছে। কিন্তু এছাড়া ওদের উপার্জনেরও কোন পথ নেই। তাই স্বামীর চাকুরিটা বজায় রাখতে স্ত্রীও হাত লাগায়।

সারাদিন বাজারে কাটিয়ে বিকেলে দেখা যাবে দুজনে দেশী টেনে বুঁদ হয়ে প্রলাপ বকতে বকতে বাড়ি ফিরছে। কিন্তু কতদিন। রাত্রে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরতে পারে! কারণ প্রায় রাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে কোন নর্দমায় দুজনে নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু নেশা কাটলে দেখা যাবে সেই একই মূর্তি, দুজনে হাত ধরাধরি করে চলেছে।

রতন বড়ুয়া

একদিন প্রতিদিন

হাওয়া খেকো যাত্রীরা এমনভাবে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে যে, গুঁতোগুঁতি করেও প্যাসেঞ্জারস কম্পার্টমেন্টের পা-দানিতে পা রাখার জায়গা পাওয়া গেল না। অগত্যা পিছিয়ে এসে ভেন্ডারদের বগিতে কোনরকমে মুণ্ডু গলিয়ে 'লহ লহ তুলে লহ' বলে নিজেকে সমর্পণ করা গেল। এই বগির একটা সুবিধে হল – বসার আসন কম বলে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জায়গা অনেক। কিন্তু সেখানে পা রাখে কার সাধ্য! ঝুড়ি, বস্তা, সাইকেল, মুরগি, মাছের গামলা, কাঠের তক্তা, টি ভি-র অ্যান্টেনা, সব একেবারে জগাখিচুরি বানিয়ে রেখেছে। স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই শুরু হয়ে গেল হকারদের বাণিজ্যিক তৎপরতা। যত্র খাওয়া-দাওয়ার পসরা নিয়ে সাড়ম্বরে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। সোডার জলের ফটফটানি। ঝালমুড়ির ধানাই পানাই। দাঁতের মাজন, আমলকী চূর্ণ, ঢোল কোম্পানির মলম, ওয়ার্ড বুক, রামকৃষ্ণের ধূপকাঠি, কাজুবাদামের বিস্কুট, কাঁচরাপাড়ার শোনপাপড়ি...... সব যেন জি এন এল এফের কায়দায় এলোপাথাড়ি গোলাগুলি চালিয়ে যেতে লাগল।

এতরকম হৈচৈ-হট্টগোলের মধ্যেও শিসের আওয়াজটা অনেকক্ষণ ধরে কানে আসছিল। বাউল বা ভাটিয়ালী গানের সুর অব্দি বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু গানটা কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না। সোনারপুর ছাড়িয়ে যেতেই দেখি ঝুড়ির মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে ছেলেটি। এবার আর শিসে নয়, একেবারে খোলা গলায় ' ...হৃদয়ের একূল ওকূল দুকূল ভেসে যায়... ...হায় সজনী... ।'

ইদানীং বাংলা ছায়াছবির গুণে অনেকেই টুকটাক রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে। কিন্তু গানটি কোন ছায়াছবিতে আছে বলে তো মনে হল না। কৌতূহলটা খোলসা করার জন্য প্রশ্ন করি – 'ভাই, আপনি যে গানটা গাইছেন, সেটা কার গান? কোনো সিনেমার খানিকটা নামাজের ভংগীমায় একটা প্রণাম ঠুকে সে বলল 'বলেন কি, রবি আল্লার গান আপনেরা শোনেন নাই!' রীতিমত বোকা বানিয়ে দেওয়ার মত উত্তর। কিন্তু তখনও আমার সন্দেহ ঘোচেনি। লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে শিয়ালদায় কাঁচা তরকারি বিক্রি করতে আসা যুবকের গলায় এ গান কি ভাবা যায়? আমার সন্দেহ নিরসন করল ওর পরের পর গেয়ে যাওয়া গানগুলি... ...এই তো তোমার প্রেম ওগো,... ...তাই তোমার আনন্দ আমার' পর,... ...রইল বলে রাখলে কারে,... ...তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে। আমি একেবারে অবিভূত। গান শুনে গাড়ির মধ্যে কয়েকজন বাঙালি নামের সুসভ্য জীব তাজ্জব।

ট্রেন আমার স্টেশনে আসতেই ছেলেটি হাত বাড়িয়ে বলল, আবার দেখা হবে বাবু। আরও গান শুনাব। এই বগিতেই আমি...

জয়ন্ত দাস

অম্লমধুর

হাতে শাঁখা মাথায় সিঁদুর
পরে থাকেন যিনি,
এক লহমায় দেখেই তাঁকে
বিবাহিতা চিনি।
বিবাহিত পুরুষ চেনাই
হয় যে কঠিন ভারি,
কুমারী তাই না বুঝে ভাই
মজে প্রেমে তার-ই।

●

চাকরীতে চাই পড়াশোনা
ভালো রকম যোগ্যতা,
সেই সংগে চান 'বাবু'-রা
কাজের কিছু অভিজ্ঞতা।

মন্ত্রী হওয়াই দেখছি সোজা
নেই এসবের ঝক্কি,
গদী পেলেই মিলবে সব
থাকবে সাথে রক্ষী।

সুব্রতকুমার করণ

●

ভেজাল ধরার জন্যে, যখন –
চলছে ছোটাছুটি;
ভেজাল-ধরা জালে, তখন –
পড়ছে চুনোপুঁটি!

চাঁইগুলোকে ধরছে রে কই, –
শক্ত করে চোয়াল!
'জাল' কেটে, ঠিক সময় মতোই –
পালায় রাঘব বোয়াল!

ভেজালেরই যুগ চলছে!
ভেজাল, সবের বেলায়।
খাবার, ওষুধ ছাড়াও যে, –
ভেজাল থাকে খেলায়!!

শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

●

জিন্দাবাদী নেতার কথা
সেই তো পুরাণ, সেই তো বেদ,
মিথ্যা কথা বলা ভাল
অর্থ বাড়ে, বাড়ে মেদ।

সুচন্দ্রনাথ দাস



ডঃ নাজিবুল্লা

আফগানিস্তান ঃ দুই বৃহৎ শক্তির ক্রীড়াঙ্গন

নয়া দিল্লি থেকে সুদীপ মজুমদার

বিশাল সব ট্যাংক আর আর্মর্ড ক্যারিয়ারগুলো আস্তে আস্তে দেশমুখে গড়িয়ে চলেছে আফগানিস্তান থেকে। ন বছর আগে তৎকালীন আফগান সরকারের আহ্বানে সোভিয়েত ইউনিয়ন হাজার হাজার সৈন্য পাঠায় আফগানিস্তানে। ডিসেম্বরের নিদারুণ শীতে সোভিয়েত সেনাবাহিনী এসে পৌঁছায় কাবুলে। রাজধানীতে তখন ক্ষমতায় বাবরাক কারমাল। প্রেসিডেন্ট হিসাবে কারমালের অবস্থা ছিল নড়বড়ে। আফগানিস্তানকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির হাত থেকে বাঁচানোর অজুহাতে ঢুকে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

তারপর কেটে গেছে নটা বছর। পার্বত্য আফগানিস্তানের ইতিহাসে এক ঘটনাবহুল অধ্যায়। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষের মত আফগানি দেশ ছেড়ে হয় পশ্চিম সীমান্ত পার হয়ে ইরানে অথবা পুবদিক দিয়ে পাকিস্তানে এসে পৌঁছয়। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে জমিয়ে বসলে আমেরিকা নিশ্চয়ই শান্ত থাকতে পারে না। সারা পৃথিবীতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার প্রয়াসে দুই সুপার পাওয়ার সবসময় ব্যস্ত। তাই আফগানিস্তানের 'বিপদে' কুম্ভীরাশ্রু ফেলার জন্য আংকল স্যাম দৌড়ে এলেন। যেনতেনপ্রকারেণ সোভিয়েত প্রভাবকে রোখা দরকার। পাকড়াও করা হল পাকিস্তানকে।

কোটি কোটি ডলার দিয়ে আমেরিকা কাবুল-বিরোধী মুজাহিদিন অথবা বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে আরম্ভ করল যাতে পাকিস্তানের জমি থেকে আফগানিস্তানের ভেতরে গিয়ে গোপন হানা দেওয়া যায়। একেবারে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আর ডলারের বোঝা। এই তো গত বছর পাকিস্তানি সরকারকে ওয়াশিংটন দিল চার বিলিয়ন ডলার। উদ্দেশ্য, সোভিয়েত সাহায্যে পুষ্ট কাবুলের নাজিবুল্লা সরকারকে খতম করা। আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী বিদেশনীতির একটা স্বরূপ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর যে কোনও আঞ্চলিক ঝগড়ায় আমেরিকা জনগণ-বিরোধী ভূমিকা নেয় অথবা জনপ্রিয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তা সে ভিয়েতনামে বোমা ফেলাটাই হোক অথবা ইরানের শা'কে, কিংবা লাতিন আমেরিকার দুরাচারী মিলিটারি ডিক্টেটর যেমন নিকারাগুয়ার সোমোজা অথবা চিলির পিনোকে সাহায্য করাই হোক। এরা সবাই মার্কিন সাহায্য পেয়ে টিঁকে থাকতে পেরেছে ততদিন, যতদিন না জনগণের সম্মিলিত রোষ বিদ্রোহ অথবা বিপ্লবের রূপ ধারণ করেছে।

আফগানিস্তানের বেলাতেও তাই। সেখানকার জনসাধারণ যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী পাঠানোকে ভাল চোখে দেখে না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা সবাই মার্কিন মুলুকের দিকে চেয়ে রয়েছে সাহায্যের আশায়। দুই সুপার পাওয়ারের ক্ষমতা আর আধিপত্যের খেলার মাঝখানে চাপা পড়ে যাচ্ছে আফগানিস্তানের মানুষ।

শেষ পর্যন্ত ইউনাইটেড নেশনসের দিয়াগো করদোভেজের মধ্যস্থতায় জেনেভা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মারফৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান থেকে প্রায় এক লক্ষেরও বেশি সৈন্য ন মাসের মধ্যে সরিয়ে নেবে। এবং কাবুলে জাতীয় সংহতির এক সরকার বসবে। সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু হয় মে মাসের ১৫ তারিখ থেকে।

কাবুলে এখন পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি অব আফগানিস্তান অর্থাৎ পি ডি পি এ-র শাসন। নেতা নাজিবুল্লাকে প্রেসিডেন্টের পদে বসায় মস্কো, বাবরাক কারমালকে সরিয়ে। তাই নাজিবুল্লা বিদ্রোহীদের চোখে পুতুল মাত্র। আর আমেরিকাসহ পাকিস্তানের মত দেশও চায় নাজিবুল্লার পতন। এখন থেকেই বলা শুরু হয়ে গেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সৈন্য ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া শুরু করার সংগে সংগেই কাবুলের দিকে মুজাহিদিনের দল রওনা দেবে আর নাজিব সরকার টালমাটাল হবে।

নাজিবুল্লার সরকারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বৈধতার। অর্থাৎ সবার চোখে তাঁর শাসন করার অধিকারকে মান্যতা দেওয়া। সোভিয়েত সাহায্য কমতে থাকলে নাজিবকে টিঁকে থাকার জন্য অন্যান্য আরও গ্রুপ অথবা ব্যক্তি বিশেষের সংগে আঁতাত করতে হবে, আর সরকারকে একটা বহুবিধ রূপ দিতে হবে। এর জন্য দরকার পড়লে যেসব বিদ্রোহী নরমপন্থী তাদেরকেও সরকারে সামিল করা দরকার। এই সমস্ত চিন্তা নিয়ে নাজিব দিল্লিতে আসেন। উদ্দেশ্য, একটা বন্ধু খুঁজে পাওয়া।

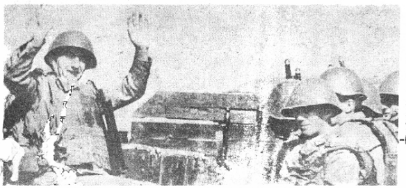
পেয়েছেনও তিনি। সারা পৃথিবীকে চমকে দিয়ে রাজীব গান্ধী লাল কার্পেট বিছিয়ে অভিনন্দন জানালেন নাজিবুল্লাকে। তিন দিনের দিল্লি সফরের পরে আফগান প্রেসিডেন্ট বললেন যে তিনি ভারতের কাছে কৃতজ্ঞ।

আফগানিস্তানের সামনে এখন বিরাট সমস্যা। নানান আদিবাসী গোষ্ঠী বাস করে ওই দেশে। পাখতুন, দারি, তাজিখ এরা সবাই দারুণ স্বাধীনচেতা। সমাজব্যবস্থা সাধারণ। প্রত্যেক আদিবাসী গোষ্ঠীর একজন করে প্রধান আছেন, যিনি নেতৃত্ব দেন। ইতিহাসে এমন ঘটনাও পাওয়া যায় যাতে বিদেশি শক্তিরা এসে এদের পরাধীন করার চেষ্টা করে কিন্তু সফল হতে পারে না।

সমস্যা হয়েছে মুজাহিদিনদের নিয়েও। এদের মধ্যে অন্তত ২৭টি দল। একটির নেতা হলেন গুলবুদ্দিন হিকমতিয়ার – কট্টর মুসলিম। মৌলবাদী। আমেরিকা ও পাকিস্তান চায় হিকমতিয়ার কাবুলের গদি পাক। কিন্তু সমস্যা হল ইরানের খোমেইনির মত যদি হিকমতিয়ারও পাশ্চাত্যবিরোধী কথাবার্তা শুরু করে দেন। অবশ্য লাখ লাখ ডলার দিয়ে হিকমতিয়ারকে বশে আনা হয়েছে। কিন্তু ভিয়েতনামের হো চি মিন অথবা নিকারাগুয়ার দানিয়েলি অরতেগার মত পপুলার নেতা হিকমতিয়ার নন। তাছাড়া গত ন বছরে আফগান সরকার শিক্ষার বিস্তার করেছে। পর্দার পেছন থেকে মহিলাদের বার করে এনে জাতীয় কর্মধারায় কাজে লাগানো হয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানান পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এক কথায় আফগানিস্তানকে আধুনিক দেশে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।

সুপার পাওয়ারদের সহ্য হয় না তৃতীয় দুনিয়ার কোনও দেশের নিজস্ব স্বাধীনতাকে রক্ষা করার প্রয়াস। ওরা চায় ওদের দলে ভিড়ে থাকুক। ভারত চেষ্টা করছে আফগানিস্তান নিজের ভাগ্য নিজেই যাতে নির্ধারণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সুপার পাওয়ার বর্জিত রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কেননা এর দ্বারা নয়া উপনিবেশিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো যেতে পারে। □

কান্দুজ ছেড়ে রুশ সৈন্যরা ঘরের পথে



ফটো : টাইমস পত্রিকার সৌজন্যে

বৈরী নাগারাও বৈঠকে বসতে উৎসুক ঃ সেমা



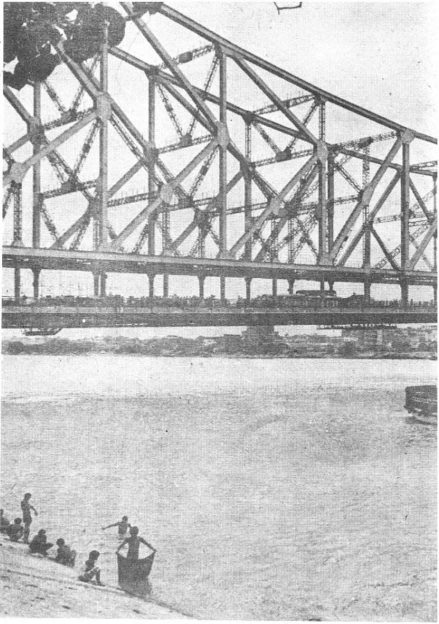
গত চল্লিশ বছর ধরে নাগাল্যান্ডে এন এস সি এন (ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড) গেরিলারা যে বৈরী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে তার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। সম্প্রতি কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী হোকিশে সেমা একথা জানিয়ে বলেন – 'যতদিন আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থাকব, ততদিন আমি এমন কিছু করব না যার ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।' এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী সেমা জানান, খৃস্টান মিশনারিদের সঙ্গে এন এস সি এন গেরিলাদের গোপন আঁতাত আছে, এমন খবর তাঁর কাছে নেই। তবে ব্যক্তিগতভাবে কারুর কারুর যোগাযোগ থাকতে পারে। তার মানে এই নয় যে এন এস সি এন-এর সঙ্গে খৃস্টান মিশনারিরা হাত মিলিয়েছেন।

নাগাল্যান্ডের বিরোধী নেতা ভানুজোর একটি অভিযোগের জবাব দেবার উদ্দেশ্যেই কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন সেমা। রাজ্যের বিরোধী নেতা ভানুজো। সরকারের অর্থ নয়ছয় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ব্যক্তিগত স্বার্থে সরকারি খাস জমি দখল করে নিচ্ছেন বলেও ভানুজো কিছুদিন আগে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে অভিযোগ করেছিলেন। এমন অভিযোগের জবাব দিতেই কলকাতায় এসেছিলেন সেমা। সাংবাদিকরা প্রশ্নোত্তরের সময় ঘুরে ফিরে মণিপুরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টমজক সিং নাগাল্যান্ড সরকার এন এস সি এনের গেরিলাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে বলে যে অভিযোগ করেছিলেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সে সময় বেশ বিব্রত বোধ করেন। তাঁর সরকার এন এস সি এন গেরিলাদের মণিপুরের বিরুদ্ধে বৈরী কাজকর্মে মদত দিচ্ছে কিনা, এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী সেমা রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি জানান, মণিপুর গত ২০ বছর ধরে এই সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু তাঁর রাজ্য চল্লিশ বছর ধরে এই সমস্যায় জর্জরিত। আসলে মণিপুরের বৈরী সমস্যা থেকে নাগাল্যান্ডের সমস্যার স্বরূপ বেশ খানিকটা আলাদা। সেমার কথায় – তাই আমি গেরিলাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী। একমাত্র রাজনৈতিক সমাধান-ই নাগাল্যান্ডে সমস্যার সমাধান করতে পারে।

সেমা আরও বলেন, এন এস সি এনের নেতা টি মুইভা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি রাজি হলে চার-সদস্য বিশিষ্ট একটি দল তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনায় বসে। তাঁরাও মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, গেরিলারা আলোচনায় বসতে উৎসুক। কিন্তু নাগা কোনিয়াৎ গোষ্ঠীর সঙ্গে মণিপুরের তানখাল গোষ্ঠীর বিরোধের ফলে পরবর্তী আলোচনার সুযোগ ভেস্তে যায়। শুধু তাই নয় চার সদস্য বিশিষ্ট এন এস সি এন দলটি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্রহ্মদেশে ফিরে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এন এস সি এন নেতা টি মুইভার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে আলোচনা স্থগিত আছে।

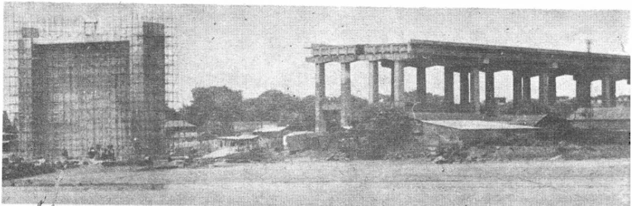
সেমা জানান, তিনি এন এস সি এনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান বলেই এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চান না। নাগাল্যান্ডের বিরোধী নেতা ভানুজোর অভিযোগ নস্যাৎ করে মুখ্যমন্ত্রী সেমা জানান, তাঁর সরকার অর্থ নয়ছয় করছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। তাঁর সরকারের আর্থিক অবস্থা ভাল। তাছাড়া আর্থিক যে কোন বিষয় সঠিকভাবে খতিয়ে দেখার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুধু তাই নয়, অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহেও নাগাল্যান্ড সরকার খুবই তৎপর। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ক্ষমতায় আসার পর তিনি জনগণের মধ্যে চালের যোগান অব্যাহত রাখতে ন্যায্য মূল্যের দোকান খোলার ব্যবস্থা করেছেন এবং জনগণের মধ্যে রেশন কার্ড বিলি করা হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও শিল্পোন্নয়নেও বর্তমান সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে জানান সেমা। প্রসংগান্তরে সেমা জানালেন – তাঁর রাজ্যে চিনির ও কাগজের মিল আছে। প্রত্যেকটাই আর্থিক ক্ষতিতে চললেও ক্ষতির পরিমাণ কমানর চেষ্টা চলছে। তবে বিদ্যুতের সরবরাহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় নাগাল্যান্ডে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। কেননা লোধাক থেকে যে বিদ্যুতের যোগান আসে তা যথেষ্ট নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী সেমা সাংবাদিকদের জানান। □

স্বপন বসু

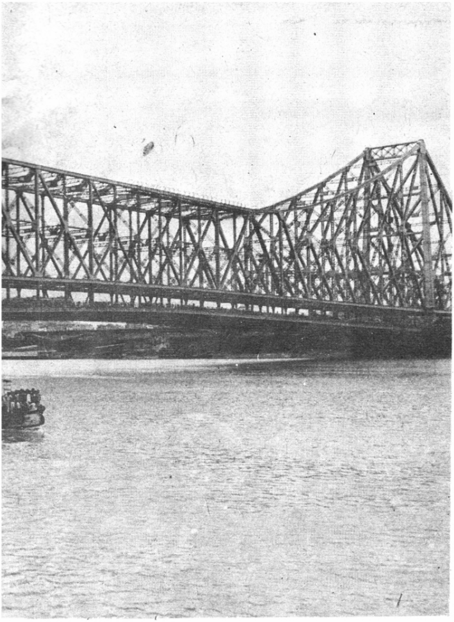


যমজ শহর কলকাতা আর হাওড়া, মধ্যে নদী ভাগীরথী। শুধু এই দুই শহর নয়। অবশিষ্ট পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা সহ সমগ্র ভারতের সঙ্গে কলকাতার সংযোগের 'বাধা' ভাগীরথী তথা গঙ্গাকে সেতুবন্ধ করার উদ্যোগ একশ বছরেরও বেশি আগে শুরু হয়েছিল। পনটুন ব্রিজের পরে হাওড়া ব্রিজ তথা রবীন্দ্র সেতু। এখন কাজ চলছে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর। কিন্তু ২০ বছরেও তা সম্পূর্ণ হয়নি। রবীন্দ্র সেতু হঠাৎ বিপর্যস্ত হলে কী ঘটতে পারে, আর কেন দ্বিতীয় হুগলি সেতুর কাজ ৫ বছরের জায়গায় ২০ বছরেও শেষ হল না তা নিয়েই এই কাহিনী লিখেছেন অমলেন্দু কুণ্ডু, দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় ও অতীন সরকার।

হাওড়া ব্রিজের শেষের সেদি



ফটো : জয়ন্ত চৌধুরী



ফটো : অঙ্কিতা হাজরা

যদি সেই শেষের' সে দিনটা আজই মধ্যরাতে এসে হাজির হয়? মাঝ রাতে না হয়ে ভরা দুপুরেই অঘটনটা ঘটে তাহলেই বা কী হবে? যদি অঘটনটা ঘটেই যায় তাহলে কে 'বলির পাঁঠা' হবে? ধরুন হাওড়ার ব্রিজটা আর নেই। মানে সকালে উঠে জানা গেল ব্রিজটা ভেঙে পড়েছে। তাহলে তার প্রতিক্রিয়াটা কী হবে সেটাই আলোচ্য।

দিনের বেলায় হাওড়া ব্রিজ দিয়ে প্রতিনিয়ত পাশাপাশি ট্রাম-বাস-মোটর-মিনি-স্কুটার-ঠেলা চলে আটটি করে। তার মধ্যে ৪টি আপে ৪টি ডাউনে। পরিসংখ্যান অনুসারে ব্যস্ত সময়ে প্রতি ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ হাজার গাড়ি চলাচল করে। যদি ব্রিজটা আর এই ধকল সহ্য করতে না পেরে মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ে তাহলে কিছু না হলেও কয়েক শো গাড়ির জলসমাধি হবে। এবং তাতে কিছু না হলেও হাজারখানেক মানুষের মৃত্যু হবে। পথচারীদের একাংশও জলের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। ওই সময় যদি জলপরিবহনের লঞ্চগুলি বাগবাজার বা বরানগর থেকে যাত্রী নিয়ে আসে তাহলে তাতেও ১০০/১৫০ লোক থাকবে। ভাঙা ব্রিজের গাড়িগুলি লঞ্চের মাথার উপর পড়বে। যে লরীগুলি দুর্ঘটনায় পড়বে তাতে দু একটা পেট্রোল ট্যাঙ্কারও থাকতে পারে। সংঘর্ষে সেটা ফেটে যাবে এবং আগুন ছড়িয়ে পড়বে জলে। যদি কোনও লরীতে ফার্টিলাইজার এমোনিয়া লিকুইড থাকে বা কেমিক্যাল গ্যাস থাকে সেটিও ফেটে যাবে। ফলে গঙ্গার জলে গ্যাস ও পেট্রোলের আগুন ধরে যাবে। সেই আগুন ভাটায় বয়ে গিয়ে যত নৌকা আছে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবে। কলকাতা ডকের মধ্যেও জ্বলন্ত জলের প্রভাব পড়বে। জাহাজে আগুন লাগবে। জেটিতে আগুন লাগবে। সত্যি কথা বলতে কী ভাবলে শিউরে উঠতে হয়, সেই অনাগত দিনটির কথা।

হাওড়া ব্রিজের তলায় খুব বেশি হলে ৫০ থেকে ৭০ ফুট গভীর জল আছে। তাতে যদি ব্রিজের লোহার বিমগুলো পড়ে, অথবা বাস, ট্রাম, মোটর, লরী পড়ে তাহলে নদীর জল ছাপিয়ে গাড়ির পাহাড় হয়ে যাবে। তাতে একটাই সুবিধা, সবই জলে পড়ে ডুবে নাও যেতে পারে!

একটা ব্রিজের কত আয়ু হতে পারে তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু যে ব্যাপারে ঐকমত্য আছে তা হল ব্রিটিশ আমলের লোক যেমন শক্ত সমর্থ তেমনি যন্ত্রপাতি লোহালক্করও বেশ শক্ত সমর্থ। আর সেটাই বোধহয় আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। নেহাৎ তখনকার দিনের ইস্পাতে তৈরি হয়েছিল বলে হাওড়া ব্রিজ আজও বেঁচে আছে।

দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ করতে গিয়ে ডাঙার উপর দু দুবার ব্রিজ ভেঙে পড়েছে। এখনও জলের উপর ব্রিজ শুরু হয়নি। তাই ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

সেই ১৯৪৩ সালে যখন হাওড়া ব্রিজ তৈরি হয়েছিল তখন ব্রিটিশ সরকার আদৌ ভাবেননি এখানে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ হাজার, অর্থাৎ দিনে দেড় লক্ষ গাড়ি যাবে। পথচারী যাবে কয়েক লক্ষ। তা যদি হত তাহলে বিলাসিতা করে এই ঝোলানো সেতু করার ঝুঁকি নিতেন না।

বিশেষজ্ঞরা বছর ১৫ আগেই বলে গিয়েছেন হাওড়া ব্রিজ আর 'লোড' নিতে পারছে না। বিকল্প ভাবা দরকার। তারা চেয়েছিলেন ১৯৭৮-৭৯ সালে দ্বিতীয় ব্রিজ। কারণ নগর উন্নয়ন দপ্তর ১৯৯০ সালে তৃতীয় ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। আসলে ওরা বুঝতে পেরেছিলেন গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার নীতিটা আর কোথাও ফলপ্রসূ না হলেও কলকাতা শহরের ক্ষেত্রে ঘটে গেছে। তাই লোকের আগমনে কোনও খামতি নেই। ১৯৪৩ সালে এই ব্রিজে কিছু টমটম চলত, আর চলত পুরোনো আমলের কিছু ট্রাম, বাস আর মোটর। সারাদিনে সেদিন ৮/১০ হাজার গাড়ি চলত কিনা সন্দেহ। আজ তা চলে প্রতি ঘণ্টায়।

যা বলছিলাম যদি হাওড়া ব্রিজটা ভেঙে পড়ে তাহলে দোষটা কার হবে রেল কর্তৃপক্ষ বলবে ওটা বন্দরের গাফিলতিতে। বন্দর কর্তৃপক্ষ দোষ দেবে রেল কর্তৃপক্ষকে। সেই '৪৩ সালে মানুষ পিছু দু পয়সা ও মাল পিছু ৩ পয়সা টোল নেওয়া হত হাওড়া স্টেশন থেকে যত ট্রেন যেত তার টিকিট থেকে। উদ্দেশ্য ছিল ওই টাকায় হাওড়া ব্রিজের সংস্কার হবে। ৪৫ বছর পরেও সেই দু পয়সাই রয়ে গেছে!

বন্দর কর্তৃপক্ষ কম যান না। তারা বিদেশি পর্যবেক্ষক দলের মতামত নিয়ে বলেছেন, ওই ব্রিজ খুব ভাল অবস্থায় আছে। কোনও চিন্তার কারণ নেই। আমাদের মধ্যে যাদের এখনও বিদেশির বাণী শুনলে জিভে জল গড়ায় তারা এই আশ্বাসে খুশি হবেন। কিন্তু বাকিরা নয়। তাই শুধু একটা সামান্য লরির ধাক্কায় ব্রিজের দু দুটো ভারি রেলিং ভেঙে গেল এটা স্বপ্নেও কি কেউ ভেবেছিল!

কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজের বন্দর বাঁচাতে পারেনি। হলদিয়া বন্দরের ঘাড়ে চেপে অস্তিত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা গঙ্গার জল যেমন বাড়াতে পারেননি, তেমনি বন্দরের জাহাজ আগমনও। তবু ব্রিটিশ পরামর্শে তাদের অনীহা নেই। আমলারা অনেক লক্ষ টাকা দিয়ে বি বি জে কে হাওড়া ব্রিজের কিছু সংস্কার করার বরাত দিয়েছেন দু বছর আগে। কিন্তু, বাস্তবে দেখা গেল তারা হাওড়া ব্রিজের মাঝে কিছুটা জায়গা ঘিরে রেখে ওই ব্রিজের ওপর 'জ্যাম' সৃষ্টি করলেও মেরামতির কাজ শুরু করে উঠতে

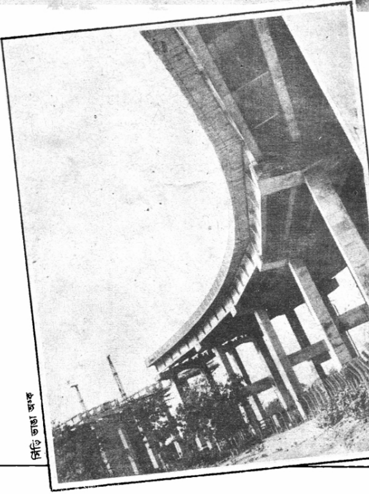


......কিন্তু তবু যেতে হয়

পারেনি। কেউ যদি বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করে হাওড়া ব্রিজের অবস্থা কী? তাহলে ওরা পুরোনো ফাইল ঘেঁটে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের পরামর্শের গ্যারান্টি ঝড়ের গতিতে জেরক্স করিয়ে সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন।

শেষের সেদিনের কথায় ফিরে আসি। ধরা যাক, অঘটনটা ঘটে গেছে। কলকাতা ও হাওড়া বাসী হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছেন কেউ বাঁচবে না। না কলকাতা বন্দরের সামর্থ্য নেই। ওদের কাছে সামান্য লোহার তার বা দড়িও যে নেই তা সেদিনের লরি তোলার ঘটনা থেকেই সবাইকার জানা হয়ে গেছে। তাহলে হাওড়া ব্রিজের দায়িত্ব ওদের দেওয়া হল কেন? কেন হাওড়া ব্রিজ সংস্কার ও রক্ষার জন্য পৃথক সংগঠন তৈরি হল না? বামফ্রন্ট সরকার ভাবতে থাকুন। ততক্ষণে আমরা উদ্ধার কাজের ব্যাপারটা দেখি।

ফোর্ট উইলিয়ামে খবর গেল। কিন্তু ওদের ডুবুরি হায়দরাবাদ বা বাঙ্গালোরে থাকে, তাদের আনতে সময় লাগবে। কিন্তু ডুবুরি এসেই বা কী করবে? সে বড়জোর শবদেহ তুলতে পারবে। অবশ্য যদি জোয়ারে তা ভেসে না যায়। জাহাজ কোথায় যা দিয়ে এতগুলো লোক উদ্ধার করা হবে? দমকল বাহিনীর কর্মীরাও দুপারে ফ্লাইওভারে যানজটে আটকে গেলেন। কারণ, ততক্ষণে তো বিশাল জনতা মজা দেখার জন্য জড়ো হয়ে গেছেন। কে আগুন নেভাবে? ঠিক আছে, না হয় আহত কিছু লোককে তোলা হল। তাদের কোথায় ভর্তি করা হবে? কলকাতায় এত



সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক

ফটো : দিলীপ দেব

হাসপাতাল আছে ? এত রক্ত আছে ?

এদিকে বড়বাজারে জিনিসের দাম বেড়ে যাবে। গুদামে মজুতদারি বেড়ে যাবে। কারণ প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে যে ৬০ হাজার লরি চাল-ডাল-তেল-গম-আলু-পিঁয়াজ-মসলা আনে তা আসবে না। হাওড়ায় রেল ওয়াগনে যে চাল-গম-চিনি এসেছে তা কলকাতায় আসবে কী করে ? সবেধন বালি ব্রিজ আর কতটা ধকল সইতে পারবে ? কোনও হারকিউলিস প্লেন দিয়ে সাপ্লাই করা যাবে না। কারণ ল্যান্ডিং-এর জায়গা নেই। অগত্যা গুডস শেডে কিছু হেলিকপ্টার নামান যেতে পারে। তারা খেপে খেপে খাবার পৌঁছে দিতে পারে।

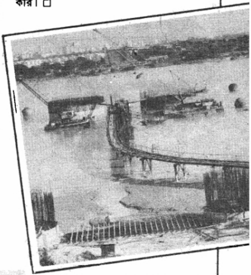
ব্রিজ নেই তাই পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত। ট্রেনের যাত্রীরা আসবে কী করে ?

সংবাদপত্র বেরোবে কিনা সন্দেহ আছে। ইদানীং বহু সাংবাদিক ও অসাংবাদিক হাওড়ায় বসবাস করছেন। ফলে ব্রিজ ভেঙে গেলে তাঁরা অফিসে যেতে পারবেন না। ফলে সংবাদপত্র নাও বেরোতে পারে। শুধু আকাশবাণী খবর দেবে। কারণ ওদের অফিস গঙ্গার ধারে। ওরা পাড়ে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে যা দেখবে তাই দিয়ে খবর করবে। সবচেয়ে মুশকিল হবে রাজনৈতিক দলগুলির। তাদের জমায়েত বন্ধ রাখতে হবে। কারণ ওদের বেশির ভাগ লোক তো জেলা থেকেই আসেন তারা আসতে পারবেন না। শুধু দক্ষিণের দলগুলির সুবিধা। তারা বাসন্তী কাকদ্বীপের লোক এনে জমায়েত করতে পারবে। কিন্তু তখন কি আর শহীদ মিনার বা ব্রিগেড খালি থাকবে ? পুলিশ ক্যাম্প বসবে, জওয়ানরা সেবার কাজ করবে। দলগুলিকে রিলিফ ক্যাম্প করতে হবে, অতএব মিছিল-জমায়েত কিছুদিন বন্ধ। ওদিকে যদি সাতদিনের মধ্যে শহরের লোকেদের খাবার না দেওয়া হয় তাহলে এই সরকারের অবস্থা কী হবে ? জনারণ্য মহাকরণ ঘিরে ফেলবে। এরমধ্যে যদি আবার প্রধানমন্ত্রী দুর্গতদের দেখতে আসেন তাহলে আরও বিপদ। তাঁর নিরাপত্তা কে দেখবে ? আগেই বলেছি বলির পাঁঠা কে হবে সেটাই দেখার বিষয়।

সেদিন যখন একজন ট্রাম লাইনের গর্তে পড়ে ব্রিজের মাঝখান থেকে জলে পড়ে গিয়েছিল দোষ দেওয়া হয়েছিল ট্রাম কোম্পানিকে। এদিন যখন লরি পড়ল, বলা হল ক্লিনার গাড়ি চালাচ্ছিল। কেউ বলল না কত নড়বড়ে হলে একটা সামান্য লরি দুটো রেলিং ভেঙে জলে পড়তে পারে।

হাওড়া ব্রিজটা ভেঙে পড়লে বিদেশি সাংবাদিকদের অবস্থাও কাহিল। তারা সব গ্র্যান্ড হোটেলে উঠলে কী হবে, গঙ্গায় একটা মোটর বোট নেই যা নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে যাওয়া যাবে। হোটেলে মিনারেল ওয়াটার পেলেও মুরগির মাংস পাওয়া যাবে না। কারণ ওটা তো হাওড়া উলুবেড়িয়া থেকে সরবরাহ করা হয়।

পাঠকের মনে হতে পারে, অনাগত যে ভয়ংকর দিনটির ছবি আঁকা হয়েছে তা নিছকই কল্পনা বিলাস কিন্তু আজ কল্পনাই বাস্তবে চেহারা নিয়েছে। রাতে ব্রিজে পাহারা থাকে। অথচ রেলিং চুরি হয়ে যায়। ট্রামের গর্তে মানুষের স্কুটারের পা আটকে যায়। ইদানীং অবশ্য আরও উন্নতি হয়েছে। ব্রিজের ফুটপাতে রাতে ফুরফুরে গঙ্গার হাওয়ায় ঘুমোনোর ব্যবস্থা। পাহারাদার ঘুমোচ্ছে, ঘুমোচ্ছে ভবঘুরেরাও। একেবারে সহাবস্থান নীতি। আর ওই নীতির ফলেই একদিকে দ্বিতীয় ব্রিজের প্রলোভন, অন্যদিকে বন্দর কর্তৃপক্ষের বিদেশি বিশেষজ্ঞদের দেওয়া সার্টিফিকেটের দিকে তাকিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সেই ভয়ংকর দিনের জন্য। অপেক্ষার পালা যদি কোনদিন শেষ না হয়, তবেই সব থেকে ভাল। আসুন, সকলে মিলে এটাই প্রার্থনা করি। □



শুরুতেই শেষ ?



ফটো : অচিন্ত্য রায়

'বন্দর কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমিই কাল'

দ্বিতীয় হুগলি সেতু সুদীর্ঘ ২০ বছরেও তৈরি হল না কেন এ প্রশ্নের উত্তর জানতে গিয়েছিলাম 'হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনের' প্রথম চেয়ারম্যান, কলকাতার ডেপুটি মেয়র মণি সান্যালের কাছে। তাঁর মতে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ (সি পি টি) বড় জাহাজ সেতুর তলা দিয়ে যেতে পারবে, এমন সেতু তৈরির একগুঁয়ে মনোভাব গ্রহণ করার জন্যই সেতু তৈরিতে অযথা দেরি হচ্ছে। বিষয়টা ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, ১৯৬৯-এ দ্বিতীয় হুগলি সেতু তৈরির প্রস্তাব আসতেই তখনকার উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রয়াত সোমনাথ লাহিড়ী বলেছিলেন, বাবুঘাটের কাছে রেল ও সড়ক যুক্ত নিচু সেতু তৈরি করতে। এতে অর্থ ও সময় দুইই বাঁচত। অন্যদিকে সি পি টি দাবি করে, তাদের পুরোনো ৯টি জেটিতে বড় জাহাজ আসবার জন্য গংগার জল মাত্রার ৫০ ফুট উঁচুতে সেতু করতে হবে। অথচ পরে সি পি টি তাদের জেটিগুলি ভেঙে ফেলেছে এবং গুদামগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে। বস্তুত হলদিয়া বন্দর চালু হবার পরে উঁচু সেতুর প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া গংগার তেমন গভীরতাও নেই।

১৯৬৯-এ পশ্চিমবংগ বিধানসভায় দ্বিতীয় হুগলি সেতুর জন্য আইন পাশ হয়। গঠিত হয় হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশন। মণি সান্যালকে করা হয় কমিশনের চেয়ারম্যান। কমিশনের অন্য সদস্যরা সকলেই সরকারি পদাধিকারী এবং তাঁদের বেশির ভাগই ইঞ্জিনিয়ার। নদীর উপর সেতু বা নিচ দিয়ে টানেল তৈরির প্রস্তাব করা হয়। কমিশন এই কাজের নকসা ও নির্মাণ প্রযুক্তির জন্য বিশ্বব্যাপী টেন্ডার দেয়। টানেল সংক্রান্ত প্রস্তাব উপযুক্ত না হওয়ায় প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয় এবং যুদ্ধ পরবর্তী কালের আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বিত 'স্টেড গার্ডার' বা ঝুলান ব্রিজ করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রস্তাবক ছিল পশ্চিম জার্মানির 'লিওনার্দ উন্ড আন্দ্রা' (এল এউ এ)।

এবার আসে প্রস্তাব বা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নকসা ও সেই সংগে কাজ রূপায়ণের টেন্ডার। এই কাজের টেন্ডার দেয় ভাগীরথী ব্রিজ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড। প্রথম সংস্থাটি গঠিত হয়েছিল বার্ন, ব্রেথওয়েট ও জেসপ কোম্পানি তিনটির সমন্বয়ে। এদের সহযোগী সংস্থা হল বিদেশি গ্যামন ইন্ডিয়া লিমিটেড। পরে এই তিনটি সংস্থাকেই সরকার অধিগ্রহণ করে। ফলে এটিও এখন সরকারি সংস্থা। সিদ্ধান্ত হয়, ৫ বছরের মধ্যে কাজ সম্পূর্ণ হবে। সেই মত, তখনকার প্রধানমন্ত্রী প্রয়াতা ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২-এ ব্রিজের ভিত্তি স্থাপন করেন। টেন্ডার বিবেচনার জন্য ব্রিজ কমিশন কয়েকজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে গঠন করে মূল্যায়ন কমিটি। এই কমিটির সুপারিশ এবং পরামর্শদাতার সম্মতি নিয়ে কমিশন ই পি আই এল এর টেন্ডার অনুমোদন করে। কমিশনের সভায় অন্যতম সদস্য কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের তখনকার চেয়ারম্যান নির্মল সেনগুপ্ত এই সিদ্ধান্তে তাঁর আপত্তি লিপিবদ্ধ করেন। সরকারি আইন অনুসারে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য টেন্ডার পাঠানো হয় রাজ্য সরকারের কাছে। পশ্চিমবংগে তখন রাজ্যপালের শাসন এবং রাজ্যপাল এ এল ডায়াস। ঐ সময় রাজ্যপালের অন্যতম উপদেষ্টা ছিলেন ঐ নির্মল সেনগুপ্ত।



বড় জাহাজের জায়গা নেই

টেন্ডারের ফাইল দীর্ঘদিন পড়ে থাকে রাজভবনে। রাজ্যপালের তথা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া হতে থাকে ভাগীরথী কনস্ট্রাকশনকে ঠিকা দেবার জন্য। কিন্তু তাতে কমিশন সম্মত না হওয়ায় রাজ্যের মুখ্যসচিব সরকারিভাবে সমগ্র কাজটি দুভাগে দুই টেন্ডারদাতাকে ঠিকা দিতে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশ নিয়ে কমিশনের সভায় এক বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়। যে সব সরকারি পদাধিকারী ইঞ্জিনিয়ার কমিশনের সদস্য হিসাবে ই পি আই এল কে ঠিকা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাঁরাই তখন আবার ব্রিজের সমগ্র কাজ দু-ভাগ করে দুদিকের রাস্তা একটি সংস্থাকে এবং গংগার ওপরের কাজ অন্য সংস্থাকে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। কমিশনের একমাত্র বেসরকারি সদস্য, চেয়ারম্যান মণি সান্যাল এই সিদ্ধান্তের সংগে একমত ছিলেন না। বন্দর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে মূল সেতুর কাজ দেওয়া হয় ভাগীরথী কনস্ট্রাকশনকে, যার পরামর্শদাতা এফ এফ পি। শ্রীসান্যাল ব্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে বি বি জে-এর পরামর্শদাতা সংস্থার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেছিলেন, ওই সংস্থা অস্ট্রেলিয়ার ইয়ারা নদীর ওপর একটি ঝুলান সেতু তৈরি করে। সেই সেতুটি সম্পূর্ণ হবার পরেই ভেংগে পড়ে। সরকারি তদন্তে নকসা ও নির্মাণের ত্রুটিও সনাক্ত হয়। ওই কোম্পানিরই তৈরি বসফরাস প্রণালীর ওপরের সেতুটিও তৈরি হবার অল্প দিনের মধ্যেই বসে যায়। আর একটি ক্ষেত্রে সেতুর স্তম্ভ বেঁকে যায়।

উল্লেখযোগ্য, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর প্রথম টেন্ডার দেবার সময় ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪০ কোটি টাকা। ঠিকা দেবার সময় ১৯৭৩-এ ব্যয় হয় ৭২ কোটি। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে টালবাহানা ও অহেতুক কাল হরণে এখন সংশোধিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫০ কোটি টাকা। ঠিকা দেবার পরে মূল পরামর্শদাতা সংস্থা ব্রিজের নকসায় আপত্তি জানায়। তা নিয়ে চলে ৫ বছর ধরে বিরোধ। পরে আপত্তি মেনে নিয়েই নকসা সংশোধন করা হয়। শুরু হয় কাজ। আরও উল্লেখ্য, নতুন পদ্ধতিতে কেবল স্টেড সেতু তৈরিতে লাগবে ১৪ হাজার টন ইস্পাত। আর বর্তমান হাওড়া সেতুতে লেগেছে ২৬ হাজার টন ইস্পাত। □

'ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই বড় এ জাহাজ



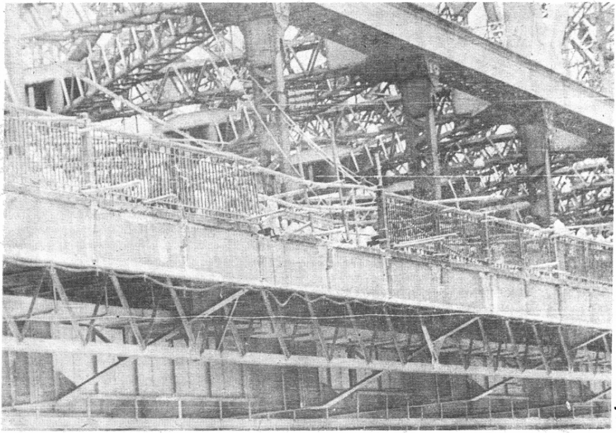
পনটুন ব্রিজ থেকে রবীন্দ্র সেতু

তখন গোটা দেশের সংগে এ রাজ্যেও ব্রিটিশ শাসকরা দাপিয়ে রাজত্ব করে যাচ্ছে। সময়টা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। জেলাগুলির সংগে সংযোগ রক্ষা করাটা খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে হুগলি নদীর দু পারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার সংগে। এপারে কলকাতা ওপারে হাওড়া। অনেক চিন্তাভাবনার পর ১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে তৈরি হল ভাসমান পনটুন সেতু। পুরো সেতু তৈরি হল বড় বড় নৌকোর ওপর কাঠের পাটাতন ফেলে। ধারে অবশ্য রেলিং ছিল। গোটা সেতুটি চওড়ায় ছিল ৪৮ ফুট। দৈর্ঘ্যে ১৫২৮ ফুট। আর এর দুপাশে ছিল সাত ফুট চওড়া ফুটপাত। এই পনটুন সেতুর অংকন ও তৈরির কাজ করেছিলেন ১৮৭১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলি। এই সেতুর সমস্ত সরঞ্জাম ইংলন্ডে তৈরি হয়েছিল। যতদূর জানা যায় এই সেতুর জন্য খরচ হয়েছিল আনুমানিক ১৪ লক্ষ টাকা। এই পনটুন সেতু প্রয়োজনে দুভাগে ভাগ করা যেত। বিশেষত যখন বড় জোয়ার আসত বা জাহাজ আসত। কিন্তু পরবর্তীকালে এটাই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দিনের বেলা জোয়ার এলে যখন ব্রিজ খুলে দেওয়া হত এবং গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যেত তখন এক বিরাট যানজটের সৃষ্টি হত। ফলে ১৯০৬ সালে আদেশ দেওয়া হল একমাত্র মাঝরাতেই জাহাজ চলাচল করবে। যাই হোক, ইতিমধ্যে ভাবা হচ্ছিল আর একটি সেতু অর্থাৎ বর্তমান হাওড়া সেতুর কথা। ডাকা হল বিশ্ব টেন্ডার। এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬ সালে ক্লিভল্যান্ড ব্রিজ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি বরাত পেল। সেতুর নক্সা তৈরি করলেন মেসার্স রেন্ডল পামার অ্যান্ড ট্রিটান সংস্থা। সেতুর সাব-কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিল মেসার্স ব্রেইথওয়েট, বার্ন অ্যান্ড জেসপ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। আর এই সেতুর সমস্ত লোহা যোগান দিয়েছিল মেসার্স টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড। মোট ইস্পাত লেগেছিল ২৬,৫০০ টন। গোটা সেতুটি দুইটি ক্যান্টি লিভার আরম দিয়ে ঝুলান। যার এক একটি দৈর্ঘ্যে ৪৬৮ ফুট, প্রস্থে ৫৬৪ ফুট লম্বা। আর অন্যদিকে টেম্যার আরমটি ৩২৫ ফুট লম্বা। এবং টেম্যারটি রাস্তা থেকে ২৯৫ ফুট উঁচুতে।

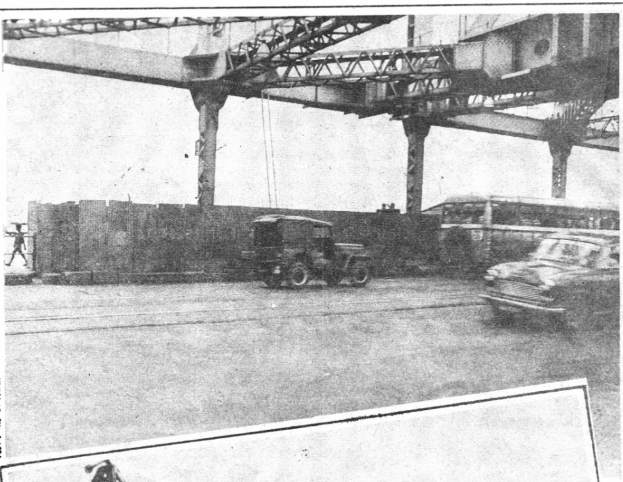
এইভাবে সব-সহ সেতুটির দৈর্ঘ্য ২,১৫০ ফুট। এই সেতু দিয়ে একেবারে চারটি গাড়ি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারবে। এছাড়া দুটো ট্রাম লাইন তো আছেই। সেতুর দুধারে রয়েছে ১৫ ফুট চওড়া ফুটপাত। সেতুর কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৩৭ সালে এবং ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গাড়ি চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

সেই '৪৩ সাল থেকেই সেতুর ওপর দিয়ে যাতায়াত বেশ ভালই চলছিল। একটু বলে রাখা ভাল এই সেতুর দেখভাল করার দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ, সেই ১৯৪৩ সাল থেকেই। তবে এর অর্থ জোগানোর কথা রেলের। সেই ১৯৪৩ সাল থেকেই যদি কোন লরি এক কুইন্টাল মাল নিয়ে যায় তাহলে তিন পয়সা এবং কোন যাত্রী যদি হাওড়া থেকে টিকিট কেটে রেলে করে কোথাও যায় তা সে লিলুয়াই হোক আর লখনউ হোক তাহলে দু পয়সা করে জমা রাখে। আগে টিকিটে লেখা থাকত 'হাওড়া সেতু কর বাবদ দু পয়সা।' এখন সে পাঠ উঠে গেছে। এখন অনেকে, এমনকি এই প্রতিবেদকও অনেক রেল কর্মচারীর সংগে কথা বলে দেখেছেন তারাও জানেন না এই কর নেওয়া হয় কি হয় না। তবে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল এখনও রেল যাত্রীপিছু এক পিঠ ভ্রমণের টিকিটে দু পয়সা, দুপিঠে চার পয়সা, মাসিক টিকিটে ২৫ পয়সা, ত্রৈমাসিক টিকিটে ৭৫ পয়সা করে নেয়। যদিও টিকিটে এখন আর কিছু লেখা থাকে না। যদি লেখা থাকত তাহলে এখন হাওড়া সেতুর বদলে 'রবীন্দ্র সেতু' লিখতে হত। কারণ এর মধ্যে সেতুর নাম পাল্টে গেছে। তবে পয়সা আদায় বন্ধ হয়নি। পূর্ব রেলের এক হিসাব থেকে দেখা যায় ১৯৮৪-৮৫ সালে তারা যাত্রী টিকিট থেকে প্রায় ৪ লাখ টাকা, ৮৫-৮৬ সালে প্রায় ২.৫ লাখ টাকা এবং ৮৬-৮৭ সালে প্রায় ৩.৪৫ লাখ টাকা কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন রবীন্দ্র সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মেটাবার জন্য। টাকা আদায়ের পরিমাণ ৮৪-৮৫ সাল থেকে ৮৫-৮৬-তে

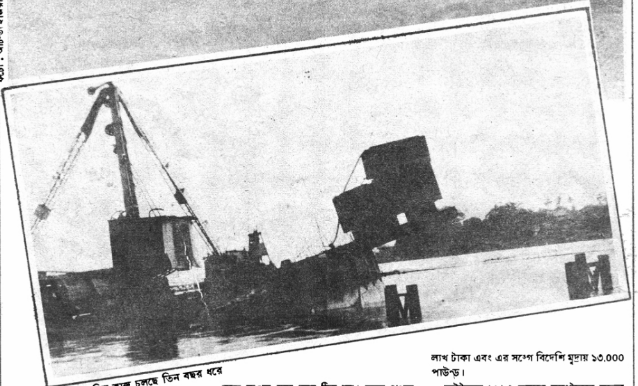
লরির গংগাপ্রাপ্তি ঘটেছিল বাঁশ বাঁধা অংশ দিয়ে



ফটো : তপন মুখার্জি



ফটো : অচিন্ত্য হাজরা



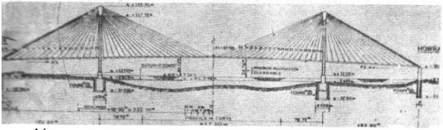
পিলার তৈরির কাজ চলছে তিন বছর ধরে

কম হল, এমন কি ৮৬-৮৭ সালেও – এর উত্তরে পূর্ব রেলের জনৈক মুখপাত্র বলেন ওই দু বছর তাঁরা পুরো হিসেব সংগ্রহ করতে পারেননি।

৮০ দশকের গোড়ায় ঠিক হয় ব্রিজটির বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। ১৯৮২ সালে ফেব্রুয়ারিতে মেসার্স র‍্যান্ডেল পামার এবং ট্রিটান কোম্পানি সেতুটি সম্পর্কে সমীক্ষার কাজ করতে সম্মত হয়। পরে এক ভারতীয় সংস্থাকে এই কাজ দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়। তারা প্রথমে এগিয়ে এলেও পরে পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত রেল ইন্ডিয়া টেকনলজি অ্যান্ড ইকনমিক সার্ভিস সংক্ষেপে 'রাইটস' এই কাজ করতে রাজি হয়। তারা এর জন্য লন্ডনের রেন্ডল পামার অ্যান্ড ট্রিটান (আর পি টি), কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (সি ই এস) নয়া দিল্লি, এবং সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সি আর আর আই)-এর সাহায্য নেয়। কাজটা দুভাগে হবে বলে ঠিক হয়। এর জন্য প্রথম ভাগে লাগবে ভারতীয় মুদ্রায় ৫.৮ লাখ টাকা এবং এর সংগে বিদেশি মুদ্রায় ১৩,০০০ পাউন্ড।

রাইটসকে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে সেতুর পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হল। রাইটস অন্যান্য সংস্থার সংগে কাজ করে রায় দিল সেতুর অবস্থা ভাল। এর আগে একটু বলে নেওয়া উচিত এই সমস্ত কাজের ইন্সপেকশনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ন্যস্ত হল কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের ওপর। অর্থাৎ আগের কথা মতই এই দায়িত্ব দেওয়া হল। আর এও ঠিক হল প্রথম দফার কাজ খতিয়ে দেখে তারপর দ্বিতীয় দফার দায়িত্ব দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত উভয় দফায় ডেক পদ্ধতির

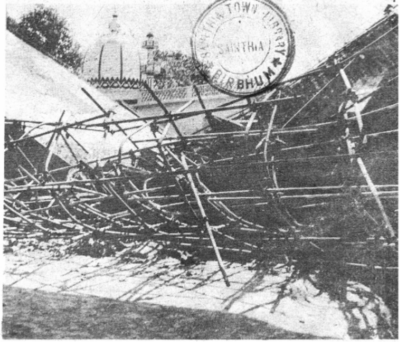
[redacted]



দ্বিতীয় হুগলি সেতু

১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারিতে হাওড়া ব্রিজ তথা বর্তমান রবীন্দ্র সেতু মানুষ ও যান চলাচলের জন্য খুলে দেবার দু দশকের মধ্যেই দেখা যায় এই সেতু কলকাতা ও হাওড়ার সংযোগ রক্ষার দায় সামাল দিতে পারছে না। তখন কলকাতার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমীক্ষা ও পরিকল্পনা তৈরির কাজ করছিল 'কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন' তথা সি এম পি ও। এই সংস্থা হাওড়া ব্রিজের নকসাকার ব্রিটেনের রেনডেল, পামার অ্যান্ড ট্রিটন সংস্থার সংগে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। এবং আলোচনার ভিত্তিতে পশ্চিমবংগ সরকারের কাছে দ্বিতীয় একটি সেতু তৈরির সুপারিশ করা হয়। সুপারিশে বলা হয়, ১৯৯১ নাগাদ যে যানবাহন হবে তার সংগে তাল রাখতেই দ্বিতীয় একটি সেতু দরকার এবং সেতুতে থাকবে একদিকে তিনটি গাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থা। অর্থাৎ একই সংগে ছটি গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে পশ্চিমবংগ সরকার বর্তমান রবীন্দ্র সেতুর দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিমবংগ সরকারের কাছে পেশ করা প্রতিবেদনে একথাও বলা হয় যে প্রস্তাবিত সেতু নির্দিষ্ট সময়ে তৈরি হলে হাওড়া ব্রিজের ওপর বর্তমান চাপ কমান যাবে এবং ১৯৯১ সালে দিনে ৮৫ হাজার ও পিক-আওয়ারে ঘণ্টায় ৮৫০০ গাড়ি এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। বলা হয় সেতুটি তৈরি হয়ে গেলে কলকাতা বন্দরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার কাজও সহজ হবে এবং সমগ্র পূর্ব ভারতে তার প্রভাব পড়বে। এই যোগাযোগ হবে ৬ নং জাতীয় সড়কের মাধ্যমে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সংগে, ২ নং জাতীয় সড়ক ধরে দিল্লির সংগে এবং ৪১ নং জাতীয় সড়ক পথে হলদিয়ার সংগে।

সেতুটি সম্পূর্ণ হলে এটিই হবে বিশ্বের

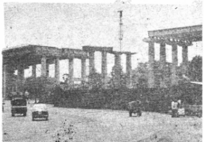


ফটো : অচিন্ত্য রায়

দীর্ঘতম 'স্টেড গার্ডার ব্রিজ'। দুপাশের ২ জোড়া ইস্পাতের স্তম্ভের সংগে ১৫২টি (এক একটি স্তম্ভের এক দিকে ১৯টি করে) ইস্পাতের তার দিয়ে সেতুর মধ্য অংশকে ঝুলিয়ে রাখা হবে। মধ্য অংশ থেকে প্রতিটি স্তম্ভের দূরত্ব হবে ৬০০ ফুট করে। (১৮২.৮৮ মিটার)। আর সেতুটির দৈর্ঘ্য হবে ১,৫০০ ফুট (৪৫৭.২ মিটার)।

ব্রিজের দুদিককার গতিপথে প্রতি দিক ১২.৩ মিটার চওড়া হবে এবং দুপাশেই থাকবে ২.৫ মিটার চওড়া ফুটপাত। সেতুর নিচে জাহাজ পথ (নাব্য অংশ) হবে ৩৩.৮৭ থেকে ৩৪.৩৮ মিটার। স্তম্ভগুলির (৪টি) নিচের অংশ হবে ৩.৯৬ মিটার বর্গ। স্তম্ভগুলি ক্রমশ সরু হয়ে উপরে উঠবে। সেতুটি তৈরি করার দায়িত্ব পায় হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স-এর এক প্রবীণ ঠিকাদার ভাগীরথী ব্রিজ কনস্ট্রাকশন কোম্পানি।

কলকাতার দিকের পথ তৈরি করছে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট এবং হাওড়ার দিকের দায়িত্ব হাওড়া ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের। কলকাতার দিকের রাস্তার দূরত্ব ৫২৭ মিটার। তবে কয়েকটি গলি পথ মিলে দৈর্ঘ্য হবে ৭.৫ কিমি। আর হাওড়ার দিকে দূরত্ব ৮৭৫ মিটার হলেও গলি পথ মিলে ৭.৮ কিমি।



ফটো : জয়ন্ত চৌধুরী

ব্রিজে ব্যবহৃত ইস্পাতের মোট ওজন হবে ১৩ থেকে ১৪ হাজার টন। দ্বিতীয় হুগলি সেতু কমিশনার্স-এর এক মুখপাত্র বলেন, ৪০ হাজার কিউসেক জল গংগায় প্রবাহিত হবে এবং গংগার নাব্যতা বাড়বে ধরে নিয়েই উঁচু সেতু করার কথা ভাবা হয়েছে। □

[redacted]

কাজেই ১৯৮৬ সালের শেষ পর্যন্ত হয়ে যায়।

এছাড়াও সেতুর চার কোণায় স্টিনগার ঠিক করার জন্য, যা প্রায়ই জলে খেয়ে গেছে মেসার্স বি বি জে কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হল। এর জন্য খরচ হয়েছে ২৪ লাখ টাকা। কাজ এখনও চলছে। কিন্তু এত লাখ লাখ টাকা খরচ করেও রবীন্দ্র সেতু ক্রমশ বিপদের কারণ হয়ে উঠছে। কয়েক বছর আগে একটি ছেলে গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে না বলে ঠেলতে গিয়ে সেতুর মাঝখান দিয়ে নদীতে পড়ে গেল। আবার এই সেদিন একটি ট্রাক সেতুর রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে গেল। জীবনহানি ঘটল আর ওই ট্রাক ওঠানর ব্যাপারে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করলে একটি বেসরকারি সংস্থা সেই ট্রাক নদী থেকে স্বল্প চেষ্টায় তুলতে সক্ষম হয়। ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষের লজ্জায় মুখ ঢাকবার জায়গা ছিল না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে এত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কিসের জন্য? শুধু কি লোক দেখান কিছু কাজ করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, না অন্য কিছু? এখনও কি কর্তৃপক্ষের নড়েচড়ে বসার সময় হয়নি? □

লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ....

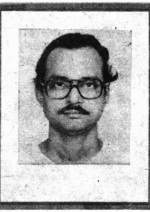
সামনের লম্বা সিটে তিনজন সহযাত্রীর কথাবার্তায় কান দিতেই হল। তাঁদের মধ্যে একজন এ মাসে পাঁচটা বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনের ধাক্কা সামলাচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রায় হাজার দুয়েক টাকা গলে গেল অথবা যাবে। ম্রিয়মাণ ভদ্রলোক কিন্তু একথাও স্বীকার করলেন যে যাঁদের উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর এত টাকার ধাক্কা সামলাতে হচ্ছে তাঁর কাজে-কম্মেও তাঁরা ওরকমই ধাক্কা সামলেছেন।

অতএব কর্তব্যটা এড়াবার উপায় নেই। তা তিনি কর্তব্য করুন, দায়িত্বপালন করতেই থাকুন কিন্তু তাঁর আর এক বন্ধুর তাতে সায় নেই। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'কিছু নেবও না, কিছু দেবও না।' বাকি রইলেন যিনি তিনি কিন্তু দুপক্ষের মাঝখানে কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়লেন। বাঁধা রোজগারের মানুষের ক্ষেত্রে যেমন এ ধরনের অতিরিক্ত খরচ-খরচাটা বেশ চাপ সৃষ্টি করে তেমনি খালি হাতেও কি লোকের বাড়িতে যাওয়া যায় কিছু একটা না নিয়ে গেলে যে প্রেস্টিজ থাকে না। যাঁর হাজার দুয়েকের বাড়তি দায় সামলাতে হচ্ছে তাঁর করুণ পরিস্থিতিটা বেশ টের পাওয়া যায়। আর যিনি কিছুই দেন না এবং নেনও না তাঁর যেকোন বিয়েবাড়িতে গিয়ে অপ্রস্তুত হবার ছবিটাও চোখের সামনে ভেসে উঠল। এটাকে কেবল চলতি বাসে সময় কাটানোর গালগল্প ভেবে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। এটা মধ্যবিত্তের নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যা।

বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, সাধ, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন – বাঙালির সমাজে অনুষ্ঠানের অন্ত নেই। আর এ ধরনের অনুষ্ঠান মাত্রেই একটা বড় রকমের খরচের ধাক্কা। অনুষ্ঠান এড়ানো যাবে না। তাহলে পরবর্তী সময়ে পস্তাতে হবে। নিজের বাড়ির কাজে সকলেই না আসার নানান অজুহাত দেখাবেন। অতএব নেমন্তন্নর কার্ড হাতে চুপচাপ কিল খেয়ে কিল হজম করার ব্যাপার আর কী! হেঁ হেঁ, তা বেশ, তা বেশ করে নেমন্তন্ন স্বীকার করতে হবে আর মনে মনে টেনশন ভোগ, স্ত্রীর সংগে মন কষাকষি, কাকে কী দেওয়া হবে সেই নিয়ে খাবার টেবিলে রীতিমত জল্পনা-কল্পনা। টুলুবৌদির ছেলের বউয়ের সাধ। একটা ভাল তাঁতের শাড়ি অন্তত দিতেই হবে। খোকনের একমাত্র ছেলের বিয়ে। ওখানেও শাড়ি এবং সেটা সিল্কের। হারুকাকুর নাতির অন্নপ্রাশন। একটা দু'পয়সার আংটি দিতেই হবে। ন'পিসির মেয়ে তুতুনের বিয়ে ওখানেও শাড়ি তো চাই-ই। এরকম আরো হাজারো অনুষ্ঠান। এঁরা সকলেই যেহেতু আমাদের কখনো না কখনো বেশ কিছু দিয়েছেন, অতএব আমাদেরও দিতে হবে। এভাবেই চলে আসছে দীর্ঘদিন। এই দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারটা এখন আর পাঁচটা প্রথার মত আমাদের অনেকেরই ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাদের মনে চেপে বসে গেছে। মাসের প্রথমেই হোক আর শেষেই হোক অনুষ্ঠানের ধাক্কা সামলাতেই হবে। প্রথম দিকে হলে তবু সংসারের অনেক বাজেট কেটে-ছেঁটে ম্যানেজ করা যায়, শেষের দিকে কুড়ি-বাইশের পর থেকেই তো টান। অতএব ধার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আত্মীয়-স্বজনের সকলের অবস্থা সমান নয়। কেউ বড় চাকুরে, কেউ দিন আনে দিন খায়। তবু উৎসব অনুষ্ঠানে সামা রক্ষা করতেই হবে। সেখানে গরিব সেজে গেলে উপহাসের পাত্র হতে হবে। বড়লোক আত্মীয়ের সম্মান, নিজের সম্মান সব জড়িয়ে সে এক বিদিকিচ্চিরি অবস্থা। শুকনো মুখে, সেজে-গুজে বৌ ছেলে-মেয়ে, নাতিপুতির হাত ধরে যেতে হবে বিয়েবাড়ি কি যে কোন অনুষ্ঠানে, সকলের সামনে উপহারের বাক্সটা তুলে দিতে হবে যথাস্থানে, তবেই রক্ষে। সামনাসামনি কেউ অপ্রিয় বাক্য বলেন না কিন্তু আড়ালে আবডালে ফিসফিস চলবে, বাঁকা চোখের চাউনি, উদাসীনতা – এসব সহ্য হয় না কারুরই। অতএব উপহারের বাক্সটা আঁকড়ে ধরে পৌঁছতেই হবে সময় মত।



যাঁরা উৎসব অনুষ্ঠানে লোকজনকে নেমন্তন্ন করেন তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু পাওয়ার লোভে তা করেন না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার-আপনার ঘরের মেয়েলি মহলে ব্যাপারটা সে পর্যন্তই পৌঁছে যায়। বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে দেখেছি যে বউয়ের পাশে কেউ না কেউ পেন খাতা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কে কী দিল তার লম্বা ফিরিস্তি তৈরি হচ্ছে। অথবা সাবধানী চোখ সদাসতর্ক পাহারায় উপহারের জিনিসপত্র আগলে রাখছে। তারপর কাজকর্ম মিটে গেলে সেই রাত থেকে শুরু করে পরের কয়েকদিন হিসেব-নিকেশ। কে কী দিল। কী কী জিনিস বাজে, কী কী কাজের, কোনগুলো অকাজের – কোনটার কী দাম, লেবেল ছেঁড়া জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে দামের আনুমানিক হিসেব পেশ ও অনুমোদন, নগদ টাকার পরিমাণ, শাড়ি, গয়না, বাসনপত্র, আরো কত কী। নতুন বৌ কী কী পেল দেখার জন্য পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক আসা তো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যেই পড়ে। এরপর আছে সমালোচনার ঝড়। সেজ বৌদির বাড়ি থেকে ওরকম ঝিয়ের শাড়ি দেবার দরকার কী ছিল, নারান পিসেমশাইরা কি একটা সিল্ক দিতে পারত না, অফিস থেকে তিরিশজন মিলে ঐ দেয়াল ঘড়ি আর বন্ধুদের সরবত সেট! মাগো! কী কিপটে। যারা গতকাল ছিল আদরের তারা হয়ে গেল পর। আর যাদের সংগে গতকালও ছিল আদায়-কাঁচকলায় তাদের ভাল ভাল উপহারের গুণে তারা হয়ে গেল আত্মার প্রিয়জন। উপহারের এমনি মাহাত্ম্য। এসব অপ্রিয় হলেও সত্য। পাবার অংশটা থাকে অবচেতনে। ওপরে থাকে আতিথেয়তা, সামাজিকতার ঘেরাটোপ। বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন না হয় বাদই দিলাম, এখন শ্রাদ্ধ বাড়িতেও মিষ্টির প্যাকেট হাতে ঢোকার একটা চল



'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ।' সচেতন শব্দবিপর্যয়ে এত বড় ঠাট্টা আর দ্বিতীয় হয় না। নিমন্ত্রিত জনের অর্থসংগতি এবং হৃদয়বৃত্তির ওপর কঠিন কটাক্ষও বটে। লৌকিকতা যেন আশীর্বাদের বিরোধী। তাহলে 'লৌকিকতা' বর্জনীয় এমন স্পষ্ট ঘোষণা হয় না কেন? কিংবা প্রত্যাখ্যান? বরং দেখবেন, এই বিনম্র আবেদনের পর একজনকে কাগজ-কলম হাতে নববধূর পাশে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে আপনার হাত যদি আশীর্বাদের জন্য মুক্ত থাকে তাহলে নীরব পরিহাসে বুক ভারি করে বাড়ি ফিরতে হবে। উপেক্ষা করবেন, উপায় কী? বাড়ির কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি। তাঁর পরিহাস যথেষ্ট সরব। তাছাড়া আশীর্বাদ মাপার যন্ত্র তো এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। লৌকিকতাতেই তার পরিচয়। আপনার সম্মানেরও। সুতরাং –।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
প্রধান শিক্ষক
কালীধন ইনস্টিটিউট

হয়েছে। যাঁরা অশৌচ পালন করছেন তাঁদের ফল মিষ্টি দেওয়াটা প্রাচীন রীতিনীতির মধ্যেই পড়ে। তবে সেটা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সেটা অনাত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিয়েতে সালংকরা কন্যাদান, আশীর্বাদ এসবের প্রচলন আজকের নয়, পৈতেতে ভিক্ষে দেওয়ার রীতিনীতিও অনেক পুরনো। তবে দুটো ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা ছিল আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজ কিন্তু পরিস্থিতি অন্যরকম। বউভাতের দিন নতুন বউ, পৈতে হওয়া ছেলে, অন্নপ্রাশন হওয়া দুধের ছেলেমেয়ের মা – সকলেই আজ সক্রিয়। উপহার হাতে করে আসা নিমন্ত্রিত মানুষটির হাত থেকে মনোযোগী হয়ে বাক্সটি হস্তগত করাই লক্ষ্য। এ যেন সেই ফুটবল ক্রিকেট-হকির দলবদলের সুযোগে ঘরগুছোনোর লড়াই। ওখানে অন্যমনস্কতা মানেই বিরাট ক্ষতি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে বউয়ের ঘরে ঢুকে যাঁরা পরিচিত হন তাঁরা অধিকাংশ বউ দেখার সুযোগ পান না ভাল করে। কেবল ঝটিতি বাক্স হস্তান্তর করা আর পরের বাক্সকে সুযোগ করে দিয়ে বেরিয়ে আসা। সব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই এ একই ব্যাপার। যাঁরা পরিচয় করিয়ে দেন, যিনি পরিচিত হন আর পরিচয়ের পাত্রী অথবা পাত্র যেন উপলক্ষ্য মাত্র, আসল ব্যাপার হল ঐ বাক্স দান। মোট কথা উৎসব অনুষ্ঠানে উপহারের প্রসংগটা মধ্যবিত্তদের কাছে বছরের প্রায় সব মাসেই একটা কাঁটার মত খচখচ করে অস্বস্তি বাধায়।

বোধহয় এই অস্বস্তি দূর করার জন্যই কিছু মানুষ উৎসব-অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়া-নেওয়ার অলিখিত বাধ্যতাকে মুছে ফেলতে চাইছেন। আমন্ত্রণপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা থাকছে 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ কাম্য' কিংবা 'উপহার বর্জনীয়' ইত্যাদি। আমাদের প্রথাবদ্ধ দায়দায়িত্বের ঐ অলিখিত হিসেব যাঁরা উল্টেপাল্টে দিচ্ছেন তাঁরা নিশ্চয়ই নতুন কিছু করছেন। আমন্ত্রণলিপিতে নিজেদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা জানিয়ে দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই স্পষ্টতা আছে। এঁরা নিজেদের আনন্দকে একা একা ভোগ করতে চান না, আবার তাঁদের আয়োজিত আনন্দ-অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আসা মানুষকে উপহার নিয়ে আসার মানসিক চাপ দিতে চান না। এঁদের মনের উদারতা, টাকা-পয়সা, অন্যান্য উপহারের প্রতি এঁদের নির্লোভ উদাসীনতা নিশ্চয়ই সাধুবাদ পাবার যোগ্য। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব পরিচিতদেরও বাড়তি টেনশন থাকে না, অর্থের বিনিময়েই মানুষের সম্পর্ক অস্পষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাটুকুও দূর হয়ে যায়। কেউ কারুর প্রতি দায়বদ্ধ নন, এটা আনন্দকে নির্মল করে তোলে। এঁরা কারুর উপহারের প্রত্যাশা বা আনুমানিক প্রাপ্তির স্বপ্নে বাজেট তৈরি করেন না, এঁদের আনন্দ কেবল মানুষ জনের সান্নিধ্য পাওয়ার মধ্যে নিহিত। সত্যিই ব্যাপারটার মধ্যে ভাবনার অবকাশ আছে। এরকমই লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ কামনা করে বিয়ে করল বেলুড়ের ধর্মচক্র নিবাসী কালীপদ সামন্ত নামে এক যুবক। সে বেশি দূর লেখাপড়া শেখেনি। ভালবেসেছিল তারই সহপাঠিনী তন্দ্রাকে। গত ১৩ মে ১৯৮৮-র সকালে তাদের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেল। সন্ধেবেলার চা-পান পর্বে কিন্তু অনেকেই উপহারের লৌকিকতা নিয়ে হাজির হলেন। বিব্রত কালীপদকে আরও বিব্রত করে তাঁরা অনেকেই তার স্ত্রী হাতে উপহারের বাক্স গছিয়ে দিলেন। একটু সুযোগ পেতেই কালীপদর কাছে তার অনুভূতির কথা জানতে চাইলাম। সে বিশেষ কিছুই বলতে পারল না। কেবলই ঘাড় নেড়ে বলতে লাগল – 'বিশ্বাস করুন, এসবে আমার প্রয়োজন ছিল না।'



বিয়ে, পৈতে, মুখেভাত – ব্যাপারগুলো বৈদিক যুগে ধর্মাচরণের একেকটা অঙ্গ ছিল। সেখানে যাঁরা আমন্ত্রিত হতেন তাঁরা নবদম্পতিকে বা নতুন ব্রহ্মচারীকে আশীর্বাদ জানাতেন এবং কিছু উপহার দিতেন। আশীর্বাদটাই 'লক্ষ্য' ছিল – উপহারটা ছিল 'উপলক্ষ্য'।

ধীরে ধীরে ব্যাপারটা বদলে গেল। এইসব কাজকর্মের ধর্মীয় দিকটা ছেড়ে এখন লোকাচারটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আমরা এসব কাজে লোককে নেমন্তন্ন করি এবং তাঁরা এসে উপহার দেন কেবল সামাজিকতা করতে। 'আশীর্বাদ' ব্যাপারটা উঠেই গেছে। সুতরাং একটা লোকাচারের জবাবে আরেকটা লৌকিকতা করলে দোষ কী?

তবে আরো দুঃখের কথা কী জানেন, 'কাজের বাড়ি'তে আজকাল উপহারের অর্থমূল্যটাই তথাকথিত আন্তরিকতার মাপকাঠি ধরা হয়। আপ্যায়নেরও। অন্তত শতকরা ৯০টা ক্ষেত্রে। কিন্তু সকলের অর্থনৈতিক ক্ষমতা তো সমান নয়। ফলে অনেকের কাছেই নেমন্তন্ন রাখতে যাওয়াটা দায় হয়ে ওঠে। আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও থাকে না।

তাই বলি, 'লক্ষ্য'টা তো গেছেই, 'উপলক্ষ্য'টাকেও বাদ দিয়েই দেখা যাক না – খালি হাতে নেমন্তন্নবাড়ি গেলে অন্তত গেট-ক্রোগেদারটা অনাবিল হবে।

আর আরও ভাল হয়, যদি সেই সংগে 'প্রীতিভোজ' প্রথাটাও তুলে দেওয়া যায়।

অমৃতা মুখোপাধ্যায়
প্রাক্তন ছাত্রী : বেথুন কলেজ

এসবে অনেকেরই আজকাল অনীহা এসেছে তবু কালীপদরা অসহায়। নেমন্তন্ন খেতে কেউ খালি হাতে যেতে নারাজ। আর ঐ 'লৌকিকতার পরিবর্তে' শব্দগুলোই যেন আরো বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে। ওটা যেন আমাদের আরও খুঁচিয়ে তুলছে। আশীর্বাদ কি আর এমনি হয়? স্মারক তো চাই-ই। অতএব ওদের লেখার কথা ওরা লিখেছে, আমাদের বিবেককে কি আমরা ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারি?

যাঁরা 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ' চালু করার চেষ্টা করছেন তাঁদের পক্ষে লোক কম। লেখা সত্ত্বেও অনেকেই যখন বাক্স হাতে করে ঢুকছেন তখন মিনমিনে গলায় কেউ কেউ প্রতিবাদ করছেন বটে – সে প্রতিবাদ ধোপে টিকছে না। তাঁদের অনেকেই ধমক-ধামক দিয়ে বাক্স গছিয়ে খাবার ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছেন। খুব কট্টর মানুষ আর কজনই বা আছেন! অতএব উপহারের পালা চলছে। বলা যায় বেশ রমরমিয়েই চলেছে। তাহলেই প্রশ্নটা উঠছে যে, কেন হাজার অসুবিধে সত্ত্বেও মানুষ ধার করে হলেও কিছু না কিছু উপহার উৎসবে-অনুষ্ঠানে দিয়েই চলেছেন? মাসে পাঁচটা-ছটা নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে কেনই বা তাঁরা বাজেটের বাইরে বাড়তি টাকা পয়সার ধাক্কা সামলাচ্ছেন? উত্তর খুঁজতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত, শিক্ষক, উকিল, গৃহিণী, কর্তা, ছাত্রছাত্রী, পুরোহিত, ব্যবসায়ী – সকলের কাছে গিয়ে মোটামুটি উপহার দেবার সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তিগুলি পেয়েছি তা একটু দেখা দরকার।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষত অবাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে উপহার দেবার রীতি রয়েছে। সেখানে ফ্যাশন হিসেবে এটা চালু নেই। বরং এর পেছনে রয়েছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। নব-দম্পতিকে তাদের আসন্ন নতুন জীবনে কিছু দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়াই সেখানে উদ্দেশ্য। বাবা, মা, নিকট আত্মীয়দের দায় এখানে প্রধান কিন্তু অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবও স্বেচ্ছায় আনন্দসহকারে এর সামিল হন।

নিছক কাউকে কিছু দিয়ে মনে আনন্দ পান এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। দিয়েই যাঁদের সুখ তাঁরা লৌকিকতারই পক্ষপাতী। কাউকে কিছু দিতে পারলে যেন নিজেকে তাঁদের বেশ তৃপ্ত বলে মনে হয়। এছাড়াও স্মারক দিয়ে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তাকে বজায় রাখা যায়, সমাজবদ্ধতার দায়ও রক্ষা পায়। অনেকে বলেন যে, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান সবক্ষেত্রে তো সরকারি নথিভুক্ত হয় না। অতএব স্বীকৃতির প্রয়োজনটা থেকেই যায়। সেই স্বীকৃতিই হল উপহার। সদ্য বিবাহিত দম্পতির নতুন জীবনের সঞ্চয়ের ভেতর আমার স্মারকটি সযত্নে জায়গা পেল – উপহার এদিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ।

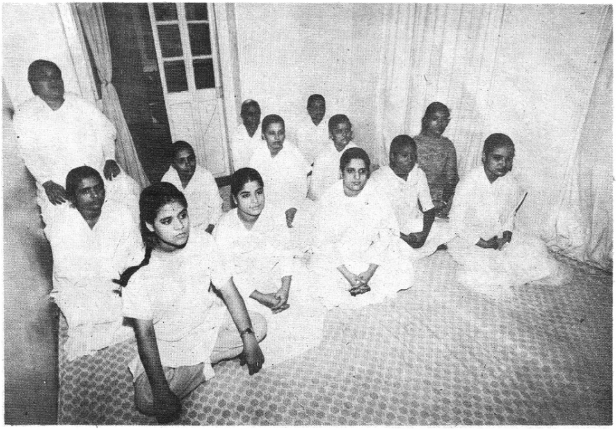
মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক দুরবস্থার দুর্বিপাকে মানুষের মন বড় সংকীর্ণ, বড় আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে উৎসব-অনুষ্ঠানের চওড়া উঠোনে দাঁড়িয়ে উপহার হাতে নিজেকে বড় তৃপ্ত বলে মনে হয়। উপহার দেওয়ার প্রবণতা সে কারণেই। উপহার দেওয়ার প্রবণতা কখনও কখনও স্ট্যাটাস সিম্বল হয়েও ধরা পড়ে। এটা আভিজাত্য বা জাঁক-জমক দেখাবার সূত্র হয়ে এসে পড়ে। আমার আছে, অতএব আমি দেব এই সোজা কথাটা বিত্তবানদের পক্ষে অত্যন্তই সোজা।

লৌকিকতার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি তর্ক আছে। তবে পক্ষেই যুক্তি বেশি। মানুষ-জনের সঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে যা মতামত পেয়েছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা করলাম। তবে পক্ষে-বিপক্ষে যাই মতামত থাক না কেন, আমার মনে হয়েছে যে এটা একটা বিশেষ ক্রেজ। যদি পেছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে পঞ্চাশের দশকের পর থেকেই এই ক্রেজটা ক্রমশ বাড়ছে এবং মধ্যবিত্ত, অভাবী মানুষের পক্ষে ব্যাপারটা টেনশনের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। উপহার দেওয়া না দেওয়াটা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার হয়ে থাকছে না। অলিখিত হলেও এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। বিত্তবানদের পক্ষে যা লৌকিকতা তা কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যন্ত্রণা। যাঁরা উপহার দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে উদার এবং স্বতঃউৎসাহী তাঁদেরও দেখা যায় নিমন্ত্রণের চাপ সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। আর্থিক চাপ সহ্য করেও মানুষকে সামাজিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য উপহার নিয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে করুণ চোখে উপস্থিত হতে হয়। অফিস কারখানা বন্ধ দীর্ঘকাল। অথচ সংসারের নিয়ম কিংবা চাহিদা এসব বোঝে না। এমন অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে বিয়ে-থা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। হাতে পয়সা নেই। অথচ কিছু নিয়ে যেতে হবেই। সেক্ষেত্রে গৃহস্থের পক্ষে কী নিদারুণ মানসিক কষ্ট সহ্য করতে হয় তা ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। হয়তো ইচ্ছে থাকলেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। নিজের অনিচ্ছাতেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়। কোথায় যেন সব নিমেষে গোলমাল হয়ে যায়। লৌকিকতার এই দুঃখজনক প্রতিক্রিয়াটির কথা ভাবলে মনে হয়, শুধু আশীর্বাদই বোধহয় ভাল ছিল। আর তাছাড়া বিয়ে থা-র অনুষ্ঠানে কিছু পাওয়ার প্রসঙ্গটা এমনই জোরালো হয়ে উঠেছে যে উপহার দেওয়া বা পাওয়ার সেই মাধুর্যটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমার মতে উপহারটা থাক। তবে সেক্ষেত্রে মানুষকে পারস্পরিক ক্ষেত্রে সৎ হতে হবে। স্ট্যাটাস সিম্বল দেখাতে উপহারের দায় সামলাতে মানুষ যেন অর্থনৈতিক চাপে না পড়েন, সেটা দেখা-বোঝা দরকার। যে যাই দিন না কেন, খুশি মনে তা গ্রহণ করা উচিত। জানি, সামনে সমালোচনা কেউ করেন না। আড়ালেও কাউকে ছোট করা বা কাউকে বড় করা মনুষ্যত্বের পক্ষে অবমাননাকর। উপহার বন্ধুত্বকে বাড়িয়ে তোলে, আত্মীয়তাকে ঘনিষ্ঠ করে – এটা কেবল দেনা-পাওনার কৃত্রিম প্রথা নয়। তবে উপহার যেন অলিখিত কোন বাধ্যতা হয়ে না দাঁড়ায়, এটাও দেখা দরকার। □



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্টুন : উদয়শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়



প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী : এক বিচিত্র ধর্মমিছিল

শুধু কলকাতাতেই নয়, সারা ভারতবর্ষে বিবাহিতদের ব্রহ্মচর্য পালনের একটি নিঃশব্দ আন্দোলন চলছে। এই ভক্তি আন্দোলনে অবিবাহিত নারী-পুরুষের সংখ্যাও কম নয়। এই ধর্মপথের দিশারী সিন্ধুপ্রদেশের লক্ষ্মীরাজ, একসময়ে কলকাতার নিউ মার্কেটে যাঁর হীরে-জহরতের রমরমা ব্যবসা ছিল। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে তিনি ভগবান শিবের নির্দেশে হলেন 'ব্রহ্মবাবা'। ধর্মীয় সংস্থাটির নাম – প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই সংস্থা ও তার ভক্তবৃন্দের বিচিত্র সাধনমার্গের এক অনুসন্ধানী বিবরণ দিয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জীবন ভৌমিক।

সত্যি করে বলুন তো, আপনাদের মধ্যে যারা বিবাহিত তারা স্বামী বা স্ত্রীর সংগে সহবাস করেছেন কি-না! আপনি অফিসে বা বাড়িতে বা রাস্তাঘাটে কোথাও কারও সংগে আজ রাগারাগি করেছেন কি-না! মনের কোণে কোনওরকম লোভ বা হিংসার প্রশ্রয় দিয়েছেন কি-না! কিংবা কখনও কি হয়ে উঠেছেন অহংকারি? বুকে হাত দিয়ে বলুন 'হ্যাঁ' কিংবা 'না।'

একটি প্রশ্নের উত্তরও যদি ইতিবাচক হয়, তবে আপনাকে বলি – আত্মাকে চিনুন, বলুন আপনি সেই পরমপিতার সন্তান, যে সন্তানের শরীর নয় – মন হবে ষড়রিপুমুক্ত। মনে রাখবেন কাম-ক্রোধ-লোভ-হিংসা-অহংকার যুক্ত আপনার এই লৌকিক শরীর নরকের হাঁ-

করা দরজার দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ আপনি চাইছেন স্বর্গীয় শান্তি, আপনি অর্জন করতে চলেছেন দেবগুণ। তাই আপনাকে মনে রাখতে হবে শরীর সর্বথা ত্যাজ্য, আপনার এই শরীর শুধু এক বিড়ম্বনামাত্র। মাছ-মাংস-ডিম-মদ-সিগারেট সব পরিত্যাগ করে অনন্ত অমৃত সুধা পান করুন।

প্রিয় পাঠক, কী ভাবছেন ? নানা অশান্তিতে জর্জরিত আপনার হেজে-মজে যাওয়া জীবনে আপনি কি শান্তির জন্যে আঁকুপাকু করছেন ? তাহলে এখানে আসুন – পরমপিতার সন্ধানে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিন। এই প্রতিবেদনের শুরুতে যে পাঠ তা এদেরই পাঠশালার পাঠ্যাংশ। এক আধিভৌতিক পরিমন্ডলে নিজের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপনি আপনার আত্মাকে পরমাত্মার সংগে বিলীন করে দেবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন এখানে। আপনার হাত ধরে যাঁরা সেই অবিশ্বাস্য অলৌকিক পথের সন্ধান দেবেন তাঁরা সবাই ব্রহ্মাকুমারী ও ব্রহ্মাকুমার (ওরফে বি কে) – ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য। সদর দপ্তর কলকাতার এলগিন রোডের মুখে ১ নম্বর আশুতোষ মুখার্জি রোড।

কলির নাকে অক্সিজেন

সদর দিয়ে ঢুকে ডানদিকে রয়েছে বইয়ের কাউন্টার। ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলায় প্রচুর বই। তার মধ্যে আবার কিছু বই 'কমিকস'-এর মত সচিত্র। যেমন একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে 'রাবণ এবং রাবণ রাজের প্রকৃত পরিচয়।' লাল টকটকে জামা পরা দশমুন্ড রাবণ। প্রধান মস্তকটির উপর একটি গাধার মাথা। রাবণের চার হাত। দু' হাতে ঢাল-তরোয়াল, অন্য দু হাতে বেদ শাস্ত্র। রাবণের পেছনে চিত্রের যে পটভূমি তাতে দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক দাংগার প্রতীক চিত্র, নারীর শ্লীলতাহানি, লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ। এই হচ্ছে রাবণ রাজ। এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারীদের মতে বর্তমান যুগ 'রাবণের' প্রভাবের অধীনে আছে। ঘরে ঘরে কলহ-ক্লেশ, লড়াই-ঝগড়া এবং দুঃখ-অশান্তি তথা ভ্রষ্টাচার, কৃত্রিমতা, অধর্ম ও অসত্যের রাজত্ব চলছে।' প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী চাইছেন পৃথিবীতে 'গান্ধীজির স্বপ্নের রামরাজ্য' স্থাপন করতে।

আরেকটা চিত্র – কলিযুগের অন্তিমক্ষণ। হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ দাঁত বের করা, মাথায় সিং লোমশ এক দৈত্যকে দেখানো হয়েছে 'অধর্ম' হিসেবে। ষড় রিপুগ্রস্ত পৃথিবীকে সে দুহাতে আগলে রয়েছে। কিন্তু পারবে কি ? পারে কখনও ! ওই চিত্রের এক অংশে দেখানো হয়েছে কলিযুগ বিছানায় শুয়ে ধুঁকছে। তার নাকে অক্সিজেনের নল গোঁজা। অর্থাৎ কলিযুগ শেষ হয়ে আসছে। শিশুরা খুব মজা পাবে।

কাউন্টারে বই আছে নানাবিধ। পড়ে বোঝা যায় এই ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় এক নিঃশব্দ ধর্মীয় আন্দোলনের সামিল।

প্রশস্ত ঘরের বাঁদিকে স্থায়ী প্রদর্শনী। দেয়াল জুড়ে টানা কাচের ঘরে এক অংশে বড় বড় মাটির পুতুল দিয়ে স্বর্গের দৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে রয়েছে শিবমূর্তি, এবং প্রভু যীশু। হলঘরের মাঝামাঝি দেয়ালে মাথার ওপরে পরমাত্মার জ্যোতিঃস্বরূপ একটা কাচের পাত্র তৈরি করে আলো জ্বেলে রাখা হয়েছে। কাচপাত্রটি রক্ত-লাল, মাঝখানে একটা বিন্দু – সেখানে লাল রং নেই। বৈদ্যুতিক বালবে বন্দী ওই জ্যোতির দিকে তাকিয়ে থাকলেই আপনার ভ্রূসন্ধিস্থলে আপনি অনুরূপ এক আলোর সন্ধান পাবেন বলে ওঁদের দাবি।



পিতাশ্রী ব্রহ্মার পদতলে রাজযোগিনী দিদি নির্মলা শান্তা

দোতলায় উপাসনা গৃহ। এবং সেখানে সকাল সন্ধ্যে ক্লাস নেওয়া হয়। অন্য ঘরে ব্রহ্মাকুমারীরা থাকেন এবং অধিক বয়স্ক ব্রহ্মাকুমারগণ। ওপর তলায় এবং নিচের তলায় দু জায়গাতেই কাচের বাক্সে রয়েছে পিতাশ্রী ব্রহ্মা এবং জগদম্বা সরস্বতীর ছবি। বাক্সের ভেতরে আলো।

জহুরির ব্যবসায়ী থেকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা

সিন্ধু প্রদেশের মানুষ লক্ষ্মীরাজ বা লেখরাজ। কলকাতার নিউ মার্কেটে হীরে-জহরতের পাইকারি ব্যবসা ছিল তাঁর। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত চুটিয়ে ব্যবসা করেছেন। লেখরাজের কন্যা নির্মলা শান্তার বয়স এখন সত্তর। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বাঞ্চলীয় হেড কোয়ার্টার আশুতোষ মুখার্জি রোডের বাড়িতে বসে নির্মলা শান্তার সংগে কথা হচ্ছিল। পরনে ধবধবে সাদা ফুল হাতা জামা, কাপড় – আপাদমস্তক ঢাকা, মুখে মায়ের মত হাসি। দেখলে শ্রদ্ধা জাগে। তিনি রাজযোগিনী দিদি নির্মলা শান্তা। এখানকার ইনচার্জ।

নির্মলা শান্তার কাছ থেকে জানা গেল, ষোল আনা সফল ব্যবসায়ী লেখরাজের মনের মধ্যে সবসময় একটা ধর্মভাব কাজ করত। নবতম এক বিশ্বরচনায়, এক ঈশ্বরীয় জগৎ সৃষ্টিকল্পে তিনিই হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। আমার এক প্রশ্নের উত্তরে ব্যবসায়ী থেকে ব্রহ্মা হয়ে ওঠার বিস্তর ফাঁক পূরণ করতে গিয়ে দিদির সামনে বসা ব্রহ্মাকুমার শক্তি কিছু তথ্য, ঘটনা দিতে চেষ্টা করলেন। ১৯৩৬ সালে লেখরাজ নাকি বেনারস-কাশী যান এবং সেখানে ভগবান বিষ্ণু লেখরাজকে দর্শন দেন। শুধু দর্শন নয়, নির্দেশও দিয়েছিলেন, পৃথিবীতে সত্যযুগ স্থাপন করতে হবে। লেখরাজকেই তা করতে হবে। এবং সেইদিন থেকেই নাকি স্বয়ং ব্রহ্মা লেখরাজের শরীরে প্রবেশ করেন, নিরাকার ব্রহ্মা লেখরাজকেই মাধ্যম করেন। এবং লেখরাজও ভগবানের নির্দেশ বুঝতে পেরে কলকাতায় ফিরে হীরে-জহরতের রমরমা

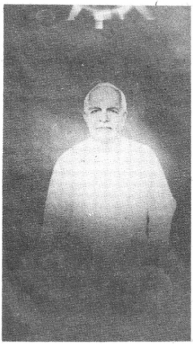
ব্যবসা ছেড়েছুড়ে দেশে ফিরে গেলেন। যাবার আগে তাঁর বাড়িতে একটি চিঠি পাঠান – 'আমি ভগবানের দেখা পেয়েছি আর আমার ব্যবসার পার্টনার পেয়ে গেল পুরো ব্যবসা। আমি ভগবানের বার্তা নিয়ে দেশে ফেরার গাড়িতে চাপছি।'

তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত, ১৯৩৭ সালে সিন্ধে প্রতিষ্ঠিত হল প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী সংস্থা। ব্রহ্মা বাবার একটি জীবনীগ্রন্থতে লেখরাজের বিষয়ে অনেক গল্প আছে – সবই তাঁর ঈশ্বরীয় চিন্তার বাহক। আমি জানতে চেয়েছিলাম, এই সংস্থার নামের সঙ্গে শুধু ব্রহ্মাকুমারী যুক্ত কেন, কুমার নয় কেন এর উত্তরে ব্রহ্মাকুমারী বিমলা বলেন, সিন্ধে যখন লেখরাজ ফিরে গেলেন ব্রহ্মার বাণী নিয়ে – সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় তিনশ নারী শুদ্ধ-পবিত্র মনে তাঁর সন্নিধানে এলেন। এঁরা সবাই হলেন ব্রহ্মাকুমারী। এঁরাই প্রথম প্রজন্ম। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাধা নামে একটি ভারি সুন্দরী মেয়ে। ওম্ রাধে। সব ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর অলৌকিক জীবনের নাম হয় জগদম্বা সরস্বতী – তিনিই যজ্ঞ মাতা।

গৃহস্থমে রহ, পরন্তু কমল ফুলকি সমান রহ

ব্রহ্মাকুমারী নির্মলা শান্তার মুখে কথাটি শুনে বেশ ভাল লাগল। জিজ্ঞেস করি, কেমন করে বলেন, পবিত্রতা-পবিত্রতা-পবিত্রতা। এঁরা যৌন-অযৌন শব্দ উচ্চারণ করেন না। মুখে আনাও পাপ। তবে বেশ কয়েকজন ব্রহ্মাকুমার ও কুমারীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায় এরা সবাই লৌকিক শরীরকে অপবিত্র মনে করেন। সেরকমই শেখানো হয়েছে। তাই শরীরের ওপর মনের সার্বভৌম এক কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা। এঁদের রাজযোগ শেখানো হয়। পরমাত্মা পরিচয়ের সাত দিনের কোর্স আছে। তাতে যে পাঠ দেওয়া হয় তার মধ্যে প্রধান পাঠ ব্রহ্মচর্য। তুমি বিবাহ কর, সংসারমে রহ, কিন্তু কদাপি সহবাস করবে না। 'জ্ঞানান্বেষী মানুষের ভয়ঙ্কর শত্রুর নাম যৌন লালসা – এই শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার বর্ম হল যোগ।'

প্রজাপিতা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা লেখরাজ



প্রজাপিতা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মা বাবার সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বাণী হিসেবে প্রচারিত পুস্তিকাগুলির মধ্যে রয়েছে যৌনতার বিরুদ্ধে ভীতি উদ্রেককারী অজস্র কথা। চরিত্র নিয়েই যেন এঁরা বেশি ব্যস্ত। জানতে চেয়েছিলাম, কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি মুক্ত হয়ে একজন মানুষের পক্ষে সংসারে-সমাজে বাস করা সম্ভব কি-না। আপনারা তো আসলে সবাইকে সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলছেন। বনে-পাহাড়ে না গিয়ে এরকম জীবন যাপন কী করে সম্ভব? এই প্রশ্ন তুলেছিলাম বেহালার ব্রহ্মাকুমার প্রাণতোষ (চক্রবর্তী), ব্রহ্মাকুমার দীপক (ভট্টাচার্য) এবং ব্রহ্মাকুমার বিষ্ণুবাহাদুর (শ্রেষ্ঠী)-এর সামনে। এঁরা সবাই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন গৃহীজীবন যাপন করেও সৎ জীবন, সৎ চিন্তায় মগ্ন থাকা যায় – ব্রহ্মচর্য পালনের মধ্যেই আনন্দ। কারণ ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীদের মিলন হয়েছে পরমপিতার সঙ্গে। এর চেয়ে বড় তৃপ্তি আর কী হতে পারে।

ব্রহ্মাকুমার প্রাণতোষ তাদের সংস্থার ধর্মভাবনার ওপর বেশ জমিয়ে ভাষণ দিতে শুরু করেছিলেন। তাকে থামিয়ে আমি দু' একটি প্রশ্ন করি। তার উত্তরে জানা গেল, ব্রহ্মাকুমার হবার সময় তাঁর স্ত্রীর গর্ভে তিন মাসের সন্তান। প্রায় দশ বছর আগের কথা। তাঁর স্ত্রীও ব্রহ্মাকুমারী হয়েছেন। দশ বছর একই সঙ্গে বাস করেও তারা সহবাসে বিরত। ওঁদের ধর্মপথে বিবাহ মানে মনের সঙ্গে মনের মিলন। ওঁদের মেয়েকে দেখলাম। এখন দশ বছর বয়স। ফুলের মত মিষ্টি মেয়ে। মেয়ের নাম রেখেছেন ব্রহ্মাজ্যোতি। ক্লাস ফোর-এ পড়ছে, নাচ শিখছে। মেয়ের বিয়ে দেবেন না। দশ বছরের এই মেয়েটিও 'পরমপিতা'র সেবায় ব্রহ্মাকুমারী হবে। বেহালার বি কে দীপক ও বি কে বীরবাহাদুর অবশ্যি বলেন যে তাদের ছেলেমেয়েদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে তারা কিছু করবেন না। এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার মনে হচ্ছিল, কুমারী পূজা, গৌরীদান দেবদাসী ইত্যাদি ধারণা ও ধর্মীয় প্রহেলিকার এক নিঃশব্দ ধর্মীয় বিপ্লব ঘটতে চলেছে এই কলকাতা শহরে বাঙালিদের মধ্যেও।

বি কে প্রাণতোষ ও বি কে দীপক আত্মা-পরমাত্মা, স্বর্গ-নরকের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হলে আমি বলি – সব ধর্মেই স্বর্গ-নরকের বর্ণনা আছে। এমন কি পাশ্চাত্য কবিদের লেখাতেও নরকের বর্ণনা রয়েছে। হিন্দুধর্মে নরকের বর্ণনা অপ্রতুল নয়। 'পুৎ' নামে এক নরক আছে। নরকের এই অংশে পুত্রহীনদের শাস্তি দেওয়া হয়। মনুসংহিতায় এই জন্যেই বলা হয়েছে 'পুন্নাম্নো নরকাৎ যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং সূতঃ' অর্থাৎ পুত্র থাকলে পিতামাতা ওই নরক থেকে রক্ষা পায়। আপনারা তো সন্তান চান না – চিরকুমার থাকতে চান, তাহলে কী হবে এর উত্তরে নানা স্ববিরোধী কথা বললেন ওঁরা। শুধু এঁরাই নন, কলকাতায় প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারীদের হেড কোয়ার্টার-এর বি কে বিমলা, রাজযোগিনী নির্মলা শান্তাকেও বোঝাতে পারিনি যে কামকেও হিন্দু ধর্ম পুরুষার্থ মনে করে – যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। জাবালিত ঋষিই ছিলেন। সংস্কারসম্পন্ন জাতক বংশ রক্ষা করেও তো নিজেকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য করে তুলতে পারেন। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে থেকে আপনারা বিবাহকে বাদ দিচ্ছেন কেন স্পষ্ট কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। নানা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কথায় বিমূঢ় হতে হয়। এ বিষয়ে ওঁদের শেষ কথা গৃহস্থমে রহ, পরন্তু কমল ফুলকি সমান রহ।

ইয়ে প্র্যাকটিক্যাল হ্যায়

এই ধর্মীয় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা লেখরাজ যেসব বাণী দিয়ে গেছেন, হেড কোয়ার্টার মাউন্ট আবু থেকে হাজার হাজার সাইক্লোস্টাইল করে সেগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাঠশালায়। সদস্যদের পাঠ্যসূচির মধ্যে যেসব বিষয় থাকে তা এইরকম আমি কে কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব ভগবানের যথার্থ পরিচয় কী শান্তি ও মুক্তির পথ কী মানুষ দেবতা এবং ভগবানের ভেদ কী ইত্যাদি যে কোনও আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান।

কলকাতায় রবীন্দ্রভারতীতে দর্শনে এম এ-র ছাত্রী মণিমালা। শ্যামবর্ণা সুশ্রী তরুণী। তিনি ব্রহ্মাকুমারী হয়েছেন। বললেন, এখানে একবার এলে, একদিন ক্লাস করলে বার বার আসতে হয়, বড় পবিত্র সব কিছু, এমন শান্তি যেন আর কোথাও নেই। সর্বকালিমামুক্ত জীবন যাপনের চেয়ে বড় আনন্দ, বড় শান্তি আর কী থাকতে পারে বলুন। আর সেই শান্তির পথ এখানেই পেয়েছি। আপনার অশান্তি কী ছিল না, তেমন কিছু নয়। তবু জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছি। নিজেকে আবিষ্কার করেছি। পাশে বসেছিলেন শক্তি ভাই এবং বিমলা বোন। মধ্যবয়সী শক্তি ভাই একজন ব্যবসায়ী। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। বললেন প্রাণ জুড়িয়ে যাবে ভাই – সব নেশা ছুটে যাবে। আমি দুবেলা মদ খেতাম, দিনে দশ প্যাকেট সিগারেট ছাড়া চলত না। বুঝতে পারছিলাম তলিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু উঠে আসার অবলম্বন পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ কলকাতার এক প্রদর্শনীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় পেলাম। মনুষ্যজীবন সম্পর্কে এঁদের ব্যাখ্যা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলাম। চলে এলাম ক্লাস করতে। সাত দিনের কোর্স শেষ না হতেই আমি অন্য মানুষ – কোনও নেশা নেই। নিজেকে হালকা লাগে।

বেহালার প্রাণতোষ ভাইও বলেছিলেন – আমাদের রাজযোগে কোনও আসন-প্রাণায়াম নেই। শরীরকে পবিত্র রেখে শুধু পরমপিতার ধ্যান। আপনার 'বডি কনশাসনেস' থাকবে না। মনে হবে আপনার 'বডি' যেন হালকা হয়ে

ওপরে উঠে যাচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যাচ্ছে। আসুন একদিন ভজনের ক্লাসে

কিন্তু কী করে প্রশ্নটা করেছিলাম কলকাতার হেড কোয়ার্টারের সিনিয়র বোন বিমলার কাছে হিন্দিতে সুন্দর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন, যার সার-সংক্ষেপ হল – পরমাত্মার সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব। তারপর বললেন, আমরা হাতে কলমে এসব শেখাই – ইয়ে প্র্যাকটিক্যাল হ্যায়।

হায় সোনালী ডানার চিল

কলকাতার একটি কেন্দ্রে গীতা পাঠশালা আছে বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডে। পাঠশালা বসে ভূপকিশোর রোহাতগির বাড়িতে। তিনিও ব্রহ্মাকুমার। সন্ধ্যের পর গিয়েছিলাম। লোডশেডিং চলছিল। পরিচয় দিতে ভেতরে নিয়ে গেলেন এক ব্রহ্মাকুমারী। চেয়ারে বসতে দিয়ে এক ব্রহ্মাকুমারী হাতপাখার বাতাস করতে লাগলেন। সবিনয়ে তাকে নিরস্ত করলাম। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় দেখলাম ঘর ভর্তি ব্রহ্মাকুমারী এবং বেশ কয়েকজন ব্রহ্মাকুমার। বয়স ২৫ থেকে ৬০। সকলের কথাবার্তা ও বিনম্র ব্যবহারে মুগ্ধ হতে হয়। ভূপকিশোর ও উমাবালা রোহাতগি ছাড়া ওই কেন্দ্রের বাকি পঁচিশ-ত্রিশজন সবাই বাঙালি। পরিচয় হল ওই কেন্দ্রের দিদি ব্রহ্মাকুমারী কল্পনার সঙ্গে। কল্পনা সরকার। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। সদর স্ট্রিটে কস্টিং ইনস্টিটিউটে টাইপিস্ট কাম-ক্লার্ক-এর চাকরি করেন। কল্পনা সরকারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল যে তার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। 'এমন সময় হঠাৎ একদিন নিতান্ত কৌতূহলবশে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রদর্শনীতে ঢুকেছিলাম। তাদের দু একটি পুস্তিকা পেলাম। বাড়িতে গিয়ে পড়ে মনে হল যেন এমন কথা আগে কখনও শুনিনি। মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলতে লাগল। তবু এক অজানা আকর্ষণে, যেন এক অলৌকিক হাতছানিতে সাড়া দিলাম। চলে গেলাম ওদের কেন্দ্রে। আর ফিরে আসতে পারিনি। আমি যেন এক মুক্তির আনন্দ পেলাম। দেহ ছাড়া এ এক অনির্বচনীয় প্রেমের পথ।'

ত্রিশ বছর বয়সের কল্পনার পরনে শ্বেত বসন। মুখোমুখি বসে আছি। লোডশেডিং। পাশে মোম না অন্য কোনও বাতি মনে পড়ছে না। আসলে ঘরের আলোর উৎস নয়, এই প্রতিবেদকের সন্ধানী চোখ তখন ঘরের আবছা আলোয় ব্রহ্মাকুমারী কল্পনার ছায়া ছায়া চোখের তারায় নিবদ্ধ। আমি সেই রহস্যের সন্ধানী, কোন সে মায়ামন্ত্র বা অলৌকিক হাতছানির আকর্ষণে কল্পনার মত মেয়েরা যৌবনে সন্ন্যাস না নিয়েও কঠিন ব্রহ্মচর্য-ব্রতী এ কি বিভ্রম, নাকি ভালবাসাকে ভয়! কেন এই ভক্তি মিছিলের আজীবন সংগী হয়েছেন এমন কি সপ্তদশী মেয়েরা, পঁচিশ বছরের টগবগে নওজওয়ান!

বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। বিস্ময় নয়, শঙ্কিত চমক। কল্পনার কাছে জানা গেল – তারা পাঁচ বোন, চার ভাই। মা-বাবাকে নিয়ে এগারজনের পরিবার। এবং গোটা পরিবারই এই বিচিত্র সাধনমার্গের পথিক। এমনকি কল্পনার ছোট বোন ষোড়শী সোনালীও। সোনালীর যৌবন বসন্তে সে এক শরীরহীন আত্মা। থাকবে না সোনালী ডানা। তারও নাকি মিলন হয়েছে পরমপিতার সঙ্গে। হায়, সোনালী ডানার চিল হায় সোনালী।

এই রেটে যদি হিন্দু পরিবারগুলির সঙ্গে 'পরমপিতার মিলন' হতে থাকে তবে আমাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত কৌপীন ধারণ করতে হবে কিনা! পরিবারগুলো সঠিক অর্থে ভেঙে না গেলেও এই বিশেষ জীবনচর্যার ফলে সেগুলো কি উৎপাটিত হয়ে যাবে না!

সাংগঠনিক শক্তি ও আর্থিক সংগতি

ভারতবর্ষে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৫০টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি। বিদেশে আছে ৩০০টি। ভারতে মোট সদস্য বর্তমানে দু লক্ষর বেশি। এদের বয়স পনের থেকে ষাট সত্তর। সাধারণ চাকুরে, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সব পেশার মানুষ আছেন এই ধর্ম মিছিলে। দেশে বিদেশে এঁদের জীবনচর্যায় আকৃষ্ট করার জন্য ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রহ্মাকুমারীরা নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে যেভাবে প্রচার চালান, তা বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার অভিযানের মত রয়েছে পদ্ধতিগত মিল। বই মেলা থেকে শুরু করে বিজাতীয় যেকোনও মেলা বা বড় বড় উৎসবে, দুর্গাপুজার সময় বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। এই ধর্মীয় সংস্থার সমস্ত বই পুস্তিকা পত্রিকা সাজানো থাকে। ব্যাখ্যা করা হয় নানা আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার। একাজে সাধারণত নিযুক্ত থাকেন সিনিয়র ব্রহ্মাকুমারীরা। সমস্ত ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীরা পরস্পর ভাইবোন। কলকাতায় যে যেখানেই থাকুন, যোগাযোগ থাকে সবার সংগে। বিভিন্ন এলাকায় সংগঠনের সংগে সরাসরি যারা যুক্ত তাদের প্রতিদিন কলকাতার হেড কোয়ার্টারে আসতে হয়। প্রতি কেন্দ্রে তাদের মারফৎ প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা বাণী প্রচারিত হয়। মাসিক পত্রিকাও রয়েছে। ইংরেজি পত্রিকাটা দেখলাম, নাম 'পিউরিটি'। দামী কাগজে সুন্দর ছাপা। দাম ১ টাকা ২৫ পয়সা। বই রয়েছে প্রচুর। এর মধ্যে বেশ কিছু বই দেখা গেল, দু এক বছর বাদে ৫০০০ কপির সংস্করণ ছাপা হচ্ছে। অর্থাৎ সবই বিক্রি হচ্ছে। টাকা পয়সার দিকটা এভাবে কিছুটা চোখে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া রয়েছে সদস্যদের চাঁদা। ওঁরা বলেন 'গুপ্ত চাঁদা'। অর্থাৎ কে কখন কত চাঁদা দিচ্ছেন তা একমাত্র দাতা এবং গ্রাহকই জানবে। অন্য কেউ নয়। বিদেশি ভক্তরা যখন হেড কোয়ার্টার মাউন্ট আবুতে আসেন তখন মোটা অংকের অর্থ দান করে যান। তাছাড়া ধনী সদস্যরা জায়গা জমিও দান করেন, যেমন বি কে প্রাণতোষ জানালেন, বাংগুর এভিনিউয়ে এক ভক্ত পাঁচ কাঠা জমি দান করেছেন।

জগদম্বা সরস্বতী



দিদি শান্তা



বিড়লাপুরে গণ্ডগোল

গত ৫ মে বজবজ ছাড়িয়ে বিড়লাপুরে ব্রহ্মাকুমারীদের নিয়ে গোলমাল হবার ছোট্ট খবর পাওয়া গিয়েছিল। বিস্তারিত খবর সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলাম বিড়লাপুর। বিড়লাপুরে কোনও পুলিশ স্টেশন নেই। থানা আছে বেশ কয়েক মাইল দূরে নদাখালিতে। ফাঁড়ি আছে বিড়লাপুরে কথা হল সেখানকার রামজি সিং এবং মানিক দত্তর সংগে। বললেন ঘটনাটা ঘটেছে বিড়লাপুর বাজারের সামনে। সংগে সংগে খবর পেয়ে গিয়েছিলাম বলে বড় ধরনের কোনও কিছু ঘটেনি

জানা গেল, সেদিন বিড়লাপুর বাজার গেটের সামনের মাঠে দুজন প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী তাদের ধর্মমত প্রচারের জন্য একটা অস্থায়ী প্রদর্শনী শুরু করেছিলেন। বেশ কিছু বইপত্র ও ছবি ছিল। কৌতূহলী জনতার সামনে দু-জন ব্রহ্মাকুমারী প্রচার-চিত্র দেখিয়ে ঈশ্বরীয়



ধ্যানাসনে ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মমত বোঝাচ্ছিলেন। শিল্পাঞ্চল বিড়লাপুরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। বিশেষত বাজারের কাছে বহু দোকানপাট মুসলমানদের।

গন্ডগোল বেঁধেছিল যখন একটি ছবি দেখিয়ে এক ব্রহ্মাকুমারী বোঝাচ্ছিলেন 'সকল আত্মার পিতা এক নিরাকার পরমাত্মা'। ওই ছবিটিতে হিন্দু তীর্থমন্দির অমরনাথ, রামেশ্বর সোমনাথের সংগে মুসলমানদের তীর্থভূমি মক্কাও দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মাকুমারীদের বক্তব্য ছিল, হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খ্রীস্টান সবাই ভাই ভাই। অর্থাৎ তাদের সবার পিতা এক। আত্মিক দিক থেকে তারা সবাই এক পরমপিতার সন্তান। তিনি,কে ? তিনি হলেন শিব। এবং 'শিবের স্মৃতিচিহ্ন প্রত্যেক ধর্মে আছে। এমন কি 'মুসলমানদের তীর্থভূমি মক্কাতেও এই আকারের একটি পাথর আছে যাঁকে তারা সং-এ-অসবদ বলেন এবং সেটি মুহম্মদ দ্বারা স্থাপিত।'

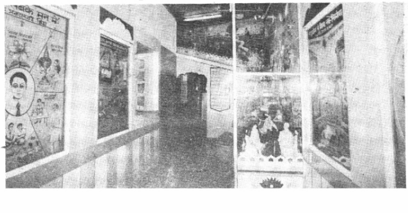
দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে সেদিন সেখানে অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। ব্রহ্মাকুমারীদের এই বক্তব্যে তারা তীব্র আপত্তি জানায়। মক্কার সংগে শিবের সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাখ্যাকে তাদের কাছে অপপ্রচার মনে হয়।

ব্রহ্মাকুমারীরা আরও ব্যাখ্যা করতে গেলে ওখানকার মুসলমানরা রোষে ফেটে পড়েন, খবর হাওয়ায় ছড়িয়ে যায়, আরও লোকজন চলে আসে। আবহাওয়া চরম উত্তপ্ত হওয়ার আগেই পুলিশ ফাঁড়িতে খবর চলে যায়। খবর চলে যায় নদাখালি থানায়। স্থানীয় মুসলমানদের দাবিতে দুই ব্রহ্মাকুমারীকে গ্রেপ্তার করা হয়, সমস্ত কাগজপত্র আটক করা হয়।

বিড়লাপুরে যখন গিয়েছিলাম তখন খুব বৃষ্টি। এমনিতেই দুপুর বেলায় সুনসান থাকে। কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই। বাজারের একজন দোকানদার শেখ মেসবাহাদ্দিন এই প্রতিবেদককে বললেন – 'আমাদের ধর্মের এইসব কথা ওরা কোথায় পেলেন ? কোনওদিন শুনিনি। হজরত মহম্মদের ছবি আছে নাকি ? যাই হোক, ওরা মেয়েমানুষ বলে বেঁচে গেছে। কংগ্রেস সি পি এম সব দলের নেতারা এসেছিল। অঞ্চল প্রধান আদিত্য মান্না ঠিক সময়ে হাজির না হলে গন্ডগোল কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কে জানে।'

কলকাতায় ফিরে কয়েকজন ব্রহ্মাকুমারীর সংগে যোগাযোগ করে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন যে ওই ছবি নিয়ে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়নি। আসলে বোনেরা বিষয়টা ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারেনি। মুসলমান ভাইদের কোনও দোষ নেই।

প্রজাপিতা সংস্থার চিত্র প্রদর্শনী



কেমন যেন ধোঁয়াটে

ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মমত ও জীবনচর্যা, গুরুবাদে এঁদের বিশ্বাস নেই। এঁদের মতে গুরু একজনই, তিনি পরমপিতা ঈশ্বর। লেখরাজ যে বাণী প্রচার করেছেন, নিরামিষ আহারি দেহ-ছাড়া ব্রহ্মচর্যের যে পথ তিনি দেখিয়েছেন সেই পথই এদের মুক্তির কাঙ্খিত পথ। ঈশ্বর বলতে শিব। শুধু রাজযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরের সংগে 'টেলিযোগাযোগ' স্থাপন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানদের মতে স্বার্থপরতা মানুষের স্থায়ী দোষ বলে মার্কস যা বলে গেছেন তা মানা যায় না। যেমন মানা যায় না ফ্রয়েডের লিবিডো তত্ত্বকে। মার্কসের লক্ষ্য অনেক বড় কিন্তু এই তত্ত্ব প্রচার করতে গিয়ে বিশ্বে সংঘর্ষ আরও বেড়ে গেছে বলে তাঁরা মনে করেন। এঁরা শোষণ-মুক্তি চান পারস্পরিক আপোষ তথা ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে। তাই এঁরা পারমাণবিক অস্ত্র, এইডস, গীতা, রাজযোগ, জন্মনিয়ন্ত্রণ, ড্রাগস, রিপুদমন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাণী এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেন। সবই যেন কেমন ধোঁয়াটে।

নিজেকে জানা-ই সত্য এবং সত্যই ধর্ম। হিন্দুর সম্পর্ক সরাসরি স্রষ্টার সংগে। মানলাম। কিন্তু হিন্দুধর্মে অবতার থাকলেও কোনও প্রতিনিধির স্থান আছে কি ? অথচ ওঁরা বলেন লেখরাজ ব্রহ্মার প্রতিনিধি। আরেকটা কথা – হিন্দু ধর্মের দুটো আশ্রম, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস। ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরা গার্হস্থ আশ্রমে থেকে সন্ন্যাস আশ্রমের ছায়া খুঁজছেন। বৈসাদৃশ্য ও বিভ্রান্তি প্রধানত এখানেই। □

ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী



জংলি মউ

ইন্দ্রজালের মতো নদী। মাঝে মাঝে জংগল ভরা দ্বীপ। নারকোল সুপুরি, তাল, খেজুর, হেঁতাল, গোলপাতা, হিজল, হাওয়াই, ঝাউ, সুঁদরি, গরান, আল, পেয়ারা বানি, গর্জন বানি, কেওড়া, গুয়ে বাবলা, মনসা, ফণী মনসা গাছ ঠাসাঠাসি কতরকম লতায় জড়াজড়ি। নদীর জলে সাঁতার কাটে ধানী ঘাস। তীরে হোগলা, শরখড়ি, কাঠশোলা, হরকোচ ঝোপ। বঁইচি, সেয়াকুল, নাটাকাঁটা, সোনাকাঁটা, কন্টিকারী, ম্যাড়ামারা, বন-বেগুন, তেকাঁটাল কাঁটা ঝোপের মধ্যে গেছো বা ডামা ইঁদুর, খরগোস, সজারু, উদ-বিড়াল বা ভাম, ভোঁদড়ের আশ্রয়। নদীর তীরে লক্ষ লক্ষ লাল লাল কাঁকড়ার গর্ত। পদ্মগোখরো, করাতে বা গেঁড়িভাঙা, ব্যানাফুলি, খরিশ, কেউটে, সোনা গোহাড়গেল, কালো গোধিকা (গোসাপ), নেউল ঘুরে বেড়ায়। জলে থাকে ঘোড়েল। হোগলা শরখড়ির ঝোপের মধ্যে ছাবকা রোদে-ছায়ায় শুয়ে থাকে বড় মিঞা। সুঁদরির ভয়ংকর গজাল বা তেউড় চারদিকে। গাছের ডালে ডালে ঝোলে মধুর চাক। ডালে ডালে লাফালাফি করে বাঁদর-হনুমান। কোথাও দেখা যায় গোটা তাল গাছটাই ছেয়ে গেছে ভীমরুলের চাকে। লক্ষ লক্ষ ভীমরুল বের হচ্ছে ঢুকছে তাদের বাসায়। সোনাকাঁটা গাছের গায়ে থালার মতো বোলতার চাক। করোমচা পাতায় অজস্র লাল পিঁপড়ের বাসা।

জংগল ভরে থাকে পাখির ডাকে। মাঝে মাঝে অগভীর জলাশয়ে মাছ আর গুগলির সন্ধানে ভেসে বেড়ায় জলপিপি, ডাহুক, পানকৌড়ি, বালিহাঁস, কেঁদোচূড়া, শামুকখোল আর শকুনের মতো বড় ছাই-কালো লাল মুখ রাজহাঁস। দুম করে বন্দুকের একটা শব্দ করলেই হাজার হাজার পাখি উড়ে আকাশ ছেয়ে ফেলে, তারপর তারা জংগলের গাছে পালায় যেন ঝুপ ঝুপ করে পড়ে যায়। আর রাজহাঁসগুলো ওড়ে না – ডুব দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর অনেকটা দূরে গিয়ে ওঠে। দক্ষিণ মহাসমুদ্র থেকেই এই পেলিকান রাজহাঁসগুলো আসে। কার্তিক মাসের হিম পড়তে থাকলে তারা শীতের হালকা মৌতাতে 'উত্তর গোলার্ধে এসে ডিম পেড়ে বাচ্চা তুলে মাঘের শেষে সেগুলো যখন বড় হয়ে সাঁতার কেটে অথবা ঝড়-ঝাপটায় ঢেউয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে উঠে তুফান পাড়ি দিয়ে মহাসাগর পেরিয়ে চলে যেতে পারবে তখন বিদায় সোনার সবুজ সুন্দরবন।

রাইফেল নিয়ে বোটে-পালোয়ার বেয়ে যেতে যেতে মজবুত চেহারায় প্রৌঢ় বাউলি ইরফান সরদার অন্য দুজন সংগী অনন্ত ঘোড়া আর ইউসুফ গায়েনকে বলল, 'জংগল ঝাট দে হাঁস-মুরগির আন্ডা লি যেতে এয়েছে ঝড়খালির একদংগল মেয়ে। হাতে আছে খালি লোহার চিমটে। প্যাটের দায়ে শালীর বেটিরা বড় মিঞার প্যাটে গেলে বালবাচ্চারা ককিয়ে মরবে......

সরু সুতোলি নদীর জলে বৈঠা পড়ার শব্দ হয়। হোগলা বন শুরু হয় একটা মস্ত বিলে। লগি ঠেলে চলে এবার তিনজন। ডাহুক আর পানকৌড়িগুলো মানুষের সাড়া পেয়ে ডুব দিয়ে পালায়। দুপুরের সূর্য হালকা শীতের আমেজকে রোদ ছেড়ে আরামদায়ক করে তুলেছে। পদ্মফোটা বিলে অসংখ্য জলপিপি আর বালিহাঁস। যেন হাজার হাজার ঝুনো নারকোল ভেসে আছে।

অনন্ত হঠাৎ বড় মিঞার গলা ঘড়ঘড়ানি নকল করে জোর আওয়াজ দিতেই হু হু করে পাখিগুলো উড়ে আকাশ ছেয়ে ফেলল। কেঁদোচূড়া ডাকছে কর্কশ মিঠে স্বরে। সামনে সুপুরি আর গোলপাতার জংগল।

ইরফান সরদার বললে, 'বুড়ো না হতেই শালা হেঁটোর মালাই চাকিতে যেন কাঁকড়ার দাড়ার চিপটানি শুরু হয়েছে। মহাজন গফুর মিঞার দর-দালানের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে যেন কোলজে কনকনায়। বাবলার খেঁটে দিয়ে বাঘ-মারা ইরপান শালা আহোন হেঁটোর ব্যথায় কাবু।'

ইউসুফ বলে, 'চাচা তোমার দাঁতালো বুনো শোর তেড়ে এসে উরু ফাড়া করতে গেলে তেউড়ে পড়ে মরবে!' হিঁকিয়ে হিঁকিয়ে হাসতে থাকে ইউসুফ। ফরসা জোয়ান ছোকরার রক্তে এখন বাজের আগুন।

অনন্ত বললে, 'চামচা বনের ক্যাওড়া আর খলসি লতার ফুকে ফুলপট্টি, বালিহার মধু আছে। চল এখানেই উঠি। গরান-ফুলের লাল মধু দরকার নেই। যদি এই জংগলে মেয়েরা ডিম কুড়োতে আসে তবে বাঘ ডেকে ওদের পিলে চমকে দিয়ে দৌড় ছাড়াব।'

'তাপর যাহোন পচাল পেড়ে জরু-বেটি উদ্ধার করবে ওসব মেয়েদের মুখ আর হাঁসের গুহাম্বার একই রকম, মনে রাখিস।'

বোটে-পালোয়ার ভিড়িয়ে রেখে ওরা জংগলে উঠল। গোলপাতার জংগলের মাথায় সাগরের টানা বাতাস যেন তরংগ তুলেছে।

ঝরা পাতার ওপর খস খস খস খস শব্দ তুলতে ওরা খালি পায়ে কাঁটা-খোঁচা বাঁচিয়ে কিছুদূর সুঁড়িপথে আসার পর গরান-আল-সুঁদরির জংগল শুরু হল। আসমান-দোলা লতা ধরে বাঁদরগুলো দোল খাচ্ছে। হঠাৎ একটা গাছের গোড়ায় দেখলে ছোট একটা ত্রিশূল পোঁতা। তিনটে ঝুনো নারকোলের ওপর একটা মড়ার খুলি। তাতে সিঁদুর

লাগানো। মাটি আঁচড়ানো বাঘের পায়ের দাগ। হলদেটে লংকার মতো গরানের শুঁটি, নীলাভ মুড়ির মতো করোমচার ফুল, হিজল ফুলের রেশম লাল ঝালর, ঝরা পাতায় চারদিক ছেয়ে আছে। তিনজনে দাঁড়াল ওরা। অনন্ত আর ইউসুফের চোখে জিজ্ঞাসা – ইরফানের মাথা নাড়া ভাব দেখে তারা রহস্যভেদ করতে চায়। সরদার বলে, 'বীরুমল নাগা সন্নিসীর কাজ এটা। জংগল বন্দনা করে গেছে। কোপনি আঁটা কেলে সাধু হেই নম্বা চেহারায় ভুষো মেখে তিরশূল হাতে এই বাঘের জংগলে ঘুরে বেড়ায়। চেহারায় মাংস আছে যে খাবে! সোঁদরবনের বড় মিঞা এক একটা শালা বি এ পাশ – এত বুদ্ধি ধরে।'

'লাথি মেরে ফেলে দোব ?' বললে ইউসুফ।

'হেই শালা, পুজো করেছে!' বললে অনন্ত।

ইরফান ওদের অন্যমনস্ক করতে চাইল। গাছের ডালে ঝুলন্ত মধুর চাকগুলো দেখাল। লগির মাথায় ডালপাতা বেঁধে আগুন জ্বেলে চাকের কাছে তুলে ধরতেই মৌমাছিগুলো পালিয়ে যেতে লাগল। তারপর কাস্তে বাঁধা লগিটা নিয়ে ইউসুফ গাছে উঠে টান দিয়ে চাকগুলো কেটে ফেলে দিলে অনন্ত আর ইরফান পাৎলা হেসিয়ান চট মেলে ধরে লুফে নিতে লাগল। নামিয়ে রাখতে লাগল এক জায়গায়।

ওপারের দ্বীপে কাঠ কাটার শব্দ হচ্ছে। ওদের লাইসেন্স আছে। ডব্লু বি মার্কা গাছগুলো কাটবে না। লাঠি আর হ্যারিকেন ছাড়া বন্দুক আনাও বেআইনী। কিন্তু মহাজন বন্দুক আনেই।

ইরফান বলে, 'মোর বাপ সারা জীবন জংগলে বাউলী আর মউলেগিরি করে সাঁপের কাটায় পা পচে গরুর মতন চিৎকার করে মরল। তারও 'লাইসেন' ছ্যালনি, মোরও নেই। বউও নেই যে মরলে কাঁদবে। যাদের বউ আছে কাঁদলেই মামুরা জানতে পারবে। তারপর হয়রানি।'

ঘণ্টা দুই চাক ভাঙার পর সেগুলো পালোয়ারের ওপরে রেখে এসে আবার তারা গোলপাতা কাটল ঘর ছাইবার জন্যে। সামনে আসছে বর্ষা – তার আগেই পাতাগুলো 'জাগ' দিয়ে শুকিয়ে একরাত ডুবিয়ে রেখে আবার শুকিয়ে নিয়ে ঠাসাঠাসি করে ঘর ছাইলে দশটা বর্ষা কেটে যাবে হাসতে হাসতে। গরমকালে গোলপাতার ঘরে যেমন ঠাণ্ডা, শীতকালে তেমনি গরম থাকে। ইরফান নিজে মাটির ঘরের দেয়াল দেওয়া, উলুটি করা, কাঠামো করে ঘর ছাওয়া জানে। আগে সে বাউলীর কাজ করত। কাঠুরে দলের গাইড ছিল সে। খেঁটে কাঁধে নিয়ে বাঘের সংগে লড়ার বল এখন আর নেই তার। জংগলের প্রাণীরা তাকে ভয় করত। এখন সে জংগলকেই ভয় করে।

ওরা দুজনে নারকোল আর সুপুরি কুড়োতে গিয়েছিল কাছেই গোলাপাতার বনের মধ্যে। থলে নিয়ে গেছে। ওদের কাছে রাইফেল নেই আছে বল্লম।

ইরফান রাইফেল হাতে নিয়ে একাই আবার জংগলে উঠে ত্রিশূল পোঁতা জায়গাটার কাছে এলো। কেমন যেন গা ছমছম করছে। কী আছে ওর নিচে ?

মড়ার খুলিটা সরিয়ে রাখল। নারকোলগুলো সরাবার পর ত্রিশূলটাকে গায়ের জোরে টেনেও তুলতে পারল না ইরফান। কী ব্যাপার! ছোট্ট ত্রিশূল, এত শক্তি ধরে কী করে? শুইয়ে চাড় দেবার পরে গোটা একটা ঝুনো নারকোল সমেত উঠে এলো। তলায় একটা পেতলের ঘটি। মুখে মাটির খুরি বসিয়ে কাদার প্রলেপ দিয়ে আঁটা। কী আছে ওর মধ্যে? ঘটিটা তুলে দেখল বেশ ভারী। মুখটা খুলে ফেলার পর দেখল কয়েক ভরি রুপো আর সোনার গহনা! পুরোনো আমলের কতকগুলো রুপোর টাকা। তাড়াতাড়ি সেগুলো গামছায় ঢেলে বেঁধে নিয়ে ঘটির মধ্যে মাটি ভরে যেমন ছিল সব ঠিকঠাক করে দিয়ে দ্রুত বোটেতে পালিয়ে এল্যো। কোমরে গামছার মধ্যে ধনরত্নগুলো বেঁধে তার ওপরে লুংগি পরল ইরফান। কালো রঙের ফতুয়াটা চাপা দিল। রাইফেল নিয়ে বসে থাকার সময় প্রথমে বাঘের গর্জন, পরে মেয়েদের চিৎকার চেঁচামেচি কানে এলো। অনেক মেয়ে ডিমের ঝোড়া কাঁখে নিয়ে এদিকে ছুটে আসছে। অনন্ত আবার বাঘের ডাক ডেকে উঠল। ইউসুফকে গাছ-পালার আড়ালে কালো রঙের ছিপছিপে চেহারার একটা মেয়ের সংগে হাসাহাসি করতে দেখল। আর হঠাৎ ইরফান দেখতে পেলে নদীর ওপারে নেমে মুখ তুলে জল চিরে এদিকের জংগলে আসছে একটা বাঘ। পেছনে দুটো মাস ছয়েকের বাচ্চা। বাচ্চা দুটোকে ধরে নিয়ে গিয়ে মোটা দামে বিক্রি করার সময় বয়ে গেছে। এখন কামড়াতে শিখে গেছে। কিন্তু মুখে আ-আ-আ শব্দ তুলে ইরফান জানান দিতে মেয়েটার সংগে ইউসুফ ছুটতে লাগল। পালোয়ারে উঠে পড়ল তারা। কিন্তু বনকেওড়ার ঝোপে লুকিয়ে থেকে যে অনন্ত ঘোড়া বাঘের ডাক নকল করে ভয় দেখাবার আমোদে মেতেছিল তাকেই বাঘে ধরল। বাঘ কখনো সামনে থেকে শিকার ধরে না – পেছনের দিকে গুঁৎ পেতে পর পর তিনবার মাটিতে লেজ আছড়াবার মুহূর্তটিতেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। তবুও অনন্ত একবার হাঁক দিয়ে উঠেছিল। তার হাতের বল্লম হাতেই রয়ে গেল। ঘাড় মটকে পিঠের দাঁড়া ভেঙে দিয়ে পিঠে তুলে নিয়ে এতোক্ষণে চম্পট দিয়েছে বাঘটা। শালতি ঠেলে মেয়েরা ওদিক থেকে চলে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়ে সবাই হৈ মারতে থাকে।

ডিমের ঝোড়া তুলে নিয়ে ইউসুফের পালোয়ার থেকে নাক খাড়া সাদা ড্যাবডেবে চোখ বছর আঠারো বয়সের সাবেরা খাতুন বলল, 'তোংগার আর এট্টা লোগ কই গেল গা সদ্দারের পো ? তিন জনা না হলি তো মউ ভাঙতে পারবে নে।'

ইরফানের মনে এখন সুখ আর দুঃখের দ্বন্দ্ব। রাইফেলটা আগেই গোলপাতার ভেতরে লুকিয়ে ফেলেছিল। বলেই ফেলল, 'একজন এক্ষুনি খোয়া গেল। গেল তার বুদ্ধির দোষে। মজা মারতে যেয়ে আহোন লিজেই বাঘের প্যাটে চলে গেল!' লসীবে দুখখু থাগলে কুন শালা খণ্ডায় ?

অনন্ত ঘোড়া মউ ভেঙে সোঁদরবন থেকে আর ফিরতে পারল না শুনেও তার বউ বুক চাপড়ে মাথা কুটে কাঁদতে পারল না। তাহলে বিনা লাইসেন্সে জংগলে যাওয়ার দায়ে পুলিশের হাতে পড়ে তার গোটা পরিবারকে নাস্তানাবুদ হতে হবে। তাই মাথা কুটে কুটে কাঁদো নীরবে, ঘরের মধ্যে 'তসলা' এঁটে দিয়ে ইরফান নিজে ঘর বয়ে মধুর চাকের অংশগুলো দিয়ে গেল। অনন্তর পাঁচটা ছেলেমেয়ে। কী করে সংসার চলবে, বাচ্চাদের মানুষ করবে সেই ভাবনা এখন অনন্তর বউয়ের। বড় ছেলে বসন্তর বয়েস এখন মাত্তর ষোল-সতেরো। তবু তাকেই বললে ইরফান, 'তুমি আমার কাছে যেও, জংগলে লি-যাব।'

বাড়িতে ফিরে ইরফান বিড়ি ধরিয়ে দু-টান মারার পর ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখে হ্যারিকেনের আলোয় উঠোনে বসে প্লাস্টিকের গামলায় চাক নিংড়ে মউ বার করতে থাকে। কোলের পিঠের নাতি-নাতনি দুটো বসে আছে সমানে বাটি পেতে। বাজরায় জল-কাগজ পেতে পাটালির মতো সাজানো চাক থেকে মউ বেরিয়ে জমা হয়েছে কত। চাকের মাছি হয়ে যাওয়া অংশগুলো ভেঙে একপাশে জড়ো করে রাখছিল দশ বছরের নাতনি রাহিলা খাতুন। জামাই বাদায় হোগলা কাটতে গিয়ে সাপের কামড়ে মারা যাবার পর থেকে মেয়ে তহুরা স্বামীর ঘর হারিয়ে বাপের সংসারে এসে আছে। রান্না করতে বসেছিল তহুরা। উনুনের আলোয় তার মুখটা দেখা যাচ্ছিল ধঞ্চে কাঠির ঝোপের আড়াল থেকে। তহুরাকে দেখতে খুব ভাল। ওর মাও ছিল খুব সুন্দরী। সাত জেলে থেকে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালায়ে এসেছিল। দুঃখের সংসার থেকে সে মেয়েও একদিন বিদায় নিয়ে চলে গেল।

একজন পাইকের এসে হাজির হল। পাশের গ্রামের জলধর ভূঁইঞা। খাঁটি মউ কিনতে এসেছে। খেজুর চাটাই পেতে তাকে বসতে দিলে ইরফান। বললে, 'কাল সকালে তোমার তো আসার কথা। খাঁটি মাল হচ্ছে কিনা দেখতে এলে নাকি জলধর ?'

জলধর বললে, 'না দেখে উপায় নেই চাচা। নিজের হাত-পা-কে আজকাল বিশ্বাস নেই। জলধরের খাঁটি মধুর নাম-যশ আছে চিরকাল। আমার ব্যবসা উঠে যায় যাবে তবু নকল মাল আমি দেবো না।'

'লিজের হাত-পাকে বিশ্বেস নেই বললে, আবার বলছ খাঁটি মাল দিই ? আসল ব্যাপার কী জানো জলধর, মানুষ-মৌমাছিই হলে তোমরা। যারা দু নম্বর। শিশি বোতলে যারা মাল ঢোকাও। সরষের তেলের দামে মোদের কাছে মউ কিনে লিয়ে যেয়ে তোমরা খাঁটি ঘিয়ের দামে পড়তা করো। দুনিয়ার মাল যারা পয়দা করে তারা খাঁটি থাকে। মায়ের বুকের দুধ ভেজাল হয়েছে ? মৌমাছি কি নকল বউ বানায় ? গরু মোষ কি জল মেশানো দুধ দেয় ? শালা, মানুষ জাত হল হারামি, যে যত ধম্মের দোহাই পাড়ে, সেই তত চোর।'

টাকা দিয়ে যতটা মধু হল, জলধর নিয়ে গেল। ক্যানিং টাউন ছেড়ে এখন সে সোনারপুর, বালীগঞ্জের দোকানে মাল যোগান দেয়। গ্রিল দেওয়া সুন্দর দোতলা বাড়ি করেছে। বিশ বছরে বিশ বিঘে জমি কিনেছে। ওদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে।

ইরফানের নাতি-নাতনিরা বাটি নিয়ে বসে থেকেও একটু মধু পায় না। ওজনের বেলা সব সময় মধুর টান পড়ে। তাই শুধু দাদুর হাত চাটতে হয় তাদের।

মাছিঅলা বাতিল চাক নিংড়ে যেটুকু টক মধু পায় তারা খায়। দাদু তাদের কেবল আশা দেয়, 'একদিন তোদের অঢেল মধু খাওয়াব।'

চাক নিংড়ানো গোল্লাগুলো ইরফান রেখে দেয়, মোমের জন্যে বিক্রি করবে।

ইউসুফ গায়েন জানতে এসেছিল কবে আবার ইরফান চাচা জংগলে যাবে। তহুরা ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিল না। সবাই বিল গুলিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। ইরফানও খ্যাপলা জাল কাঁধে নিয়ে বেরিয়েছে।

তহুরা খেজুর পাতার শীতলপাটি বিছিয়ে বসতে দিয়ে জানালে, 'বাপ নাকি অনন্তর ছেলেকে লিয়ে মউ ভাঙতে যাবে। বসো, এক্ষুনি সবাই এসে পড়বে।' পান সাজাতে বসল তহুরা।

ইউসুফ বললে, 'দেখলে মনে হয়নে যে তোমার বে হয়ে ছ্যালো, দুটো ছেলেপুলের মা তুমি, একথা সবাই বলে। কীভাবে চেহারাটাকে এমনধারা সুন্দর করে রেখেছ?'

তহুরা বলল, 'যাদু জানি!'

ইউসুফ তাকিয়েছিল তহুরার দিকে মাংসের লোভে যেমন করে বাঘ তাকিয়ে থাকে হরিণের দিকে।

পান দিতে আসতে যেন ভয় করে তহুরার। বুকের ভেতরে কাঁপন ধরে। পান নেবার সময় ইউসুফ ওর হাত ধরে। বলে, ''দেখি তোমার হাতে কী আছে!' এই তো, ফাড়া ছিল। আরে বাপ, আবার বে হবে?'

'মরণ। তুমি বে করবে?'

'করব।'

'ওঃ! খুব আশা!'

শুয়ে পড়ল ইউসুফ। টান হয়ে আলিসাি ভাঙল। বলল, 'সত্যি খুব আশা। আশাটা বনমানুষ হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। সেদিন বিকেলে হরিণের গোস্ত দিয়ে এসে কাউকে না পেয়ে খিড়কির পুকুরে তোমাকে যেভাবে উদোম চেহারায় গা ধুতে দেখে ফেলেছিলাম কী বলব মাইরি। রাতের বেলা আর নিদ যেতে পারিনি।'

'এটা একরকমের রোগ! আর এই রোগ সারাতেও আমি জানি! জোয়ান ছেলে, ফুলের পানা একটা বউ করবে কোথা, না ধান্ধাবাজি!'

মাথার চুল ধরে ঝাঁকানি দিলে তহুরা। মুখ গুঁজে পড়ে রইল ইউসুফ। তাকে বালিশ এনে দিলে তহুরা। দৃঢ়ভাবে বললে ইউসুফ, 'আমার গালে চড় মারো, পিঠে ঝাঁটা মারো, অপমান করো, তবু আমি তোমাকে বে করবই করব, তহুরা। চাচার কাঁধের ভার আমি লোব। চাচাকে আমি বলব। চাচা আমাকে জংগলে লিয়ে যায় ছোটবেলা থেকে। অনেক কিছু শিখিয়েছে।'

তহুরা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে, 'সেই জন্যে চাচার মেয়ের যাতে বদনাম হয় তাই তুমি করতে চাও। ওঠো তো তুমি......ভাগো এখন থেকে।'

'কুন শালা আমাকে ওঠায়। চাচা আসুক মাছ ধরে। মাছ ভাজা দিয়ে ভাত খাব, তবে যাব।'

তহুরা জিভ বার করে ভেঙচি কাটল। খিড়কির দিকে চলে গেল। উদোম বাতাস ছুটেছে মাঠে। ইউসুফের কী সুন্দর জোয়ান চেহারা। কোথায় সে ভেবেছিল ওকে জামাই করবে – না এ কী! বাপ যে গহনা-টাকা এনেছে, ভেবেছিল আল্লার দান – মেয়ের বিয়ে দেবে, কিন্তু......

মাছ ধরে হৈ-হল্লা করে সবাই বাড়িতে এসে গেছে সাড়া পায় তহুরা। বাপ ডাকছে তার নাম ধরে। আম্মুদে ডাক শুনে বুঝতে পারে। নিশ্চয়ই বড় মাছ বাগিয়ে এনেছে। কাজ দেখাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘরের পেছন থেকে এক বোঝা ধঞ্চে গাছ মাথায় নিয়ে বাকুলে ঢুকল এসে তহুরা। বোঝাটা ফেলার সময় ধঞ্চে গাছে বেধে গিয়ে তার একদিকের বুকের পাশটা উদোম হয়ে গেল। সেদিকে ইউসুফকে হ্যাংলার মতো চেয়ে থাকতে দেখে চুলের কুটিকাটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'মরণ।'

'দেখ মা তহুর। কত মাছ ধরে লেইচি মোরা।' বললে ইরফান সরদার। 'তবু আদ্দেক বখরা দিতে হল। মৌরলা পুঁটি কেজি আড়াই – কেজি চারেক হবে ট্যাংরা, ন্যাদোস, কই, শোল, ল্যাঠা, বান, শিঙি, মাগুর আর একটা ইয়া বড় বোয়াল মাছ।'

তহুরা ছেলেমেয়েদের বললে, 'ভাল করে গা ধুয়ে আয় দুজনে। আহা ছেলের হাল দেখ, না, যেন ভোঁদড় হয়ে এয়েছে! রাহিলা, আমীনের গা 'লোগড়ে' দে। চুলে সোডা দিবি। তুই যেরকম নোংরা, তোকে বিদেয় করা দায় হবে দেখতিছি।'

ইরফান বললে, 'অকে বিদেয় করলে তোকেও বিদেয় করব মুই। তোর মা গ্যাছে, তার বদলি উ-শালী মোর কাছে তোর মা হয়েই থাকবে।'

জলকাদা মাখা শরীরে ভাই আমীনের হাত ধরে 'আগেয়া, আগেয়া, নাগিনওয়ালা আগেয়া' বলে নাচতে নাচতে পাঁচ বছরের ভাইকে নিয়ে ঘাটে চলে গেল রাহিলা।

জ্যান্ত জাঁওলা মাছগুলো বেছে উঠোনে পোঁতা ম্যাচলায় দিতে কলসী করে জল এনে ঢেলে ছোট একটা টাঁটি চাপা দিয়ে তার ওপরে ভারী শিল তুলে দিলে তহুরা।

ইরফান বললে, 'মোরা তো নিকিরি লয়, মাছ বেচবনি। এত মাছ কী হবে? ইউসুফ, তুই বাপ চাট্টি লিয়ে যা।'

তহুরা বললে, 'হঁ! মাছ ভাজলে খেয়ে তবে যাবে বলে শুয়ে পড়ে ছ্যালো।'

'তাই নাকি!' হেসে খুশি হয়ে বলে ইরফান গা ধুতে চলে যেতেই চাপা স্বরে তহুরা বললে, 'আজ তোমাকে আমি ন্যাদোস মাছ ভাজা খাওয়াব।'

রান্নাঘরের ভেতরে তহুরা বঁটি আর উনুনের ছাই আনতে ঢুকলে. ইউসুফ চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়াতে হঠাৎ খরিশ কেউটের মতো বঁটি বাগিয়ে ধরতেই হাঁটু গেড়ে পা জড়িয়ে ধরে কোলের ওপরে মুখ ঘসতে থাকলে রাগটা যেন মুহূর্তে কোথায় উধাও হয়ে গেল।' বঁটি ফেলে দিয়ে টেনে তুলে ভয় মেশানো গলায় বলতে থাকে তহুরা, 'ওই বাপ এসে পড়ল, কেউ দেখে ফেলবে, পালাও পালাও!......'

ইউসুফ কিন্তু কোনো কিছুই গ্রাহ্য না করে তহুরার ভরাট বুকের মাঝখানে মুখ নামিয়ে চেপে ধরে কান্নাভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'আমি তোমাকে চাই। তোমাকে চাই।......

'ঠিক আছে। তাই হবে।' ইউসুফের দুই গালে দুটো চুমো দিয়ে বলল তহুরা, 'ছাড়ো। যাও, শুয়ে পড়ে থাকো এখন। নিদ যাও। মাছ রান্না হলে ডেকে ভাত দোব।'

ইউসুফ ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে শান্তভাবে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে তক্তাপোশের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

তহুরা মাছ কুটতে বসে আজ হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। মাথার কাপড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে তার শরীরের কাঁপুনি সামলাতে লাগল।

ইরফান গা-হাত ধুয়ে এসে উঠোনের বাঁশের ভারায় জাল শুকোতে দেবার সময় ইউসুফকে না দেখতে পেয়ে বলল, 'হাঁ মা, ইসুব চলে গেল, মাছ দিয়ে ছেলি?'

ভাজা মাছ খাবার জন্যে রাহিলা আর আমীন নং নং করতে থাকলে তাদের দু-খানা মাছ তুলে দিয়ে বাপের কথার উত্তর দেয় তহুরা, 'দেখ, বোধহয় ঘরের ভেতরে শুয়ে আছে।'

গায়ে তেল চাপড়ে মাখতে মাখতে ঘরে উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে খুশিতে বলে উঠল ইরফান, 'তাই তো বটে! ওকেই আমি লাং-জামাই বানাতুম, খালি সম্পর্কটা উল্টো তাই।'

তহুরা বলে, 'রাহিলা আমার কচি মেয়ে আর ইসুবের বয়েস কত?' নাতিটাকে তেল মাখাতে মাখাতে ইরফান বলে, 'বয়েস কোনো ব্যাপার লয় মা, চেহারাটাই আসল।'

ভাত দেবার পর ওরা খেতে বসলে ঘরের ভেতরে তহুরা ইউসুফকে ডাকতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখল সত্যিই সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। মাথা ধরে একটু নাড়া দিতেই জেগে গেল। হাতটা ধরে বুকের ওপর চেপে রেখে পাশ ফিরে আবার ঘুমোতে গেল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ওর পিঠে-কোমরে বুলোতে বুলোতে আদর করে ডাকলে, 'এসো, খেয়ে লেবে, ভাত দিইচি। এসো সোনা!'

দু-হাতে তহুরার মুখটা ধরে নামিয়ে আনলে। ইউসুফের মুখের মধ্যে থেকে জিভটা টেনে নিয়ে তহুরা চকিতে পালিয়ে এলো। ইউসুফ এসে খেতে বসল। তার যেন এখন নেশা হয়েছে। ঘুমে ঢুলছে যেন। তার ভাব দেখে আমীন আর রাহিলা হাসতে লাগল।

সুন্দরবনের জংগলের মধ্যে আবার এসেছে তিনজন। ইরফান সরদার, ইউসুফ গায়েন আর অনন্ত ঘোড়ার তরুণ কিশোর ছেলে বসন্ত।

বসন্ত বাবার সংগে বার দুয়েক এলেও এমন করে জংগলের ভেতরে ঢুকে কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেনি নদীর ওপরে ডিঙিতে থেকেছে দাদুর সংগে। নারকোল, সুপুরি, ডিম কুড়িয়ে নেবার পর ডিঙি বেয়ে চলে গেছে। আজ তাকে সংগে করে গজাল-কাঁটা-খোঁচা দেখে সাবধানে পা ফেলে চারদিকে চোখ রেখে বন্যপ্রাণী চলাচলকারী সুঁড়ি পথে এগিয়ে আসতে হয়েছে। ভয়ে বসন্তর শরীর কাঁপছে দেখে ইরফান বললে, 'তোকে গাছে তোলাও তো এখন মুশকিল! বড় মিঞার গলা ঘড়ঘড়ানি শুনলেই তুই ভিরমি লেগে গাছ থেকে পড়ে যাবি।'

আগুন জ্বেলে চাকের দিকে তুলে ধরেছিল ইউসুফ। তারপর সে-ই কোমরে কাস্তে গুঁজে গাছে উঠে গিয়ে মউচাক কেটে ফেলে দিতে থাকলে ইরফান বসন্তকে নিয়ে চট ধরে লুফে নিতে থাকল। আজ তারা অন্য একটা দ্বীপে এসেছে, কারণ, বীরুমল নাগা সন্ন্যাসীর আক্রমণের ভয় আছে চামটা দ্বীপে, আর সেখানে অনন্তও প্রাণ খুইয়েছে

বাঘের হাতে। যে বাঘ মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়েছে সে আবার তার সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

ডালে ডালে প্রচুর বড় বড় মধুর চাক ঝুলে আছে। এ জঙ্গলে কেউ আসেনি অনেকদিন। 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু' একথা স্মরণ থাকলেও ইরফান রাইফেলটা কাছাকাছি রেখে চাক ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে গেল। হঠাৎ একটা পচা দুর্গন্ধ লাগল নাকে। বাঘের গায়ের গন্ধ? না, বাঘ পায়খানা করেছে কোথাও? নাকি জোর পিচকারী মারার মতো বিষাক্ত পেচ্ছাব ছড়িয়ে রেখেছে সুঁড়িপথের পাশের ঝোপে?

হঠাৎ চোখে পড়ল ডানদিকের ঝোপের তলায় একটা মানুষের গোটা কঙ্কাল। তাহলে কি অনন্তর শরীর এটা? চামটা দ্বীপ থেকে টেনে এনেছে?

ইঙ্গিত করতেই তিনজন এক জায়গায় হয়ে তিনদিকে মুখ করে দাঁড়াল। লাসটাকে দেখাল ইরফান। বলল, অনন্তর লাস!'

কেঁদে ককিয়ে উঠল বসন্ত। 'চোপ শালার বেটা।' তাড়া মারল ইরফান।

হঠাৎ সামনের ঝোপটা নড়ে উঠল।

রাইফেল তাক করল ইরফান। কিন্তু বাঘ নয়, যে জঙ্গল ঠেলে ধারালো ত্রিশূল উঁচিয়ে বেরিয়ে এলো, সে বীরুমল নাগা সন্ন্যাসী।

জ্বলন্ত ভাঁটার মতো তার আগুনে চোখ। ধারালো দাঁত। মাথায় কোঁচকানো চুলের রাশি। সে চিৎকার করে বলল, 'শালা লোক। চোট্টা আদমি! তুমকো মার ডালে গা।'

বীরুমল ত্রিশূল ছুঁড়তেই গুলি চালিয়ে দিলে ইরফান।

দুটো লাসই পড়ে গেল।

সন্ন্যাসীটা ডিগবাজি খেতে লাগল যন্ত্রণায়। ডান ঊরুর ওপর গাঁথা ত্রিশূলটা টেনে ছাড়িয়ে ফেলে ইউসুফ গামছা দিয়ে পা-টাকে সেঁটে বেঁধে ইরফানকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, 'মউ চাকের ছালটা মাথায় তুলে নিয়ে ছুটে আয় বসন্ত।'

'দাঁড়াও দাদা, তোমার পায়ে ধরি

পালোয়ারে উঠে দুজনে দুটো লগি ঠেলে তীর বেয়ে ছুটে চলল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ইরফানের শরীর।

জঙ্গল ছেড়ে দূরে এক জায়গায় এসে পালোয়ার থামিয়ে গালে জল দিতে লাগল ইরফানের। সে তখন যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে বলছে, 'কী জন্যে যে ওর ত্রিশূল পোঁতা জায়গা থেকে জিনিসগুলো তুলে লিয়ে গেনু মুই! এই তার ফল হল! ইসুব, বাপ মোর, মুই 'যেতি' মরি তুই তহুরাদের দেখিস।'

'দেখব চাচা, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার বাপ! তহুরাকে আমি......'

'বল বাপ, বল'

'তহুরাকে আমি বে করব।'

'আল্লা! ইয়া আল্লা!'

চোট খাওয়া জায়গার সামনে পেছনে আচ্ছা করে সেঁটে বাঁধন দেবার পরও রক্ত বন্ধ হচ্ছে না দেখে পীরখালির গঞ্জের ঘাটে পালোয়ার বেঁধে তিন চারটে মুদিখানা খুঁজে কর্পূর এনে লাগিয়ে দিতে কাজ হল।

রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

হাতুড়ে ডাক্তার এনে ড্রেসিং করিয়ে ইঞ্জেকশন দিলে বাড়িতে ফেরার পর। এ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে নানারকম ভজোকটো।

তহুরা আর রাহিলা মাথা কুটে কুটে কাঁদতে লাগল।

রাত্রে ইউসুফ রয়ে গেল। কাৎরানি, যন্ত্রণা অনেকটা কমে গেছে ইরফানের। ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছে খোপ ঘরটার মধ্যে বাঁশের তৈরি মাচার বিছানায়। রক্ত আর ওর শরীরে বেশি নেই বোধহয়।

হিম পড়ে গেছে – তাই ঘরের ভেতরের বিছানায় তহুরা, রাহিলা আর আমীন শুয়েছে।

দাওয়ায় শুয়ে রইল ইউসুফ।

মাঝরাত্রে মেছো বক ডাকছিল পুকুর পাড়ের দিকে বাঁশবনের মধ্যে।

তহুরা একসময় উঠে বাবাকে দেখতে যাবার সময় দেখলে ইউসুফ বসে আছে। খোপঘর থেকে ফেরার সময় বললে, 'বসে আছ যে, নিদ যাওনি?'

'নিদ আসে না তহুরা।'

'কেন? খালি গায়ে জাড় লাগতেছে? লও, মোর এই শাড়িটা পাট করে দিইচি, গায়ে দাও। কী হল? গোঁজ হয়ে বসে রইলে যে!'

'আমি একলা শোব?'

'ও বাবা, দোকলা কোথা পাব?'

'তোমাদের বাড়ি রাত কাটাচ্ছি, বদনাম হবে – অথচ তুমি আমার কাছে আস না। সেই বীরুমলকে দেখার পর থেকে আমার ভয় হচ্ছে। চোখ বুজোলেই যেন হাঁ হাঁ করে তেড়ে আসে।'

'তবে তুমি দোর বন্ধ করে ঘরে শোবে?'

'না।'

'যে মরদ বাঘের সঙ্গে লড়াই করে সে ভূতের ভয় করে! লক্ষ্মীটি, শুয়ে পড়ো...... এ কী! তোমার কপাল, বুক, গা-হাত এত গরম কেন? জ্বর হয়েছে এতো – বলোনি তবে?'

একখানা কাঁথা এনে শুইয়ে চাপা দিতে ইউসুফ বলল, 'আমাকে একটু চেপে ধরে থাকো তো। বড্ড কাঁপুনি পাচ্ছে।'

'বাইরে হিম লাগবে'খন। এতো জ্বর। তুমি বদনাম না করিয়ে ছাড়বে না দেখতে পাচ্ছি।'

ইউসুফের পাশে বসে তাকে চেপে ধরে থাকলে ইউসুফ যখন হাত বার করতে যায়, তখন শাসনের সুরে বলে তহুরা, 'এই, একদম চুপচাপ। নাহলে পালাব।'

ইরফান কাশতে থাকলে তহুরা উঠে গিয়ে বাপকে বলে, 'জানো বাপ, ইসুবের খুব জ্বর! বাইরে হিম পড়েছে......

খিনখিন করে ক্লান্ত স্বরে বললে ইরফান, 'তোরা মেঝেতে শো ইসুবকে তক্তপোশে শুতে দিয়ে দোরে তাসলা দে। ও না থাকলে মোর জীবন বাঁচতুনি মা। মুই যেতি মরে যাই, ইসুব তোদের ভার লেবে বলেছে। যা মা, লজ্জা করিসনি। কে আর এখন এমন করে মোদের পাশে দাঁড়াবে?'

তহুরা খুব খুশি। বাপ তার কী ভাল! ইউসুফকে উঠিয়ে ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে সেখানে শুইয়ে দিয়ে দোর এঁটে এসে কোলের ওপর মাথা নিয়ে টিপতে বসল। বললে, 'তোমার বাপ কিছু বলবে নে?'

হাতে হাত রেখে ইউসুফ বললে, 'আমার তো মা নেই। মাকে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দেয়। পুলুসকে টাকা খেইয়ে কব্বর দেয়। মুই তাখন পাঁচ বছরের। বাপ ফের বে করলে। সৎ মা আমাকে একদম দেখতে পারে নে। তার ছেলেমেয়েদের লিয়ে থাকে। বাপ তার কথায় ওঠে বসে। বাপ বলে, টাকে বল থাকে লিজে বে করে 'লেসে' (লিয়ে এসে) আলাদা থাক। ঘর নেই, ঘর বেঁধে লিক।'

তহুরা হেঁট হয়ে পড়ে আশ্বাস ভরা আদরের চুমু দেয় কপালে। বলে, 'তুমি পরে আমাকে বয়েস বেশি বলে ঘেন্নায় মারধর করে পালাবেনে?'

'তোমার বয়েস পঁচিশ আর আমার বয়েস সাতাশ। আমার মা নেই, তাই আদর-যত্ন পাইনি। চার বছর তুমি 'রাঁঢ়' হয়েছ কিন্তুন তোমার বদনাম নেই। তোমার বাপ আমার গুরু – তার বিপদের দিনে তার ঘরের খুঁটি হব না কেন তহুরা!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তহুরা উঠল। হ্যারিকেনের আলোটাতে জোর দিয়ে চাবি দেওয়া তোরঙ্গ খুলে বীরুমল নাগা সন্ন্যাসীর পুঁতে রাখা গয়না-টাকাগুলো দেখালে। তহুরার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ইউসুফ। এবার সে বুঝতে পারল নাগা সন্ন্যাসী কেন ত্রিশূল ছুঁড়ে মেরেছিল ইরফান চাচাকে। লোকটা তাহলে সন্ন্যাসী নয়। দাগী আসামী। জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত।

তহুরা বললে, 'এইগুলো বেচে তুমি জমি কিনবে – না হয় ব্যবসা করবে। বাপ ভাল হলেও আর চলতে-হাঁটতে পারবে বলে মনে হয় নে। খুব জখম হয়ে গেছে।' কাঁদতে লাগল তহুরা।

'তুমি কেঁদো না। আমি তোমার পাশে চিরকাল থাকব। আল্লার কসম। তবে একটা কথা বলি, জমি কিনলে তোমার নামে কেনা হবে। আমীনকে লিয়ে চাষ আবাদ করব। আর জঙ্গলে যাব না। জঙ্গল গরিবের কাছে অভিশাপ।'

'তাই হবে। এবার নিদ যাও। আমি বাচ্চাদের কাছে শুই।'

'না। তাহলে তুমি নিদ গেলেই আমি দোর খুলে গয়না-গাঁটিগুলো লিয়ে একেবারে মক্কায় পালাব।'

গাল টিপে দিল তহুরা। বলল, 'এখন একসঙ্গে যে থাকতে নেই গো যাদুমণি! গোনা হবে। বেয়ের পর তবে।'

'যারা এই নিয়ম করেছে তারা আমার শালা! তারা আমার মতন এইরকম সুযোগ পেলে এসব কথা বলতনি। এসো তুমি – সব গোনার (পাপের) ভার আমার।'

দুজনে তারা যেন বিধি নিয়ন্ত্রিত মেরু চুম্বকের আকর্ষণে সংযুক্ত হয়ে গেল। অবশ এক সুপ্তির মধ্যে বীরুমল নাগা সন্ন্যাসীর বীভৎস আক্রমণের ছবি দেখে হঠাৎ তখনই গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে রক্তহীন শরীরটা ঠান্ডা হয়ে গেল ইরফান সরদারের।

ভোরবেলা বাঘের গর্জন শোনা গেল জঙ্গল থেকে – হালুম হালুম......

সেই শব্দে ইউসুফ আর তহুরার ঘুম ভাঙল না। রাহিলা জাগার পর দেখলে তার মা ইউসুফের গলা জড়িয়ে ধরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। রাগ হল তার। দোর খুলে দাদুকে সেকথা জানাতে গিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে।...... ☐

আবদুল জব্বার

ছবি : নিতাই ঘোষ

সি পি আই (এম) ত্রিপুরা সরকারকে ভাঙনের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলেছে



ত্রিপুরায় আদিবাসী রমণীরা আসাম রাইফেলস-এর একদল জোয়ানের লালসার শিকার হয়েছেন বলে সি পি আই(এম) সম্প্রতি যে বোমা ফাটিয়েছে তাতে কংগ্রেস টি ইউ জে এস মন্ত্রিসভার ভিত কেঁপে উঠেছে। ঘটনার সত্যতা যাই হোক না কেন, এই মারাত্মক অভিযোগটি ইতিমধ্যেই সন্ত্রাস দমনে সেনাবাহিনীর চমকপ্রদ কৃতিত্বকে ম্লান করে দিয়েছে। শাসক দুই শরিক দলের মধ্যে ঘনিয়ে উঠেছে অশান্তির কালো মেঘ। পক্ষান্তরে সি পি আই (এম)-এর হাতে এসে গেছে হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের এক মস্ত সুযোগ। এই প্রেক্ষিতেই এই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।

কংগ্রেস (ই) ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির আঁতাতে চিড় ধরতে শুরু করেছে। কোয়ালিশন সরকার পরিচালনায় দুই শরিকের মৌল নীতির পার্থক্য সচিবালয়ের বাতানুকূল কক্ষ থেকে প্রকাশ্যে এসে পড়েছে।

মতবিরোধের নানাবিধ কারণ থাকলেও মূলত উপজাতি রমণীর উপর নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের গণ-ধর্ষণের অভিযোগ দুই শরিক দলের ছ' বছরের আঁতাতে চিড় ধরিয়েছে।



গণ-ধর্ষণের অভিযোগ নিয়ে দল ও মন্ত্রী পর্যায়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্যে মতবিরোধ নূতন মোড় নিতে শুরু করেছে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মন (কং ই) সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের দ্বারা উপজাতি নারীদের উপর গণ-বলাৎকারের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে অভিযোগগুলিকে সি পি আই (এম)-এর বিপজ্জনক রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলে বর্ণনা করেছেন। অপর দিকে যুব সমিতির সভাপতি ও রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের উপ-সভাপতি শ্যামাচরণ ত্রিপুরা উপজাতি মহিলাদের উপর নারকীয় গণ-ধর্ষণে শুধু উদ্বেগই প্রকাশ করেননি, ঘটনাগুলি চাপা দেবার চেষ্টাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অপপ্রয়াস বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কোয়ালিশন সরকারের দু নম্বর মন্ত্রী যুব সমিতির নগেন্দ্র জামাতিয়া আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনীর 'অত্যাচারের' বিরুদ্ধে তাঁরা নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না। 'সরকারে থাকি আর না-ই থাকি' অত্যাচারের প্রতিবাদে তাঁদের দল সোচ্চার হবেই। যুব সমিতির উভয় নেতাই দোষীদের শাস্তিও দাবি করেছেন।

শরিকী মতবিরোধ সচিবালয় থেকে রাজপথে চলে আসায় সি পি আই (এম) তথা বামফ্রন্ট রাজনীতির দাবা খেলার প্রথম রাউন্ডে জয়লাভ করল। কংগ্রেস (ই) যুব সমিতি সরকারের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে এবং সি পি আই (এম) আনীত নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির যথাযথ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

কংগ্রেস (ই) যুব সমিতির মধ্যে ছ'বছর আগে নির্বাচনী আঁতাত হলেও কতকগুলি মৌলনীতিতে তাদের মধ্যে মত পার্থক্য থেকেই গিয়েছিল। সি পি আই (এম) পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটাবার ইস্যুতে উভয় দলের সহমতে নির্বাচনী আঁতাত গড়ে ওঠে। যুব সমিতি, উপজাতিদের স্বার্থরক্ষায়, তাদের স্বকীয়তা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের স্বপক্ষে প্রথম থেকেই অটল ছিল। অবশ্য কংগ্রেস (ই) উপজাতিদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও তাদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিকে কখনো উপেক্ষা করেনি। উপজাতিদের রক্ষা কবচের প্রয়োজনীয়তা উভয় দলের কাছে স্বীকৃত বিষয় হলেও তার রূপরেখা কী হবে এবং তা কার্যকর করার পন্হা-প্রণালীর মধ্যে কমবেশি ফারাক থেকেই গিয়েছিল।

উপজাতি আতংকবাদী টি এন ভি দমনের বিষয়েও দুই শরিকের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য নির্বাচনের পূর্বেও ছিল, সরকার গঠনের পরেও পূর্ণ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়নি। সারা ত্রিপুরাকে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষণা ও নির্বাচনের মুখে সেনাবাহিনী মোতায়েন, যুব সমিতিকে 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে' মেনে নিতে হয়েছিল।

নানা বিষয়ে মতৈক্য ও মতানৈক্যের মধ্য দিয়েই গত নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) যুব সমিতি দশ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে পরাজিত করে গত পাঁচই ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরায় জোট সরকার গঠন করে।

নির্বাচনে পরাজিত সি পি আই (এম) রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে তখন থেকেই নেমে পড়ে। রাজনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য এই দল বিশেষ কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করে। পোড় খাওয়া সি পি আই (এম) নেতাদের স্ট্র্যাটেজি, জয়লাভে আত্মহারা কংগ্রেস (ই) ও তার শরিক যুব সমিতি বুঝে উঠতে পারেননি।

সেনাবাহিনীর উপস্থিতি ত্রিপুরার সন্ত্রস্ত জন-জীবনে আস্থা ফিরিয়ে এনেছে এবং প্রাত্যহিক খুন ও সন্ত্রাস থেকে নিরীহ মানুষের মনে স্বস্তিবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

টি এন ভি সন্ত্রাস দমনের যে নির্দিষ্ট কর্মসূচি নিয়ে সমগ্র ত্রিপুরাকে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষণা ও সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে — সেনাবাহিনী সে কাজ এখন পর্যন্ত সাফল্যের সংগে সম্পন্ন করা সত্ত্বেও তারা রাজনীতির

ফটো : সৌগত রায় বর্মন



সমীররঞ্জন বর্মন : নির্বিকার

কী সেই অভিযোগ ?

গত ৫ জুন ত্রিপুরা সরকারের অন্যতম শরিক টি ইউ জে এস সভাপতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বুটা সিং-এর কাছে একটি তারবার্তা পাঠান। এই তারবার্তায় বলা হয়, আসাম রাইফেলস-এর একটি দল ১ ও ২ জুন রাত্রে খোয়াই মহকুমার উজান ময়দান ও গন্ডছাড়া গ্রামে যায় এবং বন্দুক দেখিয়ে পুরুষদের বাড়িছাড়া করে। তার পরে দু গ্রামের অন্তত ২৫জন উপজাতি মহিলাকে ধর্ষণ করে। এর আগেই অবশ্য সি পি আই (এম) এই বোমাটি ফাটিয়ে দেয়। ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির ছাত্রশাখা হাতিমারা উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৮জন মহিলাকে হাজির করে ও এস ডি ও এবং এস পি-র উপস্থিতিতে তাঁদের ওপর বলাৎকারের অভিযোগ নথিভুক্ত করে। নির্যাতিতাগণ কেউই অবশ্য ডাক্তারি পরীক্ষায় যেতে সম্মত হয়নি। যুবনেতা শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এবং ছাত্র নেতা অমূল্য জামাতিয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, সি পি আই (এম)-এর উস্কানিতেই ওই ঘটনা ঘটেছে। সেদিন (৫ জুন) মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি থেকে ফিরে ঘটনা শোনেন এবং সাংবাদিকদের বলেন, ঘটনার তদন্ত হবে এবং দোষীদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি একথাও বলেন যে রাজ্যে আসাম রাইফেলস রয়েছে অনেকদিন ধরে এবং তাঁদের এনেছিল বামফ্রন্ট সরকারই।

ঘটনা এর পরে দ্রুত বদলে যেতে থাকে। সরকারের পক্ষ থেকে জেলাশাসক পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্তও হতে পারে। □

বিশেষ প্রতিনিধি



উপজাতি রমণী রাজনীতির শিকার

শিকার হয়ে পড়ছে।

সেনাবাহিনী মোতায়েন করার পর আজ পর্যন্ত টি এন ভি সন্ত্রাসবাদীদের একটি আক্রমণের ঘটনাও ঘটেনি। সেদিক থেকে বিচার করলে, সেনাবাহিনীর কৃতিত্ব অবশ্যই অনস্বীকার্য।

লক্ষ্যের বিষয় টি এন ভি সন্ত্রাস দমনে তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার বরাবরই অসহযোগিতার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারোপ করেছে। আসাম রাইফেলস ও সেনাবাহিনীকে উপদ্রুত এলাকা থেকে সরিয়ে নেবার ফলে টি এন ভি-র অত্যাচার ও আক্রমণ বেড়ে গিয়েছিল বলে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রকে দায়ী করেছিল। তারাও অধিক সংখ্যক আধা সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মোতায়েনের দাবি জানিয়েছিল।

কিন্তু কোয়ালিশন সরকার গদিয়ান হওয়ার সংগে সংগে সি পি আই (এম) সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠলো। বর্তমানে তাঁদের প্রচারে মুখ্য আক্রমণের লক্ষ্য–বস্তুই হল নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনীর কৃতিত্বের কথা অত্যন্ত চাতুর্যের সংগে পাশ কাটিয়ে তাদের 'অপকীর্তি' ও অত্যাচারের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করতে শুরু করেছে। এমন একটি সেন্টিমেন্টাল ইস্যু তারা বেছে নিয়েছে যে, সেনাবাহিনীর সব কৃতিত্ব অতি সহজেই মানুষের মন থেকে মুছে যেতে শুরু করেছে। মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার সি পি আই (এম)-এর এই স্ট্র্যাটেজি তড়িৎ-গতিতে জনমনে সরকার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সি পি আই (এম)-এর রাজনৈতিক কৌশল মোটামুটি সফল হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে গণ-ধর্ষণের অভিযোগ এনে সি পি আই (এম) এক ঢিলে দুই পাখি মারার লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছে। সরল উপজাতিদের সেন্টিমেন্টে তারা এমন একটা সুড়সুড়ি দিয়েছে যে, কংগ্রেস (ই) যুব সমিতির আঁতাতে শুধু চিড় ধরতে শুরু করেনি, সমগ্র উপজাতিদের মধ্যে সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

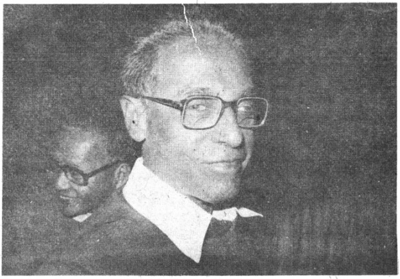
সেনাবাহিনীর এক শ্রেণী জওয়ানের বিরুদ্ধে সি পি আই (এম)-এর গণ-ধর্ষণের অভিযোগ সরকারিভাবে অস্বীকার করা হলেও – ধর্ষণের বলি যাঁরা হয়েছেন, তারা কিন্তু কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছেন না। নারীর ইজ্জতের উপর সরাসরি আক্রমণে সব শ্রেণীর মানুষের মনেই ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হয়ত ধর্ষণকারীকে কোনদিনই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ধর্ষিতাকে ধর্ষণের জ্বালা নিয়ে আমরণ জ্বলতে হবে।

সি পি আই (এম)-এর উপজাতি শাখা গণমুক্তি পরিষদ ধর্ষিতাদের নাম, ধাম এবং বর্বরোচিত ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে রাজ্যের রাজ্যপালের কাছে সুবিচার দাবি করেছে। তারা হাইকোর্টের কোন বিচারপতিকে দিয়ে এইসব ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছে। উপদ্রুত এলাকা আইন ও সেনাবাহিনীর অনতিবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিও গণমুক্তি পরিষদ জানিয়েছে।

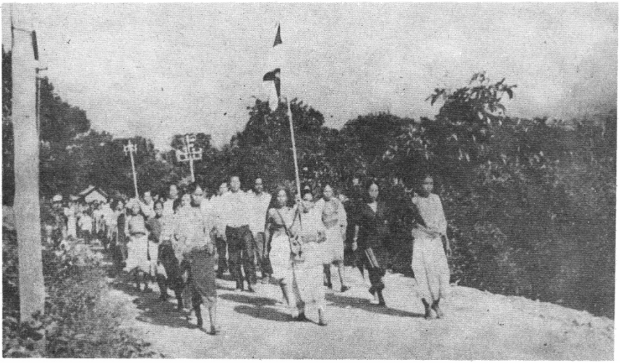
কংগ্রেস (ই) যুব সমিতি কোয়ালিশন সরকার অভিযোগগুলি অতিরঞ্জিত ও দেশবিরোধী বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেও জনমানস থেকে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য জেলা শাসককে দিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার ঘোষণা করেছেন অভিযোগগুলি প্রমাণিত হলে দোষীকে উপযুক্ত সাজা পেতেই হবে।

অভিযোগ প্রমাণ হোক আর নাই হোক, কোয়ালিশন সরকারের ভাবমূর্তি অবশ্যই ম্লান হয়েছে। এবং কোয়ালিশন সরকারের দুই শরিকের মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক পাশা খেলায় সি পি আই (এম)-র এটাই বড় লাভ। এই লাভের ধন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী কতটা ঘরে

আসরে নেমেছেন নৃপেন চক্রবর্তী



ফটো : সংকর নাগ দাস



কংগ্রেস (ই) উপজাতি যুব সমিতির জোট টিকবে তো?

সুধীররঞ্জন মজুমদার : উদ্বিগ্ন



ফটো : সৌজিত রায় বর্মন

তুলতে পারবেন এখন সেটাই দেখার। চীন সফর থেকে ফিরে এসেই তিনি দলের হৃতগৌরব ফিরে পেতে দারুণ সক্রিয় হয়ে উঠছেন।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় জন-গোষ্ঠীর চেহারাটা অন্যরকম। দেশ বিভাগের পর এ রাজ্যের পপুলেশন স্ট্রাকচার সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। উপজাতিরা নিজের ঘরে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় চব্বিশ লক্ষ। এর মধ্যে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ হল উপজাতি। জনসংখ্যা ব্যতীত, অর্থনৈতিক ও ভূমি সংক্রান্ত কতকগুলি কারণে উপজাতি ও অ-উপজাতিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা সর্বদাই সক্রিয়, এইসব মর্যাদাহানিকর ঘটনাগুলি সেই সাম্প্রদায়িকতাকে আরও বেশি উস্কে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যুব সমিতি একটি উপজাতি-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল। নারী নির্যাতনের এই অভিযোগগুলি যুব সমিতিকে রাজনৈতিক-ভাবে কোণঠাসা করেছে। উপজাতিদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করেছে যে, যুব সমিতি সরকারে থেকেও তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

অভিযোগগুলি প্রচারে পল্লবিত হয়ে এমন এক স্তরে পৌঁছেছে যে, যুব সমিতি এখন শ্যাম রাখবে না কূল রাখবে, বুঝে উঠতে পারছে না। সরকারে থাকলে উপজাতিদের আস্থা ও সমর্থনের অবক্ষয় তারা ঠেকাতে পারবে না। সরকার থেকে বেরিয়ে গেলেও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সি পি আই (এম)-এর সংগে মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দলের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হবে। সুতরাং যুব সমিতিকে রাজনৈতিক দল হিসাবে বাঁচতে হলে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে হবে।

কংগ্রেস (ই)-র এমন কোন সাংগঠনিক শক্তি নেই যা দিয়ে তারা রাজনৈতিকভাবে সি পি আই (এম)-এর অভিযোগ মোকাবিলা করতে পারে। কংগ্রেসের মধ্যে এমন কোন শক্ত নেতা নেই যে যিনি উপজাতিদের ক্ষোভকে প্রশমিত করতে পারেন। সি পি আই (এম) কংগ্রেসের এই সাংগঠনিক দুর্বলতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে। কংগ্রেস (ই) যদি অনতিবিলম্বে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারে, তাহলে সরকারে টিকে থাকা তাদের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব হবে না।

যুব সমিতি হয়ত এই মুহূর্তে আঁতাত ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পতন ঘটাবে না। কিন্তু সরকারে থেকে তারা যদি সরকারকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করে তাহলে এই সরকার জনসমর্থন হারাতে বাধ্য হবে।

ষাট আসন বিশিষ্ট বিধানসভায় বর্তমানে কংগ্রেস (ই) যুব সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা বত্রিশ। বামফ্রন্টের সাতাশ। একটি আসন সি পি আই (এম) সদস্যের মৃত্যুতে শূন্য। দলগত অবস্থা হল : কংগ্রেস (ই) – ২৫, যুব সমিতি – ৭, সি পি আই (এম) – ২৫ এবং আর এস পি – ২। যুব সমিতি আঁতাত ভেঙে বেরিয়ে গেলে কোন দলই এককভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। সুতরাং রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য হয়ে উঠবে। □

গোপালকৃষ্ণ রায়

সেনা সরাতেই অভিযোগ ?

ত্রিপুরায় টি এন ভি আক্রমণে অনুপজাতির সাধারণ মানুষের মৃত্যু এক নৈমিত্তিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল কয়েক বছর আগেই। সকলেরই অভিযোগ ছিল উগ্রপন্থীরা বাংলাদেশের ঘাঁটিতে শুধু প্রশিক্ষণই নেয় না, সেখান থেকেই এসে হত্যাকান্ড চালায়। আবার সেখানেই ফিরে যেত। এই পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তে কড়া পাহারার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করেছিলেন। তখন এটাও অনুভূত হয়েছিল যে, স্থানীয় প্রশাসন পুলিশ দিয়ে তা করতে পারছে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে সীমান্তের কয়েকটি অঞ্চলকে উপদ্রুত ঘোষণা করে সেনাবাহিনীর হাতে দিতে বার বার রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করে। কিন্তু তখনকার বামফ্রন্ট সরকার তা বার বার প্রত্যাখ্যান করে।

তারপরে এল ত্রিপুরার সাধারণ নির্বাচন। সাধারণ মানুষের মনে তখন ত্রাস। ভোট আদৌ দেয়া যাবে না এমন একটা সন্ত্রস্ত মনোভাব ত্রিপুরা ছাড়িয়ে অন্যত্রও অনুভূত হতে থাকে। তখন মানুষ খুন হওয়া ছিল নৈমিত্তিক। কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল সি পি আই (এম) টি এন ভি র নাম করে খুনোখুনি করে থাকে। এমনি পরিস্থিতিতে বিধানসভার নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে এবং সেনাবাহিনীকে আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়। সংগে সংগে রাজ্যে খুনোখুনি বন্ধ হয়ে যায়। ভোটে কংগ্রেস ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির মোর্চা সামান্য ব্যবধানে জয়ী হয়। ১০ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের এই অপ্রত্যাশিত অবসানে সারা দেশেই বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল। নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই বামফ্রন্টের পক্ষে সি পি আই (এম) ও তার নাম মাত্র শরিকরা অভিযোগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার সৈন্য দিয়ে রিগিং করে জয়ী হয়েছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সৈন্যরা ভোটারদের নিরাপদ ভোটদানকে নিশ্চিত করেছে মাত্র। তাঁরা নির্বাচনে আদৌ হস্তক্ষেপ করেনি।

একটা ঠিক সেনাবাহিনী শান্তি-শৃংখলার দায়িত্ব নেওয়ায় মানুষের নিরাপত্তাবোধ বেড়েছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোট দিয়েছেন নির্বিঘ্নে। তাই ভোটের পরেই বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস উভয় পক্ষই মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'রিগিং'-এর অভিযোগ ওঠে। ফল প্রকাশিত হবার পর। নিবার্চন মিটে গেলে সেনাবাহিনী টি এন ভি-র গুপ্ত ঘাঁটি অভিযান ও দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজে বের করতে শুরু করে। সীমান্তে কড়া পাহারা থাকায় উগ্রপন্থীদের পক্ষে বাংলাদেশের ঘাঁটিতে পালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনি অবস্থায় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণ-ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ত্রিপুরায় নিযুক্ত সেনাবাহিনী আসাম রাইফেলস ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সংযোগ-রক্ষাকারী জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং মেজর জেনারেল শের আমির সিং বলেছেন, উজান ময়দান গ্রামে আদিবাসী রমণীদের ওপর সেনাবাহিনীর ধর্ষণের অভিযোগের কারণ হল, ওই অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনীকে সরিয়ে দেওয়া, যাতে কুখ্যাত উগ্রপন্থীদের সেখানে নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া যায়।

ওই ঘটনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করতে গিয়ে মেজর জেনারেল সিং বলেন, নিরাপত্তাবাহিনী খোয়াই মহকুমায় আত্মগোপনকারী উগ্রপন্থীদের অবস্থান জানতে পারে এবং ২ জুন পূর্ব রাজনগর থেকে রবিচরণ কলই এবং কট্টর উগ্রপন্থী বিশ্বদেব বর্মাকে গ্রেপ্তার করে। সেই সংগে শ্রীবর্মার দুজন সাগরেদকেও গ্রেপ্তার করা হয়। এই অভিযান পরিচালনা করে 'আসাম রাইফেলস'-এর জোয়ানরা। এই গ্রামেরই পাঁচ কিলোমিটার দূরে আর এক উগ্রপন্থী ঘাঁটি হল 'উজান ময়দান' গ্রাম। এই গ্রামে আদিবাসী রমণীদের ওপর সেনাবাহিনীর গণ-ধর্ষণের অভিযোগ পেয়েই মেজর জেনারেল সিং আসাম রাইফেলস-এর ডি আই জি-কে নিয়ে উজান ময়দান যান এবং তদন্ত করে ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন, 'সেখানে রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের একটিও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আমি রাজ্য সরকারের তথ্যানুসন্ধানী কমিটির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।' সেনাবাহিনীর কারুর বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের প্রমাণ পাওয়া গেলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে বলে তিনি দৃঢ়তার সংগে ঘোষণা করেন।

মেজর জেনারেল সিং সেনাবাহিনীর সাফল্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, বেআইনি ঘোষিত ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার বাহিনীর মনোবল ভেঙে গেছে। এখন তারা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষুদ্র উগ্রপন্থী গোষ্ঠীতে টিকে আছে। অন্যরা বাংলাদেশ ঘাঁটিতে পালিয়ে গেছে। এখন রবিচরণ কলই ও দিলীপ কলই-এর নেতৃত্বাধীন, খুব বেশি হলে, জনা তিরিশেক উগ্রপন্থী দক্ষিণ জেলার তাইদু ও খোয়াই মহকুমায় আত্মগোপন করে আছে। সেনাবাহিনীর অভিযানে এ পর্যন্ত ৮৯ জন টি এন ভি সহযোগী ও জংগী সাগরেদকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে নগদ ৪৭ হাজার টাকা, ৩৫টি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া ১৩ জন উগ্রপন্থী ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। □

বিশেষ প্রতিনিধি

কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবাহিনীকে আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়



রোগমুক্তির আশায় মানুষের মিছিল বড়গাছিয়ায়



ফটো : তরুণ মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ আর চৈত্রে যেমন তারকেশ্বরের শিবের মন্দিরে মানুষ যায় বাঁকে করে জল নিয়ে তেমনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের আগে গোবিন্দপুর-বড়গাছিয়ায় বিবিমায়ের চালাঘরের মন্দিরে হাজার হাজার মানুষ চলেছে ডাব হাতে নিয়ে। শিবের মাথায় জল ঢালতে যায় মানুষ আর এখানে ডাবে ভরে দেওয়া ওষুধের আশায় চলেছে মানুষ। সেদিন সকালে ওই মানুষের মিছিলের সংগী হতে গোবিন্দপুর পোটোর মোড়ে পৌঁছতেই শুনতে পেলাম মাইকে নানারকম ঘোষণা। দেখতে পেলাম অসংখ্য মানুষ আর গাড়ির জটাজাল। সারি সারি দোকানপাট-হোটেল। বসেছে এক বিরাট মেলা। বড়গাছিয়ার বিবিমায়ের মন্দির ওই মোড় থেকে প্রায় আড়াই-তিন কিমি। সমস্ত পথে শুধু মানুষ আর মানুষ। দু পাশের দোকানের ফাঁকে ফাঁকে মাঠে মাঠে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। ভিড় ঠেলে ঠেলে পথ করে অতি কষ্টে যেখানে পৌঁছলাম সেখান থেকে ডানদিক-বাঁদিক যেদিকেই তাকাই দেখি সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে বিশাল লাইন। এর শুরু কোনদিকে একজনকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন,

আরো মিনিট পনেরো হেঁটে, এইগে যান সিখানে মন্দির।

– আর লাইনের শেষ ?

হাত নেড়ে বললেন – সে বলতে পারবুনি, এটি লাইনের পেট।

মিনিটে পনের অনেক কসরত করে পুকুর পাড়-আমবাগান-মাঠ পার হয়ে বিবিমায়ের চালামন্দিরের কাছে এলাম। অসংখ্য স্বেচ্ছা-সেবককে দেখলাম অক্লান্তভাবে লাইন মেনটেন করে চলেছেন। এক স্বেচ্ছাসেবককে এখানের ওষুধ দেওয়ার ঘটনাটা জানতে চাইলে তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন, 'আর কিছু বলতে পারব না। বলে বলে আমাদের মুখ ব্যথা হয়ে গেছে।'

বুঝলাম পত্রিকার নাম করে বেশ কিছু মানুষ এখানের ঘটনাটা জেনে গেছেন। পরে অবশ্য তাঁর থেকেই ঘটনাটা জানলাম।

বড়গাছিয়ার জংগলাকীর্ণ অঞ্চলে এক সময়ে বিবিমায়ের পূজার্চনা চলত। জংগল পরিষ্কার করে জনবসতি আরো বেড়ে ওঠার পরেও লৌকিক দেবী বিবিমায়ের পূজার্চনা বন্ধ তো হয়ইনি বরং আরো জাঁকজমক সহকারে পুজো হতে শুরু করে। এখন থেকে কয়েক মাস আগে বিবিমায়ের সেবক এক রাতে স্বপ্নাদ্য ওষুধ পান। সেই ওষুধ নাকি ডাবের সংগে খেলে রোগমুক্তি ঘটবে। সেই সেবক তখন থেকে স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ ডাবের মধ্যে ভরে রোগীদের দিতেন এবং তা খেয়ে নাকি রোগমুক্তিও ঘটতে লাগল। প্রথম প্রথম এখানে রোগীর সংখ্যা ছিল প্রতিদিন দশ-পনের জনের মত। ওষুধ দেওয়া হত রবিবারে। এখানের ওষুধ খেয়ে রোগমুক্ত মানুষদের মুখে মুখে শুনে বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসতে শুরু করে রোগমুক্তির আশায়। মাস দুয়েক হল এখানে আসা মানুষের সংখ্যা হাজার হাজার ছাড়িয়ে লক্ষ পার হয়ে গেছে।

এখানে ওষুধ তিন সপ্তাহের খেতে হয় মানে তিনবার। আগে মাত্র একদিন, রবিবারে ওষুধ দেওয়া হত। এখন হাজার ছাড়ানো লক্ষ মানুষের ভিড়ের জন্য ওষুধ দেওয়া হচ্ছে শনিবার-রবিবার। কোন সপ্তাহে সোমবারও। যিনি স্বপ্নাদেশ পান তিনি এখন নিজ হাতে ওষুধ দিচ্ছেন না। তবে যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের হাতেও রোগমুক্তি নিশ্চয়ই ঘটছে। তা হলে মানুষের এই মিছিল কেন ?

প্রচণ্ড রোদে আমাদের সামনেই লাইনের বহু মানুষকে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যেতে দেখলাম। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। কথা বলছিলাম সরিষা হাটের এক মুসলমান বৃদ্ধার সংগে। তিনি লাইন দিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার রাতে। কথা বললাম দস্তিপুরের, ডায়মণ্ডহারবারের বেশ কয়েক-জনের সংগে, যাঁদের কেউ এসেছেন বৃহস্পতিবার, কেউ বা শুক্রবার। প্রচণ্ডভাবে জণ্ডিসে আক্রান্ত এক রোগিণীর অবস্থা যেরকম দেখলাম, তিনি ঘরে ফিরতে পারবেন কিনা জানি না। তিনিও এসেছেন রোগমুক্তির আশায়। লাইনের যেদিকেই তাকাই সেদিকেই শুধু রোগমুক্তির আশায় উৎসুক মানুষ। পাঁচ থেকে পঁচানব্বই, সব বয়সের মানুষই রয়েছেন লাইনে। চালিতে শুইয়ে রাখা রোগীও এসেছেন বহু।

দেখা হল বনগাঁর কাছের মসলন্দপুরের এক বৃদ্ধের সংগে। তিনি গলার ক্যানসারে আক্রান্ত। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালের কার্ডটি দেখালেন। তিনি লাইন দিয়েছেন শনিবার রাতে। কথা বলার তেমন শক্তি নেই। অথচ বাঁচার জন্য তাঁর কী প্রচেষ্টা। ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলায় বললেন, 'এ রোগে বাঁচে না জানি, তবু যদি ডাব খেয়ে বাঁচি......'

কাকদ্বীপ, নামখানা, ক্যানিং, কুলপি, মথুরাপুর, জয়নগর থেকে শুরু করে বনগাঁ, বারাসাত, কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে হাওড়া, হুগলি থেকে হিন্দু-মুসলমান, দীন-দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, গাড়ি হাঁকানো উচ্চবিত্ত, বহু মানুষ এসেছেন ডাব খাবার আশায়।

এ অঞ্চলের ডাব গাছে একটা ছোট্ট মুচিও বলতে গেলে নেই। রিকশা, ভ্যান, অটোতে করে দূর-দূরান্ত থেকে আসছে ডাবের সারি। স্বেচ্ছাসেবকরা মাইকে ঘোষণা করছেন, 'ডাবের দাম কেউ দু টাকার বেশি দেবেন না।' এই ডাব বাড়ি থেকেও আনা যায়। না হলে এখান থেকে কেনা যায়। ওষুধের জন্য কোন পয়সা লাগে না।

হাঁপানি, জণ্ডিস অথবা ক্যানসারের রোগী যখন দু'রাত বা তিন রাত লাইন দিয়ে চালাঘর থেকে ওষুধ নেওয়া ডাব হাতে বের হচ্ছেন তাঁদের তখনকার মুখ-চোখের অবস্থা বর্ণনার নয়। মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেননি এঁরা। তাই ছুটে এসেছেন বাঁচার আশায়। এই ওষুধ খেয়ে মৃতপ্রায় রোগীরা সত্যি সত্যি নিরাময় লাভ করছেন কিনা জানি না, তবে রোগমুক্তির আশায় এই মিছিল দিনে দিনে ক্রমশই বাড়ছে। □

গৌতম মুখার্জি



হাওড়া, বালিতে পুকুর বুজিয়ে বসত

হাওড়া শহরের বড় বড় অট্টালিকাগুলোর আশেপাশে না আছে সামান্যতম সবুজ গাছপালা না কোন জলাশয়। এবং শহরে যা থাকা দরকার সেই ভূগর্ভ জল সরবরাহ ব্যবস্থাও নেই। আগুন লাগলে দমকল বাহিনী যে বিপদে পড়েন বেশ কিছু ঘটনা-ই তার প্রমাণ। হাওড়া-শহর কলকাতার তুলনায় অনেক নোংরা। খাটা পায়খানা, খাটাল, কাঁচা নর্দমা, উন্মুক্ত মর্গ, ভাগাড়, বস্তি সবই এখানে বেশি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি প্রদেশের গরিব মানুষগুলো রুটিরোজগারের আশায় হাওড়াতেই বেশি আসে। স্বভাবতই এই শহরে তাদের ঘিরে ছোট ছোট নরককুণ্ডও গড়ে উঠেছে। সেসব নরকে না আছে পরিষ্কার বাতাস, না আছে একটু পানীয় জল। এছাড়া, কলকাতা শহরে ঠাঁই না পেয়ে মাড়োয়ারি, সিন্ধি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীরা এবার হাওড়া শহরে ছড়িয়ে পড়ছেন। গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে কালোয়াড় বাহিনী আসতে আসতে লিলুয়ার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এসেছে। বেলুড়ের অবস্থান মোটামুটি সুখদায়ক। এই জনপদের কেন্দ্রস্থল থেকে জি টি রোড খুব কাছে, স্টেশনও বেশি দূরে নয়। তাই এখানেও ব্যবসায়ী বাহিনী ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাঙালিরাও বেশি টাকা ভাড়া নিয়ে এঁদের বাড়িঘর বাগান ভাড়া দিয়েছেন। যাঁরা এমনভাবে ভাড়া দিয়েছেন, তাঁদের একদল দারিদ্র্য বশতঃ দায়ে পড়ে দিয়েছেন, আরেকদল একান্তই অর্থলোভে।

অস্বীকার করা যাবে না জাতীয় অর্থনীতি ১৯৮২-৮৩ সালের পর থেকে সামান্য চাংগা হয়েছে। চাকুরিজীবীদের একাংশের হাতে কিছু টাকা পয়সা দেখা যাচ্ছে, ব্যবসায়ীদের তো কথা-ই নেই। অবাঙালি অর্থবান সম্প্রদায় যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, বাড়ি কিনছে, জমি কিনছে, ফ্ল্যাট বানাচ্ছে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালির একাংশ তাতে স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। অনেকেই উঠে পড়ে লেগেছেন যেমন করেই হোক একটু জমি একটা ছোটখাট বাড়ি চাই। না হলে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। জমি বাড়ি করার এই সার্বিক উদ্যোগে এসব অঞ্চলের পৌরকর্তৃপক্ষ নীরব দর্শকমাত্র। বাড়ি ঘর বানাবার সাধারণ নিয়ম-কানুনও যে মানা হচ্ছে না সেদিকেও তাদের নজর নেই। এই ব্যাপক বসতি বিস্তারের প্রকোপে সবংথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ। জমি নেই, অতএব পুকুর, ডোবা, জলা জমি সব ভরাট হতে চলেছে, হয়েও গিয়েছে শত শত। পরিণামে, সালকিয়া, লিলুয়া, বেলুড় অঞ্চল হাওড়া শহরের মত ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর এবং অংশত জতুগৃহ হয়ে উঠেছে।

বেলুড় গ্রামটি একসময় আদর্শ গ্রামের সার্থক উদাহরণ ছিল। গংগার তীরে চমৎকার জমি, প্রাচীন জি টি রোড জনপদের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। পশ্চিমে রেল রাস্তার ওপারে শস্য শ্যামলা প্রান্তর। দেশ বিভাগের পরে পশ্চিমের মাঠঘাট ভরে উঠল পূর্ববংগের মানুষদের আগমনে। স্বামী বিবেকানন্দ হাওড়া থেকে ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত অঞ্চলে মঠ স্থাপনের জন্য জায়গা খুঁজে খুঁজে বেলুড় গ্রামটিকে উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। একদা যে এই অঞ্চল কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল তার লৌকিক প্রমাণ বেলুড়ে অবস্থিত প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন কৃষির দেবী বিন্ধ্যবাসিনী। এই গ্রামে স্বভাবিকভাবেই ছিল বেশ কয়েকটি জলাশয়। আকারে গভীরতায় পুকুরগুলো ছিল দর্শনীয়। টলটলে জল শিশুর চোখের মত স্বচ্ছ সুন্দর। গ্রামবাসীরা বছর সাত আট আগেও এই চমৎকার পুকুরগুলো ব্যবহার করতেন। সাত-আট বছর আগে থেকে বাঙলাদেশের হাজার গ্রামের গ্রামবাসীদের মত বেলুড়-বাসীদের মানসিকতাও বদলে গেল। বেলুড়ের পালপাড়ায় আড়ে দৈর্ঘ্যে বেশ বড় আকারের একটি পুকুর ছিল। পাশের রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী হাজার পথিকের মানসিক প্রশান্তির আকর ছিল সেটি। পুকুরের উত্তর

পাড়ে ছিল বড় বড় কয়েকটা গাছ। একটি বিশাল গাব গাছ বড় বড় শিকড় মেলে দিয়েছিল জলের ধারে। পাড়ার ছেলেরা শিকড়ের ওপর বসে গল্প করতে করতে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহণ করত বুক ভরে। পথিকরা দুদন্ড দাঁড়িয়ে জলের ওপরকার শীতল স্নিগ্ধ বাতাসে ভরিয়ে মন প্রাণ নিয়ে চলে যেত আপন আপন পথে। কয়েক বছর আগে পুকুরের পাড়সহ কিছু অংশ বিক্রি হয়ে গেল। ভরাট করা হল, বাড়ি উঠল চার পাঁচটি। এখন ওই চার পাঁচটি পরিবারই পুকুরের ওপরকার বিশুদ্ধ বাতাস ভোগ করে, হাজার পথিক বা রাস্তার ধারের অধিবাসীরা তা থেকে বঞ্চিত।

পালপাড়ার বারোয়ারি পুজো মন্ডপের সামনে আরো একটি বড় এবং গভীর পুকুর আছে। পুকুরটির গভীরতা সম্পর্কে জনশ্রুতি – এখানে নাকি প্রতি বছর শারদীয়া অষ্টমী পূজার দিন একটি করে মানুষ ডুবে মরে। দু এক বছর অবশ্যই ঘটনাটা সত্যি দেখা গিয়েছে। এই বিখ্যাত এবং চারপাশের জনপদবাসীদের প্রাণদানকারী জলাশয়টির মৃত্যুদশা উপস্থিত। অনেকখানি অংশ বুজে এসেছে। এ পুকুরে জলের ওপর আলোকসজ্জা দেখতে, পুজো উৎসবের দিন, বেলুড়-বালি-লিলুয়া অঞ্চলের হাজার হাজার নরনারীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল। এর পশ্চিমে ছিল নয়নাভিরাম একটি বাগান ও পুকুর। পুকুরটি সম্পূর্ণ বুজিয়ে, বাগান কেটে গড়ে তোলা হয়েছে বসতি, প্রায় ৪০/৪২টি বাড়ি উঠেছে।

পুকুর বুজিয়ে বাড়িঘর বানাবার উদাহরণ বেলুড়-বালি অঞ্চলে অসংখ্য। ঐতিহায় বিন্ধ্যবাসিনীতলার কাছেই সাড়ে তিন বিঘা জুড়ে একটি দীঘি একসময় বেলুড়বাসীদের জল এবং মাছের অনেক সমস্যা মেটাত। এই জলাশয় এবং তার আশেপাশের অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নিচু হওয়ার দরুন পৌরব্যবস্থার অনেকগুলো নর্দমা এসে এই সরোবরেই মিলিয়ে যেত। শান্তিপ্রিয় স্থানীয় মানুষ কোনদিন এর প্রতিবাদ করেনি। অথচ ফল ভুগতে হয়েছে তাঁদেরই। বিরাট এই জলাশয়টিতে খাটা পায়খানার ডাবাগুলো মেথররা দিব্যি ধুয়ে পরিষ্কার করত। আশেপাশের খাটালের মোষগুলোর স্নানদীঘি ছিল এটি, ফলে এর নাম হয়ে গেল 'মোষপুকুর'। বিষাক্ত জল নিয়ে জলাশয়টি এতদিন বেলুড়ের বুকে বহাল তবিয়তে ছিল। এখন ভরাট করে প্লট হিসেবে বিক্রি হয়ে যাওয়াতে একদিকে যেমন স্বস্তি, আরেকদিকে দুশ্চিন্তা। এই অঞ্চলের জল-নিকাশী ব্যবস্থা তেমন ভাল নয় (শহর বা শহরতলীর কোন অঞ্চলেরই বা ভাল?)। বর্ষায় বৃষ্টিতে এবার কী সর্বনাশ হবে স্থানীয় বাসিন্দারা সেই ভেবেই চিন্তিত। যদিও মোষপুকুরের মাঝখান দিয়ে একটি বড় নর্দমা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু মূল জমি যেখানে নিচু সেখানে ওই একটি জলনিকাশী নালা কী করবে? শুধু মোষপুকুরই নয়, বেলুড়ের বেশ কয়েকটা জায়গায় সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়, তখন এইসব পুকুরই জলতলের সাম্য বজায় রাখে। পুকুর যত ভরাট হবে জলতল-সাম্য তত নষ্ট হবে, স্থানীয় অধিবাসীরা অভিযোগ করছেন, সাম্যবাদী শাসকরা এই সাম্যের কথা ভাবছেন না!......

গত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বেলুড় অঞ্চলে পুকুর ভরাট এবং সেই ভরাট জমি বিক্রি করা নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। যে পুকুরটি নিয়ে এই মনোমালিন্য সেটি বেলুড় গ্রামের প্রধান রাস্তা শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিটের পাশে অবস্থিত। এক মুখার্জি পরিবার এর মালিক। স্থানীয় প্রতিবেশীবৃন্দ শুনতে পেলেন পুকুরের পশ্চিমদিকের পাড়টি থেকে ভরাটকার্য শুরু হচ্ছে। শুধু শোনা নয়, পরদিনই চলে এল এক লরি মাটি, খোওয়া ইট প্রভৃতি। প্রতিবেশীরা রুখে দাঁড়ালেন, বললেন, পাড়ার মধ্যে বহুজনের ব্যবহার্য পুকুর ভরাট করতে দেব না!

পুকুরটির চারদিকে প্রায় ১৪/১৫টি বাড়ি। যথার্থই বহু মানুষ ব্যবহার করে থাকে এর জল। এ পুকুরে বর্ষায় সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়। পাশেই 'বোস ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে একটি কারখানায় কিছুদিন আগে আগুন লাগলে এই পুকুরটিই ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিল। পুকুরের পাড়ে কালীপূজার প্যান্ডেলে একবার আগুন লেগেছিল, তখনও এর জলই রক্ষা করেছিল মা কালীকে। বস্তুতপক্ষে, বেলুড়-বালি-উত্তরপাড়া অঞ্চলে আগুন লাগলে এই পুকুরগুলিই একমাত্র ভরসা।

'প্রতিবেশীবৃন্দ' নামধারী স্থানীয় যুবকদের একটি সংগঠন পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার জন্য প্রচার চালাচ্ছেন। চারদিকে পোস্টার ও দেওয়াল-লিপি দেওয়া হয়েছে। এদের প্রশ্ন, পুকুর ভরাটের বিরোধিতা করে শ্রীরামপুর, বরাহনগর প্রভৃতি পৌরসভা যেখানে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিভিন্ন খবরের কাগজে যা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে বালি পৌরসভা নীরব কেন? 'প্রতিবেশীবৃন্দ' যাঁকে যাঁকে চিঠি লিখেছে তাঁরা হলেন, নগর-উন্নয়নমন্ত্রী (চিঠির তারিখ: ১২/৪/৮৮ ও ২/৫/৮৮), মুখ্যমন্ত্রী (১২/৪/৮৮), বালি-পৌরসভা (৬/৪/৮৮ ও ২১/৪/৮৮), বালি থানা (৯/৪/৮৮), এ ডি এম (এল আর) এবং ডি এম (হাওড়া) (১২/৪/৮৮)। এত সব চিঠিপত্রের কোন উত্তরই এঁরা পাননি। শুধু বালি পৌরসভার প্রধান ও বালি থানার সঙ্গে কিছু মৌখিক কথাবার্তা হয়েছে। এঁরা পোস্টার ছাড়াও হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে প্রচার করছেন। এঁদের লেখা একটি পোস্টারে দেখা গেল, পাড়ায় পাড়ায় পুকুর বুজিয়ে অ-বাঙালি বড়লোকদের বাড়িঘর বানানোর বিরুদ্ধে এঁরা বেশ সরব। জুনের প্রথম সপ্তাহে বালি পৌরসভার কাছ থেকে এঁরা একলাইনের একটি উত্তর পেয়েছেন।

'প্রতিবেশীবৃন্দের' এসব অভিযোগ এবং পুকুরটি আদৌ ভরাট হবে কিনা, এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বালি পৌর-প্রধান অধ্যাপক সত্যপ্রকাশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে যেতে হল। অধ্যাপক ঘোষ বালি-বেলুড় অঞ্চলে সি পি আই এম নেতা এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ হিসেবে পরিচিত। অনেক প্রশ্নের, যেমন, এই পৌরসভার অধীনে কতগুলো ব্যবহার্য পুকুর আছে, কটা ভরাট হয়েছে বা হতে চলেছে, আপনারা কী ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছেন, অনুমতি ছাড়াই পুকুর ভরাট হয় কী করে, আপনার ব্যক্তিগত মতামত, ইত্যাদির উত্তর উনি দিতে চাইলেন না। বেলুড়ের ঘটনাটির ব্যাপারে অধ্যাপক ঘোষ বললেন, হ্যাঁ, ওরা চিঠি দিয়েছিল। চিঠিতে

পুকুর-স্নেহময়ী রমণীর মত



পরিচয়জ্ঞাপক কোন ঠিকানা বা তথ্য ছিল না, ফলে ওটা খুঁজে বের করতে কিছুদিন সময় লেগেছে। এরই মধ্যে ওরা বিশ্রী ব্যাপার শুরু করল, অভদ্র ভাষায় পোস্টার লিখে ছড়িয়ে দিল, আমি কিংবা আমরা নাকি ঘুষ খেয়েছি। তবুও ওরা যখন আমার কাছে এসেছিল, আমি মৌখিকভাবে বলেছি, এ ডি এম (এল আর) কিংবা টাউন অ্যান্ড কানট্রি অ্যাক্ট বিভাগের নির্দিষ্ট অনুমতিপত্র যদি ভরাটকারীরা দেখাতে না পারে তো ভরাটকার্যে নিশ্চিন্তে বাধা দিও। আর যদি দেখাতে পারে তো আমাকে ডাকবে। কিছুদিন আগেই চিঠিতে উত্তর দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে, পৌরসভা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কিন্তু এর আগেই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বার্থ নিয়ে ওরা একটি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে ডেকে আনে এবং যে রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় তা একপেশে। সেই সাংবাদিক আমার সঙ্গে দেখাও করেননি। যে ব্যাপার নিয়ে এত হৈ চৈ, পরে জানা গেল ব্যাপারটা পুকুর ভরাট নয়, পুকুরের পাড়টুকু ভরাট চলেছিল।

একটা কথা কিন্তু পরিষ্কার, পুকুর ভরাট করতে হলে সব ক্ষেত্রেই আগাম অনুমতির প্রয়োজন এবং পুকুরের মালিক ভরাট করতে চাইলে সবক্ষেত্রে সেটা বন্ধ করা যাবে কিনা, তাতেও সন্দেহের অবকাশ থেকে যাচ্ছে। কারণ, দেখা যাচ্ছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে গিয়ে মালিকরা জয়ী হয়েছেন।

পৌরসভার কাছে আন্দোলনকারীদের অনেক প্রশ্ন ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিভূ হিসেবে তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব ছিল সে সবের উত্তর দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের ব্যাখ্যায় রয়েছে, ৭ কাঠা আয়তনের বেশি হলে জলাশয় (ব্যবহার্য) ভরাট করা যাবে না। একমাত্র জনগণের স্বার্থযুক্ত না হলে। উদাহরণ হিসেবে বরাহনগর-এর আনন্দম সিনেমার পাশের ঝিল বুজিয়ে বাসস্ট্যান্ড করার ঘটনাটি তাৎপর্যমন্ডিত। বেলুড়, বালি, শিবপুর বা হাওড়া সদর অঞ্চলের ঘটনাগুলো কোনমতেই উক্ত উদাহরণের সাদৃশ্যমূলক

বেলুড়ে পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে দেওয়াল লিখন



নয়। বালি পৌরসভার কর্তারা নির্বাক। অনেক অভিযোগের উত্তর এঁরা সুচতুরভাবে পাশ কাটিয়ে যান।

পৌরসভার মদত

বালি গ্রামের একটি অখ্যাত পাড়ায় আছে প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন একটি দেবমন্দির (বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য নতুন)।এই মন্দিরের অনতিদূরে ২৮ কাঠা জুড়ে একটি পুকুর রয়েছে। দেবী ভদ্রকালীর মন্দিরের ৩১ বৈশাখের উৎসবে পূজোয় যাঁরা দণ্ডী কেটে যান তাঁরা স্নান করেন এই পুকুরে। পুকুরের জল স্নানাদি কার্যে ব্যবহার করেন প্রায় তিনশ নরনারী। কিন্তু জলাশয়টিও ধ্বংস হতে চলছিল। অসম সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রায় তিনশ নরনারী এই ধ্বংস অর্থাৎ 'পুকুর বুজিয়ে বসত' নামক 'সুমহান কার্যটি' (?) বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন।

পুকুরটির একদা মালিক ছিলেন স্থানীয় এক চ্যাটার্জি পরিবার। তারপর বিখ্যাত বীজ বিক্রেতা বঙ্কিমপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র বৈদ্যনাথ ঘোষ মালিক হন। ইনি স্থানীয় জনগণকে কথা দিয়েছিলেন পুকুরটি জনহিতকর কার্য এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রাখার প্রয়োজনেই অবিকৃত রাখা হবে। গত ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে স্থানীয় বাসিন্দারা শুনলেন পুকুরটি বিক্রি হয়ে গেছে। ৮৬-র নববর্ষ তাঁদের কাছে এক গভীর উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা বহন করে আনল। ৮৫ জন নাগরিক-নাগরিকার সইসাবুদ একত্র করে, বালি পৌর-প্রতিষ্ঠানকে একটি আবেদনপত্র দিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তরের একই ধরনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহাশয়কেও।

মন্ত্রী মহাশয়ের ব্যক্তিগত সচিব ২১ জানুয়ারি একটি উত্তর পাঠালেন স্থানীয় আবেদনকারীদের অন্যতম প্রণব রায়কে। উত্তরে (চিঠির নম্বর 10/Pari, Cal. 21st Jan. '86) জানা গেল, মন্ত্রী মহাশয় চেয়েছেন বালির পৌর-প্রধান যেন ব্যাপারটা যথাযথ তদন্ত করেন এবং West Bengal Town & Country Planning Act অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যবিধি প্রয়োগ করেন। অলক্ষ্যে বিধাতা হাসলেন এ চিঠির খবর পেয়ে। মালিকপক্ষ গোপন প্রস্তুতি নিয়ে অভিষ্ট সিদ্ধির পথে এগিয়ে এলেন। পুকুরের পাশের নরেন্দ্রনাথ মুখার্জি নামাঙ্কিত রাস্তাটাকে ৩ ফুট চওড়া করার অজুহাত দেখালেন তাঁরা। এজন্য পুকুর কিছুটা বোজাতেই হবে। ভরাটকার্যে এবার উদ্যোগী স্বয়ং পৌর দপ্তর।

স্থানীয় নাগরিক সমিতি, ভদ্রকালী মন্দির সমিতি এর বিরুদ্ধে সরব হলেন। আবার দরখাস্ত দিলেন ৭৮ জন আবেদনকারী। স্থানীয় কাউন্সিলর অলোকনাথ মুখার্জি ১৪-

৮-৮৭ তারিখে সেটা গ্রহণ করলেন। বহু মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বরও পৌরসভার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারছে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল পৌরসভার সম্পাদক প্রদত্ত ৮৯৩৩/৯-৪, তারিখ ১৪-১২-৮৭ চিঠিটিতে। তাতে লেখা হয়েছে, 'health hazard' সৃষ্টি না করে পুকুর ভরাট করা হবে এই মর্মে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এরপর ২৮-১২-৮৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহকারী সেক্রেটারি জি হালদার একটি চিঠিতে জানালেন যে, তিনি এ ডি (এল আর) হাওড়াকে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধন) আইন ১৯৮১ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে এর আগাম অনুমতি ছাড়া কোনও প্রকার জমির 'চরিত্র' (প্রকৃতি) বদলানো যাবে না। চিঠির নম্বর ১০২৩-এল রেফ/৭ পি-৩৩৭/৮৭। বালির এই ঘটনা এখন আদালতে। এপ্রিলের ২১ তারিখে (১৯৮৮) মাননীয় বিচারক কলকাতা উচ্চ ন্যায়াধিকরণ, ১৬-১২-৮৭-এর আদেশ বদলে দিয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রচুর কালো টাকার খেলা

বেলুড়ের গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে প্রায় ২৪ বিঘে আয়তনের বিশাল পুকুরটিও উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর অন্যতম মূর্ত উদাহরণ হতে পারে। পুকুরটির ডাক নাম ঠাকুরপুকুর। এর দক্ষিণ প্রান্তেই ঘুসুরি অঞ্চলের শুরু, আর তার মানেই অবাঙালি কালোয়াড়বাহিনীর এলাকা। পুকুরটি ভরাট করতে পারলে অন্তত ৫০ হাজার টাকা কাঠা বিক্রি হবে। গড়ে উঠবে বড় বড় কমপ্লেক্স। এরই পাশে 'গভর্নমেন্ট কলোনি'র তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়ির হাজারের অধিক কোয়ার্টার সবই প্রায় অবাঙালি ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে অনেক বছর আগেই। ঠাকুরপুকুরের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। কারণ, বালি পৌরসভা এটিকে বাঁচাবার জন্য কোন চেষ্টা বা পরিকল্পনা করেনি। বালি গ্রামের মোহনলাল ভাওয়াল রোডে একটি পুকুর ভরাটের ঘটনায় বালি পৌরসভা উদাসীন থাকেনি। গত নভেম্বর (৮৭) মাসে উক্ত পুকুরের মালিক শ্রীমতী কঙ্কাবতী সাধুখাঁ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পুকুর ভরাটের ঘটনা নিয়ে যথারীতি বিবাদ শুরু হয় স্থানীয় রবীন্দ্রপল্লী উন্নয়ন সমিতির পক্ষে প্রদীপ কুমার শূর এবং অন্যান্যদের। ১৪-১-৮৮ তারিখে পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে সত্যপ্রকাশ ঘোষ কঙ্কাবতী সাধুখাঁকে এক চিঠিতে এর শাস্তিযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত করেন। তা সত্ত্বেও শ্রীমতী সাধুখাঁ পুকুর ভরাট করছিলেন। কারণ এর শাস্তি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অনেকেই এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ।

পুকুর ভরাট রোধ সংক্রান্ত আইন ও নির্দেশ

১। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নির্দেশ : জনগণের ব্যবহার্য জলাশয়, আয়তন যার ৭ কাঠার বেশি, তা ভরাট করা যাবে না, তাতে কোন বাড়িঘরও বানানো যাবে না। একমাত্র বৃহত্তর জনগণের সাধারণ স্বার্থযুক্ত থাকলে তবে এটা সম্ভব।

২। ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) আইন ১৯৭৯ এর ৫২ ও ৫৩ (ক) ধারায় বলা আছে, পুরসভার আগাম অনুমতি ছাড়া পুকুর ভরাট করে সেখানে কোন নির্মাণ কাজ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং উক্ত দুই ধারায় শাস্তিও নির্দিষ্ট।

৩। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন-এর ৪/গ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, এ ডি এম (এল আর) কিংবা কালেক্টর (এল আর)-এর অনুমতি ছাড়া পুকুর ভরাট করা দণ্ডনীয়।

৪। ডবলিউ বি টি অ্যান্ড সি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) ১৯৮৭-এর ৪৫ ও ৪৬ ধারায় পুরসভার আগাম অনুমতি ছাড়া পুকুর ভরাট নিষিদ্ধ।

৫। কোন জলাশয় যদি জনস্বার্থযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে ROR-এ নথীভুক্ত হয়, তাহলে তার আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্তন করা যাবে না।

৬। এবং অবশ্যই মানবিকতার সুস্পষ্ট নির্দেশ। □

গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৮৭) কলকাতা হাইকোর্টে এরকম একটি 'কেস'-এর নথিপত্র থেকে জানা যায়, কোন একটি পুকুর বোজানো নিয়ে মামলাটি প্রথমে হাওড়ার অতিরিক্ত জেলা শাসকের (এল আর) এজলাসে শুরু হয়। তিনি মালিকদের পক্ষে রায় দিয়ে ভরাট করার আদেশ দেন। সেইমত মালিকরা ভরাট করা শুরু করেন। এটা গত বছরের ৬ মে তারিখের ঘটনা। কিন্তু এরপর প্রতিবেশীরা আপত্তি জানিয়ে আদালতে আবেদন জানান। টানাপোড়েন চলে। আবার, সেই একই বিচারপতি ৮-১২-৮৭-তে ভরাট বন্ধের আদেশ দেন জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা ভেবে।

বিভিন্ন ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে একদিকে সরকারের প্ল্যানিং ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগের কাজকর্ম ত্বরান্বিত না হওয়ার জন্য যেমন পুকুরগুলো ভরাট হয়ে চলেছে, আরেকদিকে জনসাধারণের ঔদাসীন্য এবং অজ্ঞানতা পুকুর ভরাট হতে সাহায্য করছে। উল্লেখিত আইন ৭৯-এর ৪৫ ও ৪৬ ধারায় যে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করার বিষয় লিপিবদ্ধ আছে তার গুরুত্ব স্বভাবতই কমতে বাধ্য যেখানে আইনের দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ সুরক্ষিত। মালিক পুকুর যেমন কাটাতে পারেন ভরাটও করতে পারেন। এতে হস্তক্ষেপ করা তাঁর মৌলিক অধিকারে আঘাত করার নামান্তর। তাঁছাড়া, কোন মালিক হয়ত জরুরী প্রয়োজনে (মেয়ের বিয়ে ইত্যাদি) পুকুর বুজিয়ে বিক্রি করতে চান, সেক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা অমানবিক।

অতএব, এটাই বোধহয় ভবিতব্য যে, হাওড়া কলকাতা শহর এবং ধীরে ধীরে শহরতলীর পুকুরগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। সেখানে গড়ে উঠবে বহুতল বাড়ি। এভাবে শহরতলী ক্রমেই ঘিঞ্জি হবে।

বহু বছর আগে সদ্য প্রয়াত সার্থক চলচ্চিত্রকার-অভিনেতা রাজ কাপুর 'একদিন রাত্রে' নামে একটি অসাধারণ ছবির নায়ক হয়েছিলেন। চরিত্রটি গ্রামের এক সরল যুবকের, কলকাতা শহরে এসে এক আঁজলা পানীয় জলের আশায় পিপাসার্ত ছেলেটা সারা রাত ঘুরে ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল, অথচ জল পেল একেবারে সূর্য ওঠার মুহূর্তে।

মৃত্যুর আগে দৈববলে যৌবন ফিরে পেয়ে রাজ কাপুর যদি হাওড়া শহরের পটভূমিতে 'আরেক দিন রাত্রে' নাম দিয়ে নতুন একটি ছবি করতে চাইতেন, অবশ্যই তিনি সার্থক হতেন। কলকাতা শহর, গভীর রাত্রে, অনেক বছর ধরেই নির্জলা। হাওড়া শহরও শুষ্ক। এমনকি হাওড়া শহরের শহরতলী লিলুয়া-বেলুড়-বালি অঞ্চলও জলহীন হয়ে পড়েছে। 'একদিন রাত্রে'র রাজ কাপুর মমতাময়ী এক জলকন্যার (নার্গিস) কলসী থেকে জল পেয়েছিলেন পরদিন ভোরে, 'আরেকদিন রাত্রে'র নায়ক স্বপ্নেও ওরকম ফুলগাছে জলসিঞ্চনরতা স্নেহময়ীর দেখা পাবেন না। এসব অঞ্চলে ফুলের বাগান নেই, ফুল নেই, গাছে দেবার জলও নেই। সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে, একদা সযত্নে কাটা পুকুরও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে তাই, 'আরেকদিন রাত্রে'র নায়ক পিপাসায় বুক ফেটে মরে যাবে, একবিন্দু জল পাবে না। সেদিন আর বেশিদূরে নেই। □

মানিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো : লেখক



নারীসঙ্গের টানাপোড়েনে মাইক গ্যাটিং

ক্রিকেটের মক্কা ইংলণ্ডে খেলোয়াড়দের সামাজিক শ্রেণী বদল হলেও সে দেশের কর্তৃপক্ষের রক্ষণশীলতার চেহারা আজও বদলায়নি।
অধুনা তার শিকার হলেন ইদানিংকালে ইংলণ্ডের সফলতম অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং। নারীসঙ্গের অভিযোগে তিনি অধিনায়কত্ব থেকে তো বটেই, দল থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছেন।
ঘটনা-রটনার আনুপুঙ্খিক বিবরণ সমেত পর্দার আড়ালের গলিঘুঁজির বিস্তৃত চেহারা ফুটে উঠেছে আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি-র প্রতিবেদনে। সঙ্গে আছে হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নারীসঙ্গের কিছু অকথিত কাহিনী।

'হ্যাঁ, আমারই নাম লুই শিপম্যান। আমি রথলি কোর্ট হোটেলে বারমেডের কাজ করি।'

পানীয়ে চুমুক দিয়ে লুই সামনে বসা লোকটিকে বলল – 'আরে তুমি আর কত মদ খাবে? সেদিন মাইক আর ওর বন্ধুরা যা গিলেছিল, তার থেকে বেশি তো পারবে না!'

'সেদিন মানে কবে?' জিগ্যেস করল লোকটি।

'ওই তো, ৫ জুন রবিবার। ওই দিনটা ছিল খেলার রেস্ট ডে। আমি জিগ্যেস করলাম, তোমাদের খেলা চলছে, আর তোমরা এত মদ গিলছ কেন? ওদেরই মধ্যে কেউ একজন বলল – ক্রিকেট কি অ্যাথলেটিক্স নাকি যে এসব খাওয়া বারণ? ক্রিকেট খেলার সময় যেকোন সাধারণ মানুষের মত এসব খাওয়া যায়। আরে বাবা, আমাদেরও তো রিল্যাক্স করতে হবে।'

কথা হচ্ছিল ইংলন্ডের অন্যতম দৈনিক সংবাদপত্র 'টুডে' পত্রিকার জনৈক সাংবাদিকের সংগে। সাংবাদিকটি অনেক চেষ্টা করে শিপম্যানের খোঁজ পান। তারপর তাকে ধরে বন্ধুত্বের ভান করে বসান নটিংহ্যাম প্রদেশের রথলি শহরের এক অখ্যাত বারে। অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিকের চোখ-নাক-কান সবসময়ই খুলে রাখা উচিত। টুডে-র সাংবাদিকটিরও তার অন্যথা হয়নি। তিনি কিছু উড়ো খবরের ভিত্তিতে 'মক্ষিরাণী'কে খুঁজতে শুরু করে খানিকটা অভাবিতভাবেই পৌঁছে যান অভীষ্ট লক্ষ্যে। আসলে সাংবাদিকটি নটিংহ্যামের ট্রেন্ট ব্রিজ মাঠে ইংলন্ডের সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট কভার করতে গিয়েছিলেন। তারপর মাঠেই শুনতে পান হোটেলে ইংলন্ড দলের কিছু খেলোয়াড়ের টুকরো-টাকরা কীর্তিকলাপের কথা। কিন্তু কখনই ভাবতে পারেননি কীর্তির মূল নায়ক ইংলন্ডের অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং। অন্তত 'টুডে' এ রকমই জানিয়েছে।

লুই-এর নামের আসল উচ্চারণ লোইস। কিন্তু ওর পূর্বপুরুষ জন্মসূত্রে ফরাসী কানাডিয়ান। তাই বোধহয় নামের বানান LOIS-এর জায়গায় LOUISE। ২০ বছরের লুই বা লোইস রথলি কোর্ট হোটেলে বারমেডের কাজ করত। ওই হোটেলেই জায়গা হয়েছিল নটিংহ্যামে প্রথম টেস্ট খেলতে আসা হোম টিমের। হোটেলের চেহারা ইংলন্ডের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সপ্তদশ শতাব্দীতে তৈরি দুর্গের মত। এটা যে কোন্ লর্ডের ভদ্রাসন ছিল তা জানা যায় না। তবে চার তারকা খচিত এই হোটেলের অতিথিরা অস্থায়ী বাসে, পানভোজনে বা আরাম-আয়েশে বিংশ শতকের অত্যাধুনিক বিলাসী ছোঁয়া পেলেও মধ্যযুগীয় এক আবরণের শিহরণ নিশ্চয়ই উপভোগ করেন। মধ্যযুগের স্থাপত্যের আদলে তৈরি এই হোটেলের চারপাশ দশ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। প্রাচীরের মাঝে মাঝে আবার মিনারও (ওয়াচ টাওয়ার) রয়েছে। এই হোটেলেই অধুনা ইংলন্ডের সবচেয়ে সফল ক্রিকেট অধিনায়কের খেলার কবর তৈরি হয়েছিল। আর লুই শিপম্যানের স্বীকারোক্তি তাতে শেষ পেরেকটি পুঁতেছে।

শিপম্যানের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্ট চলাকালীন মাঠের অনতিদূরে লায়ন ইন রেস্তোরাঁয় ইংলন্ড দলের কয়েকজনের সংগে দিন তিনেক সে দেদার মদ্যপান করে। যথানিয়মে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পানোন্মত্ততাও চলে। শেষে ৫ জুন রবিবার অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং স্বয়ং ওকে পানভোজনে নিয়ন্ত্রণ জানায় প্রতিদিন ১০০ পাউন্ড ভাড়ায় নেওয়া নিজস্ব স্যুইটে। 'আমি স্যুইটে গেলে ও নিজে আমায় পানীয় ঢেলে দেয়। সংগে নিজেও নেয়। অবশ্য ও আগে থেকেই খাচ্ছিল। তারপর একথা সেকথার পর সরাসরি ও আমায় ওক কাঠের বিছানায় টেনে নিয়ে যায়। যা হয়, আমরা বিছানায় প্রেম করি। মাঝে মাঝে ও একেবারে জন্তুর মত ব্যবহার করছিল, যেন



স্পোর্টস্‌ ওয়ার্ল্ডের সৌজন্যে

গ্যাটিং-এর অন্তরংগ চুম্বন : কেলেঙ্কারির মুখবন্ধ

কোন মেয়ের শরীর আগে কখনও দেখেনি।'

শিপম্যানের স্বীকারোক্তি এখানেই শেষ নয়। ও আরও বলেছে, 'হোটেলেই ম্যাচের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৩ জুন শুক্রবার অ্যালান ল্যাম্ব এবং পল জার্ভিস আমাকে সংগ দেবার আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু সেদিন আমার ভাল লাগছিল না বলে আর যাইনি। তবে যেদিনই আমরা একসংগে ড্রিংক করতাম সেদিন মাইক ছাড়াও থাকত ল্যাম্ব, জার্ভিস, ফিলিপ ডেফ্রিটাস আর পল ডাউন্টন।'

এরপর শিপম্যান বলেছে, 'আমি ক্রিকেট ভালবাসি না। কিন্তু ভাল না বাসলেও এটা বিশ্বাস করি যে, একটা ম্যাচের সময় এভাবে মদটদ খাওয়া উচিত নয়। আর ওদের মদ খাওয়ার বহর দেখে অবাক হয়ে যেতাম।'

প্রথম টেস্ট শেষ হয় ৭ জুন মংগলবার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পর পর প্রায় ১১টা ম্যাচে হারার পর এই প্রথম গ্যাটিংয়ের নেতৃত্বে ইংলন্ড দল ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্টে ড্র করে। গ্রাহাম গুচের ১৪৬ রানের সেঞ্চুরি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এমনিতে গ্যাটিংকে ট্রেন্ট ব্রিজ এবং লর্ডসের টেস্টে অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়েছিল। কিন্তু বৃটেনের রক্ষণশীল ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাবার পর গ্যাটিংকে আর নেতৃত্বে রাখতে ভরসা পেলেন না। ৯ জুন বৃহস্পতিবার গ্যাটিংকে ক্রিকেট নির্বাচকমণ্ডলীর সংস্থা টেস্ট অ্যান্ড কাউন্টি ক্রিকেট বোর্ড (টি সি সি বি) লর্ডসে ডাকেন। এবং টীম ম্যানেজার মিকি স্টুয়ার্টকে এই ঘটনা (বা দুর্ঘটনা) সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেন। স্টুয়ার্টের রিপোর্ট পাবার পর এবং গ্যাটিংয়ের বক্তব্য শুনে টি সি সি বি গ্যাটিংকে অধিনায়কত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে ৩৪ বছর বয়স্ক সহ অধিনায়ক জন এমবুরিকে নেতৃত্ব

দিতে ডাকেন। যদিও টি সি সি বি-র চেয়ারম্যান পিটার মে বলেছেন যে, এই ঘটনা জানাজানি হবার পর গ্যাটিং নেজেই এসে বলেছিল যে সে আর পরের ম্যাচগুলোয় অধিনায়ক থাকতে চায় না। কিন্তু টি সি সি বি গ্যাটিংকে অধিনায়ক তো রাখলেনই না, দল থেকেও তাড়িয়ে দিলেন। অবশ্য পিটার মে এও বলেছেন যে, তাঁরা গ্যাটিংয়ের যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদপত্রের বিবরণীতে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু গ্যাটিং নিজেই স্বীকার করেছে, সে ওইদিন ৩১তম জন্মদিন পালন করছিল। সেই জন্যেই ওই মহিলাকে জন্মদিনের পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই সময় অবস্থার গতিকে ঘরে তারা একা হয়ে যেতে পারে, কিন্তু শিপম্যানের বিবরণীমত ঘটনা কখনই ঘটেনি। সংগে সংগে পিটার মে-র বক্তব্য – সংবাদপত্রের রিপোর্টে বিশ্বাস না করলেও এটা বলা চলে টেস্ট চলাকালীন একজন মহিলাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ইংলন্ডের অধিনায়ক অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করেছেন।

মে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা মোটেই গ্যাটিংকে হোটেলের ঘটনার জন্য ডেকে পাঠাইনি। টি সি সি বি-র সংগে তার একটা চুক্তি হয়েছিল যে সে পাকিস্তানের আম্পায়ার শকুর রানার সংগে তার বিবাদের ঘটনা কখনই প্রচার করবে না। সেই চুক্তি ভেঙে সে তার আত্মজীবনী 'লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট'-এ সেই ঘটনা উল্লেখ করেছে। সেই ব্যাপারে নিজের বক্তব্য জানাতেই সে টি সি সি বি-র সামনে এসেছিল।' কিন্তু মে যতই সাফাই গান না কেন, বৃটেনের পত্রপত্রিকার মতে 'ট্যাবলয়েড প্রেসে' যৌন কেলেংকারির ঘটনা ছাপা হবার পরই টি সি সি বি গ্যাটিংকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

এদিকে গ্যাটিংয়ের স্ত্রী এলেন বলেছে, 'সবার এটা জানা দরকার যে, আমি আমার স্বামীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং হোটেলের ঘটনা সম্পর্কে যে বিবৃতি মাইক দিয়েছে সে ব্যাপারে কোনরকম দ্বিমত আমার নেই।'

এলেনের বক্তব্যে এক ধরনের শীতলতা রয়েছে। কিন্তু এলেনের মা গ্যাটিংয়ের শ্বাশুড়ি জীন ম্যাবট আরও উগ্রভাবে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'এই ঘটনা স্রেফ বদমাইসি করার জন্যে ছড়ানো হয়েছে। মাইক এবং এলেন তাদের আট বছরের বিবাহিত জীবনে একবারও এমন কোন সমস্যার সামনে পড়েনি যে মাইককে অন্য মেয়ের দিকে তাকাতে হবে। তাছাড়া মাইক এরকম খারাপ কাজ করতে পারে বলে আমি একদম বিশ্বাস করি না। ওই শিপম্যান মেয়েটাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি ওকে সিধে করে দেব। ওর বাঁদরামি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেব। ওকে দেখিয়ে দেব জীবন কাকে বলে।'

গ্যাটিং ও ল্যাম্ব : কেলেংকারির দুই নায়ক



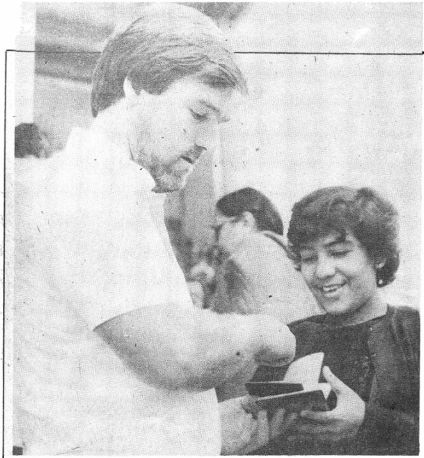
এরপর মাবট বলেন, 'আমি বুঝতে পারি না এইসব অল্পবয়েসী মেয়েরা এরকম নোংরা কাজকর্ম করে কীভাবে!' এরপর উনি নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন এইভাবে, 'মনে হয় ওরা শুধু খ্যাতি আর অর্থের জন্য এসব করে বেড়ায়। কিংবা শুধুই কাগজে নাম ছাপা হবে বলে এত নিচে নামতে পারে।'

কিন্তু মাইক এবং এলেনের দাম্পত্যজীবনে এর কোন প্রভাব পড়বে কী না সেই ভেবে ম্যাবট বলেছেন, 'এভাবে মাইকের নাম আগে কখনও সামনে আসেনি। আমি অন্তর থেকে বিশ্বাস করি এটা সম্পূর্ণ সময়ের ব্যাপার। একমাত্র সময়ই এরকম খুচরো ক্ষত সারিয়ে তুলতে পারে। আবার সৌভাগ্যের কথা, এসব ঘটনা ক্ষতি করার বদলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে আরো জোরদার করে।'

শিপম্যানের সংগে গ্যাটিংয়ের সম্পর্ক নিয়ে বৃটেনের ক্রিকেট মহল আলোড়িত হলেও টি সি সি বি বারবারই বলে চলেছে চুক্তি ভাঙার অপরাধেই গ্যাটিংকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এদিকে শিপম্যান হোটেলের ঘটনার পরিণতি দেখে কিছুটা দুঃখ, কিছুটা সাধুতার নামান্তর দেখিয়ে বলেছে, 'মাইকের জন্যে আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।এখন মনে হচ্ছে ওসব না ঘটলেই ভাল ছিল। আসলে আমার কোন কিছুই বলা উচিত হয়নি। কিন্তু বারে বসে এত মদ খেয়ে ফেলেছিলাম যে কী বলতে কী বলে ফেলেছি কিছু মনে নেই। তার ফলেই ভুলটা করে ফেলি।' সংগে সংগে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে শিপম্যান জানায়, 'তবে যাই বলি না কেন মাইককে ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্য আমার একেবারেই ছিল না। কিন্তু অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এক একসময় আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে। যাই হোক না কেন, ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্যি।' শিপম্যান নাকি ওর বন্ধুদের জাঁক দেখিয়ে বলেছিলেন যে, 'মাইক আমার ৪৮ তম প্রেমিক। কিন্তু ও যদি এটা অস্বীকার করে তবে ও মিথ্যে কথা বলবে। আমি খুব ভাল করেই জানি সেই রাত্তিরে হোটেলের ঘরে কী ঘটেছিল। যা ঘটেছিল ঠিক সেইটাই আমি প্রেসকে জানিয়ে ফেলেছি। একবর্ণও বাড়িয়ে বলিনি।'

ঘটনা সম্পর্কে হোটেল কর্তৃপক্ষের মতামত চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষের তরফে কোন কিছু বলতে অস্বীকার করা হয়। তবে বৃটেনের সংবাদ সংস্থা প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের কাছে হোটেলের জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত একজন অতিথি অন্যদের জ্বালাতন না করছেন, ততক্ষণ আমরা তাঁদের ব্যাপারে নাক গলাই না। তাঁরা যা করবেন তা সমস্তই তাঁদের নিজেদের ব্যাপার।'

এদিকে হোটেলে শিপম্যানের সহকর্মীরা বলেছে যে, ও যদি আবার এখানে ফিরে আসে তবে এমন মার খাবে যে সারা জীবন মনে থাকবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড ওয়েট্রেস সারা সোয়ান বলেছে, 'ও নিজে ডুবছে ডুবুক, আমাদের সবাইকে জড়াল কেন? ও ফের এখানে এলে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।'



অটোগ্রাফ শিকারী এই যুবতীরাই ভালবাসেন সংগ দিতে

গ্যাটিংয়ের খেলার ভবিষ্যৎ তো গেছেই, সংগে অন্য চার খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধেও টি সি সি বি ব্যবস্থা নেবে বলে ঠিক করেছিল। নির্বাচকমন্ডলী জবাবদিহির জন্য তাদেরও ডেকেছিল। কিন্তু ব্যবস্থা নেবার বদলে 'খেলার দিকে তাকিয়ে' তাদের শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ৯ জুন তারিখে অ্যালান ল্যাম্বও লর্ডসে এসেছিল অভিযোগের জবাব দিতে। তার মেজাজ মোটেই ভাল ছিল না। ঘরের বাইরে সাংবাদিকরা তাকে ঘিরে ধরলে সে চড়া গলায় বলে, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব শুনতেই টি সি সি বি আমায় ডেকেছিল, অথচ আশ্চর্য ওরা নিজেরা এই অভিযোগ করেনি।' আর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলে, 'তোমরাই আমাদের নামে মিথ্যে অভিযোগ এনেছ। তোমরা দেখে নিও টি সি সি বি পরে ভুল বুঝে ক্ষমা চেয়ে নেবে।' এই বলে সশব্দে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে ল্যাম্ব চলে যায়।

প্রশ্নটা উঠেছে এখানেই। একদল ক্রীড়ামোদি প্রশ্ন তুলেছেন, ঘটনাটি কি সত্যিই ঘটেছিল নাকি কয়েকটা কাগজ তাদের চিরপরিচিত ভূমিকা পালন করেছে? আসলে বৃটেনের কয়েকটা পত্রপত্রিকা ক্রিকেটের ব্যাপারে বহুদিন থেকেই লবি তৈরি করে রেখেছে। যখন যে অধিনায়ককে পছন্দ হয় না, তার বিরুদ্ধে যে কোনভাবে হোক তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। আগের অধিনায়ক গাওয়ারের বেলাতেও তাই হয়েছে। এছাড়া অধিনায়ক নয় এমন ক্রিকেট ব্যক্তিত্বকেও কাগজগুলো আক্রমণ করতে ছাড়েনি। এক নম্বর উদাহরণ ইয়ান বথাম।

গ্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ যে মিথ্যা এরকম সন্দেহের অবশ্য একটা যুক্তিও আছে। গ্যাটিং ৭৭-৭৮ সালে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সফরের সময় ইংলন্ডের হয়ে খেলা শুরু করেন। নটিংহাম টেস্ট অবধি মোট ১৬টি টেস্টে গ্যাটিং ইংলন্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং এখনও পর্যন্ত ৫৯ বার ইংলন্ডের হয়ে খেলেছেন। এমন সময়ে দলের নেতৃত্ব গ্যাটিংয়ের কাঁধে এসে পড়ে যখন ইংলন্ড টিম ছিল একদম টুকরো টুকরো অবস্থায়। কিন্তু গ্যাটিং প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে সাম্প্রতিককালে তিনিই ইংলন্ডের সফলতম অধিনায়ক। গ্যাটিংয়ের অধিনায়কত্ব গ্রহণের সময় দলের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের অধিকাংশকেই তিনি পাননি। একমাত্র ছিলেন গ্রাহাম গুচ। এবং এমন সময়ে গ্যাটিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠল যখন তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে পর পর ১১ বার হারের বদলা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আসলে ঘটনার পেছনে সত্য বা মিথ্যা যাই থাকুক না কেন, এই ঘটনায় আরও একবার প্রমাণ মিলল বৃটিশরা প্রচন্ড 'পিউরিটান'। জীবনের সব ক্ষেত্রেই 'বৃটিশ পিউরিটানিজম' তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে এবং তাতে ভালর চেয়ে অধিকাংশ সময়ে মন্দই হচ্ছে। গ্যাটিংয়ের ঘটনাই তার প্রমাণ। □

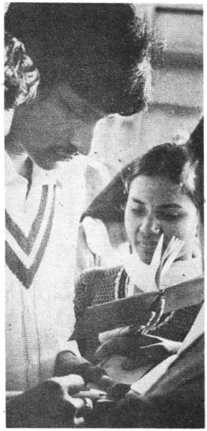
এদেশে কেলেংকারি ঘটলে তা নিয়ে হৈ চৈ হয় না

ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগে চলতি সিরিজের প্রথম টেস্টের সময় ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইক গ্যাটিং নারীঘটিত কেলেংকারির সংগে জড়িয়ে পড়লেন। ফলে শুধু দলের নেতৃত্ব থেকেই অপসারিত হননি, দ্বিতীয় টেস্টে দল থেকেও বাদ পড়লেন। এটাই সব নয়, এই ঘটনায় তাঁর টেস্ট জীবন নিয়েও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। ৮৬ সালে ইংল্যান্ড দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময় ইয়ান বথাম সম্পর্কেও এইরকম চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছিল। তখন বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, হোটেলের ঘরে বারবারা নামে একটি মেয়ের সংগে বথাম এমন প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় ছিলেন যে খাট পর্যন্ত ভেঙে যায়।

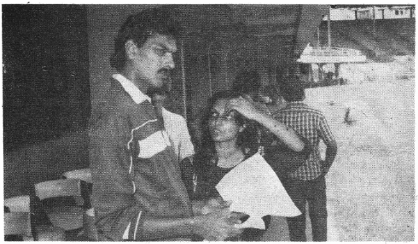
অবশ্য গ্যাটিং বা বথামই নন, ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যেও এই রোগ সংক্রামিত। এই মুহূর্তে অন্য খেলার চেয়ে ক্রিকেটে গ্ল্যামার অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবে ক্রিকেটারদের মধ্যেও গ্ল্যামার ছড়িয়ে পড়েছে। ইদানিং ক্রিকেটারদের পিছনে, তাদের মধ্যে আবার যাঁরা হি-ম্যান সব সময়ই অনেক মেয়ে তাঁদের পেছনে ঘুরঘুর করে। এর মধ্যে অটোগ্রাফ শিকারীরা যেমন আছেন, তেমনি ক্রিকেটারদের সংগ পেতে বা তাদের 'সংগ' দিতে আগ্রহীরাও রয়েছেন।

কলকাতা বা অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে টেস্টের সময় আমরা দেখি, ক্রিকেটারদের পিছনে সব সময় একগাদা মেয়ে। ড্রেসিং রুমের বাইরে, হোটেলের লবিতে বা অন্য কোনখানে মাঝে মাঝে দেখা যায় কিছু ক্রিকেটার এক বা একাধিক মেয়েকে বগলদাবা করে বসে আছেন। কিছু ক্রিকেটার আবার তাদেরকে হোটেলে নিজের ঘরেও নিয়ে যান। মেয়েরাও যান, অনেকে স্বেচ্ছায়, কেউ কেউ অনিচ্ছাতেও। তবে আজ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অভিযোগ কখনো প্রকাশ্যে আসেনি। কোন মেয়েও কখনো প্রকাশ্যে এমন অভিযোগ আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে করেনি – কীভাবে সে কোন ক্রিকেটারের ঘরে রাত কাটিয়েছে। এখানকার পত্র-পত্রিকাগুলিও ঐসব খবর নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না।

আসলে বিদেশে ক্রিকেটার আর সাংবাদিকদের কাছে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটে এখনো এটা ততটা খোলামেলাভাবে আসেনি। ক্ষেত্রবিশেষে এলেও তা লোক জানাজানি হয়নি বা তেমন হৈচৈও হয়নি তা নিয়ে এখন পর্যন্ত। তবে কয়েক মাস আগে একটা ঘটনা কিছুটা আলোড়ন তুলেছিল। সম্ভবত ঘরোয়া ক্রিকেটের কোন একটি ম্যাচ চলার সময়। যতদূর মনে পড়ছে ম্যাচটা হয়েছিল ব্যাংগালোরে। ঘটনাটি হচ্ছে, ভারতীয় দলের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান সদানন্দ বিশ্বনাথের ঘরে (যে হোটেলে ছিলেন) জনৈকা ঢুকেছিলেন যতদূর সম্ভব অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য, কিছুক্ষণ পর তিনি কাঁদো কাঁদো মুখে বেরিয়ে আসেন। ঘটনাটা খবরের কাগজেও প্রকাশিত



সন্দীপ পাতিল : নায়িকার ভালবাসায় বন্দী



রবি শাস্ত্রী : মেয়েদের সংগ ভালবাসেন

হয়েছিল। তবে ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি। খবরের কাগজগুলি এ নিয়ে মাথাও ঘামায়নি। কিছুদিন আগে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক ছিলেন রবি শাস্ত্রী। সম্প্রতি একটি টেস্ট এবং পর পর কয়েকটি একদিনের ম্যাচে তিনি দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এখনো পাকাপাকি অধিনায়ক হননি। সহ অধিনায়ক থাকাকালে রবি একটি সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট বলেছেন, 'মেয়েদের সান্নিধ্য আমি পছন্দ করি।' ইদানিং ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে শাস্ত্রীই সবচেয়ে মেয়েঘেঁষা বলে অভিযোগ। যেকোন টেস্ট সেন্টারেই হোক না কেন, শাস্ত্রীর আশেপাশে, সামনে-পেছনে সর্বদা মেয়ে। এদের সংগে তার মেলামেশাও বেশ ঘনিষ্ঠ। এমনকি শোনা যায়, হোটেলের ঘর পর্যন্তও কখনো কখনো সেটা পৌঁছয়। এ নিয়ে বোম্বাই-এর এক সাংবাদিক কিছু লেখা-লেখি করেন। ফলে রবি তাঁকে বাস্টার্ড বলে মারতে যান। তবে আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে কখনো শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি।

আর এটাও ঠিক, আমাদের ক্রিকেটাররা যা-ই করুন, ভারতীয় পরিবেশে এখনো মেয়েদের সংগে ফস্টিনস্টি করার ব্যাপারটা বিদেশি ক্রিকেটারদের মত অতটা খোলামেলা এবং ন্যক্কারজনকভাবে কখনো প্রকাশ পায়নি। ইডেনে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট চলার সময় ভিভ রিচার্ডসের সংগে মাঠের বাইরে ছায়ার মত লেগে থেকেছেন নীনা গুপ্তা। এমনকি, হোটেলে রিচার্ডসের ঘরেও নাকি অবাধ যাতায়াত ছিল নীনার।

শাস্ত্রীর সংগে অমৃতা সিংয়ের ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও সে সম্পর্কের কোন মধুর পরিসমাপ্তি হয়নি। তার আগেই ইতি ঘটে গেছে সম্পর্কের।

বোম্বাইতে যখন টেস্ট ম্যাচ হয়, বিশেষ করে বিদেশি ক্রিকেটারদের সংগে অভিনেত্রীদের নানা ভঙ্গিমায় দেখা যায়। হোটেলে নাচ-গান, হুল্লোড় হয়। বাংলা সিনেমার নায়িকা দেবশ্রী রায়ের সংগে প্রাক্তন ক্রিকেটার-নায়ক সন্দীপ পাটিলের সম্পর্ক বেশ মধুর। কলকাতায় এলে সন্দীপের সংগে দেবশ্রীর সাক্ষাৎ ঘটেই। তবে এর মধ্যে অন্যরকম কিছু খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন।

৬৭ সালে ভারত গিয়েছিল ইংলন্ডে টেস্ট খেলতে। প্যারিসে তখন চলছিল 'আন ইভনিং ইন প্যারিস' ছবির শ্যুটিং। লন্ডন থেকে ভারতের অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি উড়ে গেলেন প্যারিসে শর্মিলা ঠাকুরের সংগে দেখা করতে। দুজনের মধ্যে তখন উদ্দাম প্রেম। এবং সেই প্রেমের 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' ঘটে তারপর। পতৌদি-শর্মিলা এখন সুখী দম্পতি।

ইদানিং নারীসংগ লাভে সবচেয়ে ভাগ্যবান ক্রিকেটার বোধহয় ইমরান খান। কিন্তু দীর্ঘদেহী দারুণ চেহারার অধিকারী এই পাঠান বীর ব্যাপারটাকে তেমন প্রশ্রয় দেননি। নিজেকে বরাবর স্বতন্ত্র করে রেখেছেন। অভিনেত্রী মুনমুন সেন লন্ডনে পড়াশুনো করেছেন কিছুদিন ইমরানের সংগে। সেই সূত্রে কলকাতায় এলে – সে খেলার জন্যই হোক, বা অন্য কোন কারণেই হোক, তিনি মুনমুনের সংগে দেখা করেন। ইমরান সম্পর্কে মুনমুনের বক্তব্য, 'ও আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড।'

একসময় কপিলদেবও মেয়েদের মধ্যমণি হয়ে বসে থাকতেন বিভিন্ন জায়গায়। অবশ্য তখন তিনি সবে পাদ প্রদীপে আসছেন। এই দৃশ্য কলকাতাও দেখেছে। এখন কপিল অনেক পাল্টেছেন। তবে নারীঘটিত ব্যাপারে একজন কিন্তু খুব রিজার্ভ, তিনি আর কেউ নন – স্বয়ং সুনীল মনোহর গাভাসকর। সানির পিছনে মেয়েরা ঘুরঘুর করেনি, এটা হতে পারে না। কিন্তু সুনীল তাদের মোটেই আমল দেননি। □

রবির একদা প্রেমিকা অমৃতা সিং



ফটো : পাহাড়ী রায়চৌধুরী, শংকর নাগ দাস

বিদেশে ভারতীয় ব্যাংকের ব্যবসা বাড়ছে

বিদেশে ভারতীয় ব্যাংকের প্রসার ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী যতটা এগোন দরকার ছিল ততটা হচ্ছে না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই ভারতীয় ব্যাংক বিভিন্ন দেশে শাখা খুলতে আরম্ভ করে। বর্তমানে ২৪টি দেশে ভারতীয় ব্যাংকের মোট শাখা আছে ১৫০টি। রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দেওয়ায় রিজার্ভ ব্যাংক বিদেশে ভারতীয় ব্যাংকের শাখা খোলার ব্যাপারে নিয়ম নীতি অনেক শিথিল করেছে। আশা করা যায় ভারতীয় ব্যাংকগুলি এতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করবে।

সম্প্রতি ভারতীয় ব্যাংকগুলি বিদেশে কিরকম কাজ করছে সে ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাংক একটি সমীক্ষাও করে। তাতে দেখা যায় বিদেশে ভারতীয় ব্যাংকের কাজকর্ম অনেক ভাল। আন্তর্জাতিক বাজারে তারা মোটামুটি একটা জায়গা করে নিয়েছে। ব্যাংকের শাখাগুলি তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পেরেছে। ফলে ডলার বা পাউন্ডের দর ওঠানামার সময় ভারতীয় ব্যাংকের বিদেশি শাখাগুলির যথেষ্ট ভূমিকা থাকছে। এই শাখাগুলি অনাবাসী ভারতীয়দের টাকা যেমন জমা রাখছে তেমনি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেও ঋণ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে কলকারখানা গড়ছেন ব্যাংকের বিদেশি শাখাগুলি তাদের ঋণ দিচ্ছে। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতীয় ব্যাংকগুলির কাজকর্ম আগের থেকে অনেক ভাল।

আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলি এতকাল যেসব ব্যাংকে টাকা রাখত এখন তারা সেখান থেকে টাকার একটি অংশ ভারতীয় ব্যাংকে জমা রাখছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনীতির মাঝখানে ভারতীয় অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার নিজস্ব আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার গড়ে তোলার কথা ভেবেছেন। আরও ভাবা হচ্ছে যাতে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্পে ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে নিয়ে গঠিত সিন্ডিকেট ঋণ দিতে পারে। এ কাজে ইতোমধ্যেই ভারতীয় ব্যাংকগুলি অনেকটা এগিয়ে গেছে।

ভারতীয় ব্যাংকগুলি অনায়াসেই তাদের দক্ষতা নিয়ে বিদেশে আর্থিক বাজারে প্রবেশ করতে পারত। না-পারার কারণ তাদের হাতে পর্যাপ্ত মূলধন নেই। খুব কম মূলধন নিয়েই ভারতীয় ব্যাংকগুলি বিদেশে লগ্নি করছে। ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির মোট কাজের মাত্র ৫ শতাংশ ভারতীয় ব্যাংকগুলি ছিনিয়ে নিতে পেরেছে। ভারতীয় ব্যাংকগুলি মোট মূলধনের এক শতাংশের বেশি লগ্নি করতে পারে না। ব্যতিক্রম স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া। দেশে এবং বিদেশে তাদের শাখা অফিস বেশি বলে তাদের লগ্নির পরিমাণ একটু বেশি।

ভারতীয় ব্যাংকগুলির প্রতি বিদেশের আগ্রহ তুলনামূলকভাবে কম। দেখা গেছে বিদেশে ব্যাংকগুলি যে ধরনের সার্ভিস কাস্টমারদের দিতে পারে, তা পারে না ভারতীয় ব্যাংক। তাই বিদেশে ভারতীয় ব্যাংকের প্রসারের ক্ষেত্রে স্বল্প মূলধনই একমাত্র বাধা নয়। অনুপযুক্ত কাস্টমার্স সার্ভিসও পরিসেবা প্রসারে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে।

তবে ভারতীয় ব্যাংক ভাল বাজার পেয়েছে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে। এই তিনটি জায়গায় ভারতীয় ব্যাংক আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে যদি রিজার্ভ ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সাহায্যের হাত আরও একটু বাড়ায়। কিন্তু শাখার সংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে ব্যাংকগুলির সদর দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা অনেক সময় দায়িত্ব নিতে চান না। কারণ কখনো যদি কোন দেশে সিভিল ওয়ার লাগে বা কোনরকম ক্ষয়ক্ষতি হয় এমন কি টাকা অনাদায়ী পড়ে থাকলে তার দায়-দায়িত্ব সদর দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের ঘাড়ে এসে পড়ে। তাই চাকরি জীবনে কোন ঝুঁকি তাঁরা নিতে চান না। রিজার্ভ ব্যাংকও তখন তাদের দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান।

বিদেশে ভারতীয় ব্যাংকগুলি এখন শেয়ার মার্কেটেও অংশ নিতে চলেছে। ব্যাংকগুলির বিদেশে যাতে তাদের নিজস্ব টাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে তার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিদেশে শিল্প গড়া বা ব্যবসা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উৎসাহ দিচ্ছেন। এর ফলে বিশেষ করে বিড়লা গোষ্ঠী আফ্রিকাতে শিল্প সংস্থা গড়ে তুলছেন। অনুন্নত দেশগুলিতে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ভারত তার বাণিজ্য প্রসারের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ইদানীং ভারতীয় ব্যাংকগুলি বিদেশি ব্যাংকের সংগেও যৌথ প্রচেষ্টায় তাদের কাজ করছে। বিদেশের বহু ব্যাংক ভারতীয় ব্যাংকগুলির এজেন্ট হিসাবেও কাজ করছে।

এখন ইউরোপে এবং আরব দেশগুলিতে ব্যবসার বাজার খুব ভাল। ভারতীয় ব্যাংকের সংগত নজর সেদিকে। তবে বিদেশে শাখা খোলার সময় ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতিও লক্ষ্যণীয়। যেমন এয়ার ইন্ডিয়া যে দেশে যায় সেখানে ভারতীয় ব্যাংকের একটি শাখা অন্তত থাকবেই। ভারতীয় ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধির কথা ভেবেই কেন্দ্রীয় সরকার অনাবাসী ভারতীয়দের এদেশে শিল্প গড়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। অনাবাসী ভারতীয়রা যদি উদ্যোগী হন তাহলে তাঁদের টাকার লেনদেন বিদেশের ভারতীয় ব্যাংকের শাখাগুলির মাধ্যমেই করা সম্ভব।

বিদেশি মুদ্রার সংকট মোচনে বিদেশে ভারতীয় ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন। আশা করা যায় বিদেশে নতুন নতুন শাখা খুলতে পারলে ভারতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ দৃঢ়তর হবে।

বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২৪টি দেশে ১২টি ভারতীয় রাষ্ট্রয়ত্ত ব্যাংকের শ' দেড়েক শাখা কাজ করছে। একথা আগেই বলা হয়েছে। ভারতীয় ব্যাংকের সবচেয়ে বেশি শাখা রয়েছে যুক্তরাজ্যে – ৪২টি। এর মধ্যে ব্যাংক অব বরোদার ১৩টি, ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ১২টি শাখা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা মাত্র ৭। অন্যদিকে ফিজিতে ১১, হংকং-এ ১১, কেনিয়ায় ৯, মরিশাসে ৬, ফ্রান্সে ২, সিংগাপুরে ৫, শ্রীলংকায় ৬, জাপানে ৪, সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে ৭ এবং বাংলাদেশে মাত্র ১টি শাখা রয়েছে।

বিদেশে ভারতীয় যে ব্যাংকগুলি কাজ করছে, তা হল : ব্যাংক অব বরোদা, ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল ব্যাংক, কানাড়া ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্দ ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, সিন্ডিকেট ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, ইউ বি আই প্রভৃতি। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

মেদিনীপুর

ঝাড়গ্রামে অবাধে বন ধ্বংস চলছে, বিপর্যস্ত আদিবাসী সমাজ

এক সময়ে মেদিনীপুরের বননগরী ঝাড়গ্রাম তার প্রাকৃতিক রূপের ডালি সাজিয়ে ভ্রমণপিপাসু মানুষদের করে তুলত মোহিত। শাল-মহুল-দেবদারু আর সোনাঝুরির অলংকার যৌবনবতী ঝাড়গ্রামকে করে তুলেছিল অপরূপা মোহময়ী সুন্দরী।

ভ্রমণপিপাসু'র দল ছুটে আসত কম খরচে, কম সময়ে ঝাড়গ্রামের বনানী রূপকে এক লহমা দেখার জন্য। শীতকালে ঝাড়গ্রামে ভিড় জমত রাজবাড়ির টুরিস্ট লজে, না হলে 'শান্তিনিকেতনে'র শান্তির নীড়গুলিতে বা ভাড়া বাড়িতে। ব্যস্ততম জীবনের কয়েকটা দিন অরণ্যানীর কোলে গড়ে ওঠা এই ছোট্ট শহরের বুকে থেকে অনেকেই উপভোগ করত এর রূপ, রস, গন্ধ।

খুশিতে ঘুরে আসত কাছাকাছি চিল্কীগড়, জঙ্গলমহল, বেলপাহাড়ী, বাঁশপাহাড়ী, লালজল, কাঁকরাঝোড় নতুবা মুকুটমণিপুর। অথচ আজ ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক রূপ অনেকাংশে মলিন, তার যেন সেই ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে গেছে। শাল-মহুয়ার সাজানো গোছানো অলংকার রূপসী ঝাড়গ্রামের দেহ থেকে কে বা কারা যেন চুরি করে নিয়েছে। জনসংখ্যা আর আধুনিক সভ্যতার চাপে ঝাড়গ্রাম যেন জবুথবু। সবুজ বনানীর বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে রুক্ষ প্রান্তর। অবাধে চলছে জঙ্গল ধ্বংস। একটার পর একটা বনভূমি শেষ হয়ে যাচ্ছে। মার খাচ্ছে ঝাড়গ্রামের অর্থনীতি আর আদিবাসী সমাজ।

মেদিনীপুরের বিস্তৃত বনাঞ্চল দুটি ভাগে বিভক্ত – পশ্চিম ও পূর্ব। পশ্চিম মেদিনীপুর বনাঞ্চলের মধ্যে পড়ছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার বিস্তৃত বনাঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গে মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ ১১,৮৭০ বর্গ কিলোমিটার, যার মধ্যে শুধু মেদিনীপুরেই এই বনাঞ্চল ১,৭০৯ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুরে ৮৯৪ বর্গ কিলোমিটার ও পূর্ব মেদিনীপুরে ৮১৫ কিলোমিটার। পশ্চিম মেদিনীপুরের এই বিস্তৃত বনাঞ্চলে ঝাড়গ্রাম ছাড়া বেলদা, মানিকপাড়া, বাঁশপাহাড়ী, বেলপাহাড়ী, নয়াগ্রাম, কাঁদাবিলা, গিধনী, জামবনীর বনাঞ্চল রয়েছে।

মেদিনীপুর জেলায় আদিবাসী লোকসংখ্যা প্রায় ৫,২৮,০৯১ জন। এদের বেশির ভাগ জীবন ধারণের জন্য অরণ্যের উপর নির্ভরশীল। অরণ্যই এদের দেবতা। অরণ্যের শান্ত, ছায়া সুনিবিড় পরিবেশের মধ্যে এদের ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। স্বভাবতই অরণ্যের সঙ্গে এদের নাড়ির সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু বৃটিশ আমল থেকে শুরু হয় বনসংরক্ষণ। তখন থেকেই আদিবাসীদের অধিকার খর্ব হতে শুরু হয়।

অন্যদিকে শুরু হয় বনাঞ্চল ধ্বংস। গত তিন দশকে শুধু পশ্চিমবঙ্গে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়েছে ৩.৩ লক্ষ হেক্টর। অবাধে চলছে বনসম্পদ লুট। যদিও সরকারি আইন অনুযায়ী গত তিন বছর ধরে জঙ্গল নীলাম বন্ধ আছে, তবুও কোন অদৃশ্য শক্তির যাদুমন্ত্রে ক্রমে ক্রমে সবুজ পরিণত হচ্ছে ইঁট, কাঠ, পাথরের রুক্ষ ধূসরে। ঝাড়গ্রাম সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তৃত বনাঞ্চল ক্রমেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। বন-বিভাগ থেকে নতুন বনসৃজনের ব্যবস্থা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই বন হচ্ছে আকাশমণী, ইউক্যালিপটস প্রভৃতি গাছের। নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার থেকে যেমন টাকা আসছে ঠিক তেমনি বিশ্ব ব্যাংকও এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। রাজ্য সরকারের, সমাজভিত্তিক বনসৃজন তৈরির জন্য এখন পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ১২,৫৯,০০০ টাকার মধ্যে ৯,৬২,১০৩.০০ টাকা খরচ হয়েছে শুধু ঝাড়গ্রাম মহকুমার জন্য। মোট ৮২৫ একর জমিতে সামাজিক বনসৃজন হয়েছে। কিন্তু শাল, মহুয়া, গামার, শিশু যে সমস্ত গাছ নষ্ট হচ্ছে বা হয়েছে সেই অনুপাতে এই সমস্ত গাছ লাগান হচ্ছে না। ইউক্যালিপটস বা আকাশমণী সরকার থেকে লাগান হচ্ছে সাধারণত কাগজের কলের জন্য। তাছাড়া এই সমস্ত গাছের বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি হয়, তাই অর্থকরী দিকটাই দেখা হচ্ছে। পাঁচমিশালি গাছ লাগান হচ্ছে না। আর এই সমস্ত গাছ লাগাবার ফলে আদিবাসী সমাজ অনিবার্য কারণেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। কারণ পাঁচমিশালি বনাঞ্চলের গাছ-গাছালিই ছিল এতদিন আদিবাসীদের জীবিকা ধারণের উপায়। আর এখন বনভূমির আশেপাশের জমিতে যে নতুন বনসৃজন হচ্ছে তার সবটাই বাইরে চলে যাচ্ছে। এতে এদের কিছু লাভ হচ্ছে না। শালপাতা বা কেন্দুপাতা তারা পাচ্ছে না। শালগাছের সঙ্গে আদিবাসীদের পূজা, পার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি সমস্ত কিছু জড়িয়ে আছে। কিন্তু ক্রমাগত শালগাছ ধ্বংসের ফলে ব্যাহত হচ্ছে এদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও প্রচলিত সংস্কার। তাই ধূমায়িত ক্ষোভ ক্রমেই জমা হচ্ছে আদিবাসীদের মনে। শালপাতা, আনন্দ অনুষ্ঠানে, কেন্দুপাতা বিড়ির জন্য দরকার হয়। জঙ্গল থেকে আগে শালপাতা, কেন্দুপাতা ছাড়া ধুনো, শালবীজ, মহুয়া প্রভৃতি পাওয়া যেত। এগুলি থেকেই জীবিকা নির্বাহ করত আদিবাসী সমাজ। কিন্তু বর্তমানে শাল জঙ্গল শেষ হয়ে আসায় এই জীবিকা উপার্জনের দিকগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। লোধা আদিবাসীদের অনেককেই বর্তমানে হয় কাঠ কিনে না হয় কয়লা কিনে রান্না করতে হয়।

স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, বনভূমি থেকে কাঠ চুরি করা বা বন ধ্বংস করার জন্য এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সুকৌশলে কাজ করে চলেছে। ঝাড়গ্রাম শহরের জার্মান-লেপ্রসি প্রজেক্টের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, পুরনো ঝাড়গ্রামের পাথরপাড়া গ্রামের পর রাস্তার বাঁপাশের জঙ্গল, রাজ কলেজ সংলগ্ন এলাকার জঙ্গল, কদম কাননপেরিয়ে ফরেস্ট ট্রেনিং সেন্টার সংলগ্ন এলাকার জঙ্গল আজ কল্পনা ছাড়া কিছুই না। যার আকর্ষণে ভ্রমণ পিপাসুর দল এই

ঝাড়গ্রাম শহরের পথে পরিচিত দৃশ্য



ফটো : অরুণ চৌধুরী

বন-নগরীতে আসত সেই শাল ফুলের মাতাল করা গন্ধ, জ্যোৎস্না রাত্রের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, মাদলের দ্রিম দ্রিম বোল আজ কষ্টকল্পনা মাত্র। তাই ভ্রমণার্থী আসে ঠিকই, তুলনায় কম। ফলে মার খাচ্ছে ঝাড়গ্রামের পর্যটন শিল্প। লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পাঁচ মিশালি বনজ সম্পদ। নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক ভারসাম্য। ভূমিক্ষয় কতক জায়গায় মারাত্মক আকার নিচ্ছে। ভূমিক্ষয় রোধে, ঝাড়গ্রাম ডিয়ার পার্কের পূর্বপ্রান্তে বন-বিভাগকে বোল্ডার দিয়ে বাঁধতে হচ্ছে বাঁধ। এখানেও এককালে জঙ্গল ছিল আজ নেই। স্থানীয় কাগজ কলের দুর্গন্ধময় অশোধিত হাইড্রোজেন-সালফাইড পুষ্ট কালো জল জঙ্গল এলাকা সহ বহু চাষের জমিকে করছে ধ্বংস। ঝাড়গ্রাম শহরে ঢোকার মুহূর্তেই তীব্র ঝাঁঝাল এই বিষাক্ত গন্ধকে সংগী করে ঢুকতে হবে। আর বৃষ্টি হয়ে গেলে তো কথাই নেই, এই গন্ধ সারা ঝাড়গ্রাম দাপিয়ে বেড়ায়। এই হল বর্তমান শহর ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিবেশ দূষণ রুখতে ভূমিক্ষয় রোধে বা আর্থিক প্রয়োজনে যে কম করে ৩৩ শতাংশ বনভূমি থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা আজ অনেকের কাছেই মূল্যহীন। তাই তো বন ধ্বংসের সংগে সংগে এখানকার অর্থনৈতিক কাঠামো যেমন ভেঙে তছনছ হচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সৌন্দর্য বিনষ্ট হচ্ছে দ্রুত লয়ে। কিন্তু কেন ধ্বংস হচ্ছে? কিভাবে রক্ষা করা যায় এই বিস্তৃত বনাঞ্চলকে সেটাই আলোচ্য।

পশ্চিম মেদিনীপুর বন বিভাগের ডি এফ ও মির্জা আসগর সুলতানের মতে এ অঞ্চলের আদিবাসীদের অর্থনৈতিক সংকটই মূল কারণ বন ধ্বংসের। তিনি আরও জানান, যারা বন কাটছে, তারা আর্থিক ভাবে অসাধু ব্যবসায়ীদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাই বড় বড় গাছের লগ, জ্বালানি কাঠ এরা বিক্রি করছে সামান্য পয়সার বিনিময়ে। আর এই চুরির ফলেই ঝাড়গ্রামের বিস্তৃত বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। অপর দিকে নীলাম বন্ধ হলেও ট্রানজিট পেপার-এর সাহায্যে চুরি হচ্ছে বনের কাঠ। পুরনো জঙ্গল ধ্বংস হওয়ার পর নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি করতে সময়ও লাগছে। কম সময়ের পরিশ্রমে বেশি পয়সার হাতছানিই দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের গাছ কাটার প্রলোভনে ফেলে। আর এদের চেয়েও মুনাফা লোটে কাঠের অসাধু ব্যবসাদারেরা। তাই তাদেরও পরোক্ষ সহায়তা ও উস্কানি বনভূমি ধ্বংসের অন্যতম কারণ। সামান্য সময়ের পরিশ্রমে দরিদ্র মানুষগুলি ১০ – ১৫ টাকা উপার্জন করে গাছ কাটে। এক একটা শালবল্লী এতদঞ্চলে বিক্রি হয় সাইজ অনুযায়ী ৩০ – ৭০ টাকার মধ্যে। আদিবাসীদের কাছ থেকে কম মূল্যে কিনে এক শ্রেণীর চোরাই চালানদার চড়া দামে তা বিক্রি করে অন্যত্র। জনৈক কাঠ ব্যবসায়ী জানান, নীলামে জ্বালানি কাঠ ৬৫ টাকা প্রতি কুইন্টাল কিনে তারা বিক্রি করেন ৯০ টাকা প্রতি কুইন্টাল। ৫ ইঞ্চি শালবল্লী ৩০ টাকায় কিনে বিক্রি করা হচ্ছে ৪০ – ৪৫ টাকায়।

পশ্চিম মেদিনীপুর বন বিভাগের ডি এফ ও সুলতান সাহেবের মতে বনাঞ্চলের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করে তোলা গেলেই একমাত্র এই ব্যাপক হারে কাঠ চুরি ও বনসম্পদ ধ্বংস রোধ করা সম্ভব। এছাড়া সাধারণ মানুষকে বনজ সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে হবে। সেই সংগে প্রয়োজন বনজ সম্পদ ধ্বংসকারীদের শাস্তি। □

সোমনাথ নন্দী

মালদহ

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তালাচাবি, গণবদলির শিকার চিকিৎসকেরা

মালদহ জেলার মালতীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই সংগে ব্যাপক হারে বদলি করা হয়েছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কয়েকজন বিশিষ্ট ডাক্তারকে। ফলে স্থানীয় অঞ্চলে দেখা দিয়েছে প্রচণ্ড চিকিৎসা সংকট।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আই এম এ) পশ্চিমবংগ হেলথ সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশনের মালদহ শাখার পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, সি পি আই (এম) পরিচালিত হেলথ সার্ভিস ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ও সি পি আই (এম)-এর কো-অর্ডিনেশন কমিটির নির্দেশে শুধুমাত্র বেছে বেছে বিরোধী সমিতিভুক্ত চিকিৎসকদেরই দূর দূরান্তরে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। বদলি করা হয়েছে মালতীপুর হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় জঘন্য আক্রমণে আক্রান্ত চিকিৎসক ডাঃ সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। অথচ আক্রমণকারীদের আজও পর্যন্ত কোন শাস্তি দেওয়া হয়নি।

ঘটনার সূত্রপাত গত ১০ ফেব্রুয়ারি। ঐদিন যুক্ত কমিটির ডাকে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, মালতীপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক হিসেবে ঐদিন ডাঃ সুখেন্দু ব্যানার্জি ধর্মঘটী কর্মীদের হাজিরা খাতায় সই করতে বলেন। কিন্তু এক শ্রেণীর কর্মচারী সই করতে অস্বীকার করেন। ঐ সময় বহিরাগত প্রায় ৬০/৭০জন লোক হাসপাতাল চত্বরে এসে শ্লোগান দিতে থাকে। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতিবাদ করলে তাঁকে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়। এইচ এস এ ও আই এম এ-র স্থানীয় শাখার অভিযোগ, রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের নির্দেশ পালন করতে গিয়েই ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় দুষ্কৃতকারীদের হাতে নিগৃহীত হন।

এদিকে হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর এই জঘন্য আক্রমণে স্থানীয় গ্রামবাসী বিক্ষোভ জানান। ক্ষোভ প্রকাশ করেন জেলার সব শ্রেণীর চিকিৎসকেরাও। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই ঘটনার পর ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশের কাছে এফ আই আর করলেও পুলিশ কাউকে তো গ্রেপ্তার করেইনি উপরন্তু আহত ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর উদ্ধারকারী কিছু রোগী ও স্থানীয় গ্রামবাসীদেরই পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে জোর করে পি আর বণ্ডও সই করিয়ে নেওয়া হয়।

এর পরেই নেমে আসে ডাঃ সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর শাস্তির খড়্গ। মালদহের সি এম ও এইচ এক আদেশবলে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বদলি করে দেন যাত্রাডাঙা নামে এক দুর্গম উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হেলথ ডাইরেক্টরেটে রিপোর্টও পাঠানো হয়। এখানেই শেষ নয়, ১ মার্চ ও ৫ মার্চ '৮৮ তারিখে আরও দুটি আদেশ জারি করে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সি এম ও এইচ বদলি করেন মালদহের সদর হাসপাতালে। এরপর ১৭ মার্চ নতুন এক আদেশে স্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বদলি করেন নদীয়া জেলায়। ১ এপ্রিল ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রিলিজ করে দেওয়ার কথাও এই আদেশে বলা হয়। এর কয়েকদিন পরেই, ২২ মার্চ আরও একটি অর্ডার ইস্যু করা হয়। তাতে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১ এপ্রিলের বদলে ২৪ মার্চ রিলিজ করার কথা বলা হয়। সি এম ও এইচ এই দ্বিতীয় আদেশটি হাতে নিয়ে ২৪ তারিখ ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রিলিজ করে দেন। একই সংগে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয় মালতীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আরও কয়েকজন চিকিৎসককেও – যাঁরা ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদ করেছিলেন। এঁরা হলেন, ডাঃ এস পি বসাক, সেক্রেটারি এইচ এস এ, মালদহ শাখা, ডাঃ বিধান সান্যাল, সুপারিনটেন্ডেন্ট, জেলা হাসপাতাল, মালদহ এবং সার্জন ডাঃ মাবুদ প্রমুখ।

ইতিমধ্যে সি এম ও এইচ আরও এক আদেশবলে মালতীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ২২জন এমার্জেন্সি স্টাফকেও বদলির নির্দেশ দেন এবং ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ করেন। ২৫ মার্চ ৫টি নতুন তালা লাগিয়ে মালতীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদন প্রেসে পাঠানো পর্যন্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ ছিল।

এদিকে মালতীপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্তব্যরত ডাঃ সুখেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর অমানুষিক আক্রমণ ও চিকিৎসকদের গণবদলির আদেশে স্থানীয় চিকিৎসক সমাজে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। চিকিৎসাক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা, চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। এইচ এস এ-র মালদহ শাখা ও আই এম এ-র স্থানীয় শাখা এই ঘটনার প্রতিবাদ করে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাঁদের দাবি কর্তব্যরত ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আক্রমণকারীদের শাস্তি দান ও অবিলম্বে সমস্ত বদলির আদেশ প্রত্যাহার করা। এ ব্যাপারে রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূরকে হস্তক্ষেপ করার জনও অনুরোধ জানানো হয়েছে। □

নিজস্ব প্রতিনিধি

তারাশংকরের জন্মভিটে লাভপুর

সিউড়ি আমোদপুর কীর্ণাহার বাসরুটের চৌহাট্টা গ্রামের পর লাভপুর গ্রামের বাসস্টপ। আঁকাবাঁকা পিচ রাস্তার ধার দিয়ে গেছে আমোদপুর কাটোয়া ছোট রেল লাইন। লাল কাঁকর মাটির উঁচু-নিচু জমিগুলো বৈশাখের খরতাপে খাঁ খাঁ করছে। দূর থেকে লাভপুর গ্রামকে দেখে মনে হবে হাঁসুলির বাঁকের মত। বোলপুর থেকে কীর্ণাহার হয়ে বাসে লাভপুরে আসা যায়। গ্রামে তিনটি বাস স্টপ। গরুর হাট, ব্লক অফিস আর রেল স্টেশন। রেল স্টেশনের বাস স্টপে নেমে ছোট রেল লাইন পেরিয়ে উত্তর মুখো গাঁয়ের পথ ধরে কিছুটা গেলেই চোখে পড়বে প্রয়াত কথা সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই 'ধাত্রী দেবতা' রেস্ট হাউসটি। রাস্তাটির নাম রাখা হয়েছে তারাশংকর রোড। এই বাড়িটির পেছনে আছে বহু পুরনো একটি টেরাকোটার মন্দির। রেস্ট হাউসটি আগে ছিল তারাশংকরবাবুদের কাছারি বাড়ি। ১৩৬৮ সালের ৮ শ্রাবণ এই বাড়িটিকে সংস্কার করে ছোট বাংলোর মত করে তৈরি করিয়েছিলেন তারাশংকরবাবু। ইটের দেওয়াল ও খড়ের চালের বাড়ি। সামনে সাজানো বাগান, কিছু গাছপালা। বর্তমানে বাগানটি শুকিয়ে গেছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন তাঁদের থাকে রমরমা, নামডাক। মৃত্যুর পর অনেকের অবস্থাই হয়ে পড়ে ঝরা পাতার মত। কিছু দিন পরে পাতাগুলি শুকিয়ে দূর আকাশে উড়ে চলে যায়। কেউ আর তাদের মনে রাখে না। অনেকের ক্ষেত্রেই জন্ম বা মৃত্যুবার্ষিকী পালনই করা হয় না। যদিও বা কারো কারো ক্ষেত্রে হয়, তাও আবার নমো নমো করে।

'ধাত্রী দেবতা'র সামনের গলি পথে ঢুকেই তারাশংকরবাবুদের পৈতৃক বাড়ি। তিনদিকে মাটির বাড়ি খড়ের চাল। আর একদিকে একটি দোতলাপাকা বাড়ি। তারাশংকরবাবুর পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। তাঁরা তিনভাই ও এক বোন। তারাশংকর, দুর্গাশংকর, কমলাবালা ও পার্বতীশংকর। তারাশংকরবাবুদের কিছু জমিদারি ছিল। লাভপুর গ্রামে বেশ কয়েকজন জমিদারের বসবাস ছিল। জমিদারবাবুদের বড় বড় পাকা বাড়ি, শিবমন্দির, দুর্গামন্দির, টেরাকোটার মন্দিরসহ আছে অট্টহাস দেবী ফুল্লরা মায়ের মন্দির।

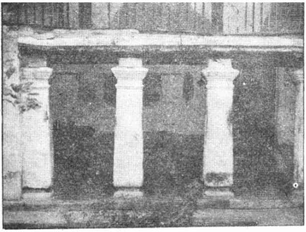
২৫ এপ্রিল সকালের দিকে যখন তারাশংকরবাবুদের পৈতৃক বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম তখন তাঁর ছোট ভাই পার্বতীশংকরবাবু পোস্টঅফিসে গিয়েছিলেন। তাঁর দেখা পেলাম লাভপুর থানার বিদায়ী বড়বাবুর কোয়ার্টারে।

৮২ বছরের বৃদ্ধ। ছোটখাটো মানুষ। মাঝারি স্বাস্থ্য, শুভ্রকেশ। একগাল সাদা দাড়ি। পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়ে গেঞ্জি। হাতের ছাতাটি চেয়ারের পাশে রাখা। এখনও এই বয়সেও বেশ চলাফেরা করতে পারেন। আগে কংগ্রেস সংগঠনের সংগে জড়িত ছিলেন। একজন সমাজসেবী। পার্বতীবাবুকে বললাম, 'আপনার কাছে এসেছি তারাশংকরবাবুর জীবনের কিছু কথা জানতে।'

একদিকে দেবী ফুল্লরা মায়ের পীঠস্থান আর একদিকে তারাশংকরবাবুর সাহিত্য সাধনার পীঠভূমি হল এই লাভপুর।

তিনি বললেন, 'তারাশংকরবাবুর জন্ম হল বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ শ্রাবণ। তাঁর ন'বছর বয়সের সময় আমাদের পিতৃবিয়োগ হয়। তাঁর যখন ষোল বছর বয়স তখন লাভপুর গ্রামেরই মেয়ে এগার বছর বয়সের উমাশশী দেবীর সংগে বিবাহ হয়। গ্রামের যাদবলাল হাইস্কুল থেকে পড়াশোনার পর ইংরেজি ১৯১৭ সালে বহরমপুর সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। কলেজে পড়াশুনা করার সময় তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলের সংগে জড়িয়ে পড়েন এবং গ্রেফতার হন। পরে দু'বছর গৃহে নজরবন্দী হয়ে থাকেন। ফলে তিনি আই এ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন কিন্তু পাস করতে পারেননি।'

পার্বতীবাবু বললেন, 'তাঁর প্রথম বই হল কবিতার। নাম 'ত্রিপত্র'। ১৯৩০ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হয়ে কারাবরণ করেন এবং জেলে থাকাকালীন 'পাষাণপুরী' লেখেন। ১৯৩১ সালে কারামুক্ত হন। তারপরে বৃটিশ পুলিশের অত্যাচারে গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় চলে যান। এরপর বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে থেকে সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। লাভপুরের পটভূমিতে তাঁর লেখা বহু বই-এর মধ্যে আরোগ্যনিকেতন কালিন্দী, গণদেবতা, ধাত্রীদেবতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি প্রথম বরাহনগরে বাড়ি করেন। পরে সেই বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টালাপার্কে বাড়ি করেন। তাঁর দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে সনৎকুমার সাহিত্যচর্চা করতেন। সরিৎকুমার ইঞ্জিনিয়ার। তারাশংকরবাবু রাজ্যসভার সদস্য হয়ে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তাসখন্দে গিয়েছিলেন। পরে তিনি চীনও ভ্রমণ করে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় বাংলা ১৩৭৮ সালের ২৮ ভাদ্র।



ফটো : সুবাস চক্রবর্তী

তারাশংকরের পৈতৃক বাড়ি ও জন্মস্থান

একটু থেমে পার্বতীবাবু বললেন, 'কী হবে এসব লিখে? কেউ কি আর সাহিত্যিকদের মৃত্যুর পর দাম দেয়?'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'তারাশংকরবাবুর স্মৃতিরক্ষার্থে এই গ্রামে কি কিছু করা হয়েছে?'

তিনি বললেন, 'তাঁর নামে একটি রাস্তার নাম রাখা হয়েছে। আর ফুল্লরা মায়ের মন্দিরের কাছাকাছি 'সন্দীপন পাঠশালা' নামে একটি প্রাইমারি স্কুল খোলা হয়েছে।'

বললাম, 'চলুন, এবার আপনাদের বাড়িতে যাই। যেখানে তারাশংকরবাবুর জন্ম হয়েছিল, সেই বাড়িটির একটি ছবি তুলব।'

তিনি আমাকে সংগে নিয়ে বাড়িতে গেলেন। তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রী তখন রান্না করছিলেন। এই বাড়িতে শুধু স্বামী-স্ত্রী দুজনেই থাকেন। সারা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। তাঁর পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেরা শিক্ষিত এবং বাইরে কর্মরত। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মেজো ছেলে পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায় চলচ্চিত্র পরিচালক। পুজো পার্বণে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে আসেন। তিনি কোঠাবাড়ির নিচের একটি ঘর দেখিয়ে বললেন, এই ঘরে তারাশংকরবাবুর জন্ম হয়েছিল। তারপর তিনি বারবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'ইংরেজ সরকার আমাদের বোলপুরের ফুল্লরা প্রেসটি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু আর ফেরৎ দেয়নি, আজও পর্যন্ত পাইনি।'

আবার মে মাসের ৩ তারিখে দেখা হয়েছিল। তখন ভাবিনি পার্বতীশংকরবাবু ২১ মে চলে যাবেন। জেলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পড়ে বারবার মনে হল, গণদেবতার গ্রামে ৮২ বছরের এক সমাজসেবী কালিন্দীর কালো জলে ভেসে গেছে। □

রবীন্দ্রনাথ কবিরাজ

পোলো বল তৈরির শিল্পীদের সংকট

'সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। কে খেলবে পোলো? বায়বহুল এ খেলার মেজাজ থাকা চাই।' কথাগুলি অত্যন্ত আক্ষেপের সংগে বললেন জনৈক পোলো বলের শিল্পী। বহুকাল থেকেই ভারতে পোলো খেলার প্রচলন। মোগল-পাঠান এবং ইংরেজ রাজত্বেও পোলো খেলার বেশ রেওয়াজ ছিল। বর্তমান ভারতে এই খেলা লুপ্তপ্রায়। গোঁটে গোনা কয়েকটা পোলো ক্লাবই এই খেলাটিকে টিকিয়ে রেখেছে। খেলার ব্যাপ্তি না থাকায় শিল্পীরাও আজ নানা সংকটের সম্মুখীন।

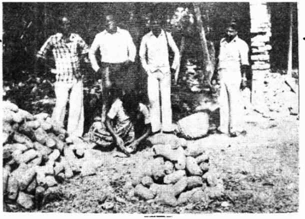
ভারতের মধ্যে হাওড়া জেলার দেউলপুরেই একমাত্র পোলো বল তৈরি হয় বাঁশের মুড়ো থেকে। এ

জাতীয় জাওয়া বাঁশ অন্যত্র প্রায় দুর্লভ। এই বাঁশের গোড়া থেকেই শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব শিল্প মাধুরী দিয়ে তৈরি করছেন গোলাকৃতি পোলো বল। বলের ফিনিশিং দেখলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। শিল্পীর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা আর নৈপুণ্যের ফলেই এ জাতীয় বল তৈরি করা সম্ভব। কেবলমাত্র বাটালি আর হাতুড়িই এই শিল্পকর্মের একমাত্র বাহন। এর সাহায্যেই শিল্পীরা তৈরি করছেন পোলো বল। বলের পরিধি দশ ইঞ্চি। ওজন ৮৫ থেকে ১৪০ গ্রামের মধ্যে। সাধারণত ১১০ গ্রাম ওজনের বলই খেলোয়াড়রা বেশি পছন্দ করেন।

বর্তমান শিল্পীদের চার পুরুষ আগে থেকেই এখানে পোলো বল তৈরি হচ্ছে। এই বল বিদেশে রপ্তানি করে সরকার বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে। বলের স্টিকগুলি আসে আসাম থেকে। স্টিকগুলি বেঁধে ফিনিশিং-এর কাজ এই শিল্পীরাই করেন। তারপর এই বল ও স্টিক বাইরে রপ্তানি হয়। ছোট-বড় মেয়ে পুরুষ সকলেই এই শিল্পকাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত।

পোলো খেলা মূলত ঘোড়ার ওপর বসে একহাতে স্টিক দিয়ে বলটাকে দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিপক্ষের গোলে আক্রমণ করা। খেলার সময় এক ঘণ্টা। প্রত্যেক সাইডে চারজন করে মোট আটজন খেলোয়াড় যোগ দেন। এই খেলা খানিকটা হকি খেলার মতই। বর্তমানে সাইকেল পোলো খেলার প্রচলন হয়েছে। অর্থাৎ সাইকেলের ওপর বসে একহাতে স্টিক দিয়ে এই খেলা চালু হয়েছে। সাইকেল পোলোর স্টিকগুলো একটু ছোট হয়। বলটার ওজনও একটু কম থাকে। হর্স পোলোটাই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় খেলা।

হাওড়া জেলার পাঁচলা ব্লকের অধীন এই দেউলপুর গ্রাম। আমতা হাওড়া বাসে ধূলাগুড়ি নেমে ৬৯ নম্বর বাসে এখানে আসতে হয়। হাওড়া থেকে সরাসরি ৬৯ নম্বর বাসেও এখানে আসার সুবিধে আছে। গাছ গাছালিময়, কোলাহলহীন, পরিচ্ছন্ন অথচ ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম। রাস্তাগুলিও নতুন রূপ পেয়ে যেন পথিকদের গ্রামে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে। এই গ্রামেই কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করার জন্য এক বৈশাখের দুপুরে হাজির হলাম। এই প্রতিবেদকের সঙ্গে ছিলেন ব্লকের শিল্প-উন্নয়ন আধিকারিক সেখ



ছবি : লেখক

দেউলপুর গ্রামে পোলো বলের কয়েকজন শিল্পী

সিরাজউদ্দিন এবং আর এল আই সেন্টারের সাব অ্যাসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। দেখলাম এই ভর দুপুরেও শিল্পীদের কাজের বিরাম নেই। হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে শিল্পীরা বাঁশের গোড়া কেটে কেটে বল তৈরি করে চলেছেন।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ বাগ। বয়স চল্লিশের ওপর। রবীনবাবুরা চার পুরুষ ধরে এই কাজ করে আসছেন। বর্তমানে উনি একটি ছোটখাটো ইউনিটের মালিক। দুই তিনজন কর্মচারী আছেন তাঁর ইউনিটে। শিল্পীরা এই শিল্পের কাঁচামাল অর্থাৎ বাঁশের গোড়া প্রতিটি ৭০ পয়সা দরে কেনেন। প্রতি গোড়াতে দুটি বল হয়। এই গোড়াকে বলের আদলে আনতে মজুরি বাবদ খরচ পড়ে ৯০ পয়সা। ফিনিশিংধরে প্রতি বলে খরচ পড়ে ১ টাকা ৮০ পয়সা। বিক্রি হয় ২ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ২ টাকা ৮০ পয়সায়। একজন মানুষ ৭-৮ ঘণ্টা কাজ করে দিনে ২৫টি পর্যন্ত বল তৈরি করতে পারেন। এই আনফিনিশড বলের প্রতিটির মজুরি বাবদ কর্মীদের ৫০ পয়সা করে দিতে হয়। অর্থাৎ একজন কর্মী দিনে ১০-১২ টাকা রোজগার করতে পারেন।

এই শিল্পের বর্তমান দুরবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রবীনবাবু জানালেন, পোলো বলের বাজারের অভাবে শিল্পীরা মার খাচ্ছেন। কয়েক বছর আগেও রবীনবাবুর ইউনিট থেকে প্রায় এক লক্ষ বল রপ্তানি হত। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। শীতকালেই এই খেলা হয়। ফলে বছরের ৬ মাস বেচাকেনা হয় আর বাকি ৬ মাস শিল্পীদের বেকার বসে থাকতে হয়। বিদেশ থেকে যেমন আমেরিকা হংকংপ্রভৃতি জায়গা থেকে পোলো বলের বরাত পেলে শিল্পীদের কাজে সাড়া পড়ে যায়। এই সময়ে শিল্পীরা দুটো পয়সার মুখ দেখেন। অধিকাংশ শিল্পীই পুঁজির অভাবে কাঁচামাল অর্থাৎ বাঁশের মুড়ো সংগ্রহ করতে পারেন না। এজন্য তাঁদের চড়া সুদে ঋণ নিয়ে কাঁচামাল কিনতে হয়। ফলে তাঁদের লাভের মোট অংশ সুদ গুনতেই চলে যায়।

শিল্পীদের ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই। যাঁদের নিজস্ব কোন ইউনিট নেই, অপরের ইউনিটেই তাঁদের কাজ করতে হয়। যেদিন কাজ থাকে না সেদিন পয়সাও জোটে না। ফলে সময়ে সময়ে তাঁদের অর্ধাহার বা অনাহারেও থাকতে হয়।

ব্লকের বি ডি ও ইন্দ্রজিৎ মজুমদার এবং শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক সিরাজউদ্দিন সাহেব জানালেন, এই শিল্পকাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩৫টি পরিবার নিযুক্ত। আর্থিক সংকট এই শিল্পের অগ্রগ
প্রধান বাধা। বলের চাহিদা
পাওয়াও এই শিল্প প্রসা
প্রতিবন্ধক। এইসব নানা কা
কয়েকটি পরিবারের কাজ
বন্ধই হয়ে পড়েছিল। বর্ত
স্পেশাল কম্পোনেন্ট স্কিমে
কিছু পরিবারকে আর্থিক সা
দেওয়া হয়েছে বলে বি ডি ও সা
জানালেন। এই পরিবারের মানু
মুখ্যত বাঁশের গোড়া সরব
করেন। পোলো বলের বাজার
থাকায় ব্যাংকও এই শিল্পে ট
বিনিয়োগ করতে ঝুঁকি নিতে চায়
সমবায় সমিতি করার
কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছিল কি
তা ফলপ্রসূ হয়নি।

পোলো খেলাকে জনপ্রিয় কর
হলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে
দরকার। এই খেলার প্রতি মানু
যাতে আকর্ষণ বাড়ে সেজন্য
ট্রেডিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে
শিল্পের বহুল প্রচার প্রয়োজ
প্রচারের একটি মাধ্যম
বিজ্ঞাপন। এই শিল্পকে বাঁচ
হলে সরকারিভাবে বিজ্ঞাপ
ব্যবস্থা করতে হবে। □

স্বপনকুমার ঘো

হাইতির ক্ষেত্রে আমেরিকার ভিন্ন নীতি

"এর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নেই, তবে দুর্ভাগ্যবসত তোমরা মুক্তির স্বাদ পেতে বড়ই হুটোপুটি করছ।'

এটা একটা কার্টুনের ক্যাপসন। কার্টুনটা হল – হাইতি শরণার্থী বোঝাই একটি ছোট নৌকার নজরদারিতে ব্যস্ত একটি মার্কিন জাহাজ। এ থেকেই স্পষ্ট যে, মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ কিউবার শরণার্থীদের তুলনায় হাইতির শরণার্থীদের প্রতি কী ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করছে।

অবশ্য এর সংগে দুটি প্রশ্ন জড়িত। একটি হল পরিচয়, দ্বিতীয় হল, মতাদর্শ বা রাজনীতি। হাইতিরা প্রায় সবাই কৃষ্ণকায়। অপর দিকে কিউবানরা তেমনি বেশির ভাগ শ্বেতকায়। আর দুভালিয়েরের হাইতিকে মনে করা হয় বন্ধুরাষ্ট্র। কিউবার শরণার্থীরা 'মুক্তিযোদ্ধা', তাই তাঁদের জন্য রয়েছে সাদর আমন্ত্রণ। আর হাইতিবাসীরা হল বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী। সুতরাং তাঁদের এড়িয়ে চলাই বিধেয়।

১৭৭৬ সালে আমেরিকান বিপ্লবের পরে নতুন বিশ্বে হাইতিই প্রথম ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ফরাসি উপনিবেশবাদের জায়গায় এল মার্কিন নয়া-উপনিবেশবাদ। জঙ্গি দল ১৮২৩-এর 'মনরো হুকুমনামা' এবং ১৯০৪-এর 'রুজভেল্ট দাওয়াই' অনুসারে বিদ্রোহ দমন ও পরিবর্তন ঠেকাতে 'ডান্ডা' পদ্ধতি কার্যকর হল। মার্কিন নৌবাহিনীর একজন প্রাক্তন কম্যান্ডার স্মেডলি বাটলার মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'স্বদেশের জন্য পয়সা-কড়ি সংগ্রহে ন্যাশনাল সিটি ব্যাংকের কর্মীদের সুবিধার্থে আমি হাইতি ও কিউবাকে চমৎকার করে সাজাতে সাহায্য করেছি।'

১৯১৫ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত হাইতি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। ১৯৫৭-তে স্বৈরতন্ত্রী নৌ-সেনাদের শাসনের জায়গায় এল ফ্রাংকো দুভালিয়ারের বংশানুক্রমিক ফ্যাসিবাদী শাসন। তাঁর ডলার কূটনীতি হাইতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করল। একসময় তো 'অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস' (ও এ এস)-এর সভায় হাইতির গুরুত্বপূর্ণ ভোট সস্তায় কেনা হয়েছিল একটি বিমান বন্দরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ফ্রাংকো (পাপা ডক) দুভালিয়ার ও তাঁর ছেলে জিন-ক্লদ (বেবি ডক) হাইতিদের পঁচিশ বছরের বেশি ক্রীতদাস করে রেখেছিল। আর দেশটাকে রেখেছিল বিদেশি পুঁজির বিচরণক্ষেত্র হিসেবে।

সত্তরের দশকের শেষ পর্বে ডমিনিক্যান প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক সরকার 'কমিউনিস্ট হুমকি মোকাবিলায় সহযোগিতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। আর হাইতির বিপ্লবী শক্তিগুলির হাতে আক্রান্ত হওয়ায় দুভালিয়ার একনায়কতন্ত্রকে ডমিনিকান সন্ত্রাসবাহিনীর সাহায্যের জন্যও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮২-তে যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী এটর্নি জেনারেল রুডলফ ডবল্ গিলিয়ানি বলেছিলেন, হাইতিতে কোনও নিপীড়ন নেই ও পলাতকদের দুভালিয়ার রাজত্বকে ভয় করার কোন কারণ নেই।

১৯৮৫-র ৭ ফেব্রুয়ারি দুভালিয়ার রাজত্বের অবসান ঘটলেও অবস্থার কোন বদল হয়নি। বেবি ডক দেশ ছেড়ে পালালেও শাসনব্যবস্থা আগের মতই রয়েছে। নতুন ২৯ সদস্য বিশিষ্ট অস্থায়ী ন্যাশনাল গভর্নিং কাউন্সিলে দুভালিয়ার পন্থীদেরই আধিপত্য। জবরদস্ত অভ্যন্তরীণ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডঃ রজার লাকোঁতান-এর ভাষ্য অনুযায়ী 'হাইতি দুভালিয়ারের আর দুভালিয়ারই হাইতি।'

মন্ত্রীসভার ২৯ জনের মধ্যে মাত্র চারজন উদারপন্থী। এঁদের মধ্যে একজন তো বলেছেন যে সরকারে থেকে সম্ভাব্য মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ ঠেকাতে তাঁরা আপ্রাণ করেছেন।

তবে প্রথম গুরুতর বিরোধ ঘটল নতুন সংবিধান নিয়ে। এই সংবিধানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সংস্থান রয়েছে। ওই পরিবর্তনগুলি হল সরকারি প্রশাসনে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়তার বদল। দুভালিয়ারদের বংশানুক্রমিক শাসনের অবসান, পুলিশকে সেনা নিয়ন্ত্রণ থেকে পৃথক করে স্থানীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে আনা। মৃত্যুদন্ড এবং কমিউনিজম দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করার বিধান বিলোপ।

গত বছর ২৯ নভেম্বরের নির্বাচনের আগে পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে, বামঘেষা মধ্যপন্থী গোষ্ঠী, ন্যাশনাল টুগেদারনেস ফ্রন্ট (এন টি এফ) জয়ী হবে। ওয়াশিংটন তাদের তাঁবেদার মার্ক বাজিনকে সাধারণ মানুষ দূরে ঠেলে দেওয়ায় খুবই অখুশি হয়ে পড়ে এবং দুভালিয়ার পন্থীদের মাঠে নামবার সংকেত দেয়। নির্বাচনের দিন 'টন টন মাকউটস' (গুপ্ত পুলিশ) ও সৈন্যদের হাতে ৩৬জন নিহত হন এবং তার ফলে নির্বাচন বাতিল হয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হল, হাইতি ও ডমিনিক্যান প্রজাতন্ত্রের নির্বাচনের প্রশ্নে ওয়াশিংটনের দু ধরনের প্রতিক্রিয়া। ডমিনিক্যান প্রজাতন্ত্রে ১৯৭৮-এর মে মাসের নির্বাচনে, বিপ্লবী গণতন্ত্রী আন্তনিও গুজম্যানের জয়লাভের সম্ভাবনা নিশ্চিত হবার সংগে সংগে সেনাবাহিনী ভোট গণনা বন্ধ করে দেয়। প্রেসিডেন্ট কার্টার ফরমান জারি করেন, ভোট গণনা চালু না হলে সবরকম মার্কিন সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। ভোট গণনা আবার শুরু হল এবং গুজম্যান জয়ী হলেন।

হাইতির নির্বাচনে তেমন কিছু দেখা গেল না। হোয়াইট হাউস বা বিদেশি দপ্তর থেকে কোন ফরমান এল না। হাইতির গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ১৭ জানুয়ারির সি এন জি নিয়ন্ত্রিত সংস্থা পরিচালিত নির্বাচন বাতিল। ওই নির্বাচনে গঠিত সরকারকে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং সাহায্য বন্ধ রাখার দাবি সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতিই পাওয়া গেল না।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের নেতারা ওয়াশিংটন নেতৃত্বের চিরায়ত অনুগামী। এর কারণ হল, তাঁদের অধিকাংশই ক্যারিবিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নে (সি ডি ইউ) রয়েছেন। এটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার ও পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোল-এর ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের আঞ্চলিক শাখা সংস্থা। সি ডি ইউ-র প্রধান পান্ডারা হলেন, ডোমিনিকার প্রধানমন্ত্রী ইউগেনিয়া চার্লস, জামাইকার এডোয়ার্ড সিগা। সেন্ট লুসিয়ার জন কম্পটন এবং সেন্ট ভিনসেন্ট-এর জেমস মিচেল।

রেগন প্রশাসন সেগার মাধ্যমে দুভালিয়ার শাসনের সংগে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেয়। ১৯৮১-র ফেব্রুয়ারিতে, জামাইকায় প্রধানমন্ত্রী হবার অব্যাবহিত পরেই সেগা তাঁর বিদেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নেভিলে গ্যালিমোরকে হাইতিতে পাঠান। বেবি ডক তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং হাইতি ও জামাইকাকে কেন্দ্র করে শান্তির মরুদ্যান হিসাবে একটি মৈত্রী বন্ধনের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

কিন্তু পুরনো অভ্যাস ছাড়া যায় না। অতীতে ঠান্ডা যুদ্ধ ও কমিউনিস্ট বিরোধিতার জিগির তুলে মার্কসবাদী, বিপ্লবী ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পরিচালিত জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। আমি নিজেও তেমনি এক সরকারের প্রধান ছিলাম। অন্যরা হলেন, জ্যাকস আরবেঞ্জ, জুয়ান বসক, সালভাদর আলেন্দে এবং মাইকেল ম্যানলে প্রমুখ। এখন সোভিয়েত মার্কিন সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এমনকি বাম ঘেঁষা মধ্যপন্থী সেরার্ড গরস্তৃকেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্যারাবিয়ান নীতি সহ্য করতে নারাজ। □

ছেদি জগন

(পি টি আই ফিচার)

'উলঙগ করে ঝুলিয়ে চলল প্রহার, তারপর আর মনে নেই'

না দমদম সেন্ট্রাল জেল পালানো বন্দীদের কেউ নন অমর ভট্টাচার্য। পুলিশ যতই তাঁকে দমদম জেল পালানো-দের দলে ফেলুক না কেন। এটা প্রমাণিত যে অমর ভট্টাচার্য পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন দমদম জেল ভাঙার ঘটনার অনেক আগে। তাঁকে ধরার পেছনে ছিলেন কুখ্যাত পুলিশ অফিসার রজত মজুমদার। জেলে তাঁকে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। বাম জমানায় একজন বিচারাধীন বন্দীর ওপর এই ধরনের নির্যাতন কংগ্রেসি জমানার সেই নির্যাতনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। অমর ভট্টাচার্য সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। জেলে থাকাকালীন কয়েকটি ডায়রির পাতায় তিনি লিখে রেখেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। সেই ডায়রিই সংগ্রহ করে এনেছেন আমাদের প্রতিনিধি দুর্বার গঙ্গোপাধ্যায়।

ঠিক দিনপঞ্জী বলতে যা বোঝায় তা লেখার অভ্যাস আমার কোন কালেই নেই। এ বছর আমি জেলে বন্দী। রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পুলিশ আমাকে গত বছর ২৭ অক্টোবর হুগলির গুপ্তিপাড়া খেয়াঘাট থেকে গ্রেপ্তার করে। দলেরই কোন বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এটা সম্ভব হয়েছিল। এখন আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের তিন নম্বর সেলের বাসিন্দা। লক্ষ্য করছি বাইরে থাকতে যে আবেগ অনেক ফিকে থাকে জেলের ভিতরে তা অনেক গাঢ় হয়। এখানে আমার অঢেল সময় শুধু বই পড়ে কাটাই আর হঠাৎ হঠাৎ কিছু লেখার চেষ্টা করি। সেই স্বপ্ন সেই অনুভূতির বেদনা ও আনন্দ নিয়ে আমার বন্দী জীবনের অখণ্ড সময়কে আমি সাজিয়েছি।

সেটা ছিল গত অক্টোবরের বিকেল। প্রায় ৫-৩৫ মিনিট আন্দাজ খেয়াঘাট থেকে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপার রজত মজুমদারের নেতৃত্বে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাথে অবশ্য ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের দু'জন ইনসপেক্টরও ছিলেন। গ্রেপ্তার করে আমাকে সোজা টালিগঞ্জ রিট্রিট হাউস লক-আপে এনে রাখা হল। বাড়িটা দোতলা, সামনে জাল দেওয়া – লোহার গেট। ভেতরে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে। এরই সিঁড়ির নিচে একটা লক-আপ। আর ঠিক তার উল্টোদিকে আর একটা ঘর। সিঁড়ির নিচের ঘরটাতেই আমায় রাখা হল। ঘরের মেঝেতে দুটো কম্বল পাতা আছে। আমি তাতে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজলাম। কি আশ্চর্য! আমি যে এখন বন্দী এই বিশেষ অনুভূতিটাই মাঝে মাঝে থাকছে না। আমার সাথে একই সেলে নাজিমা খাতুন মাম'লায় গ্রেপ্তার হওয়া একজন কৃষকও ছিলেন। সি আই ডি ইনসপেক্টর আমাকে লক-আপে পুরে দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। অবশ্য রাতের খাবার ব্যবস্থাও করে দিয়ে গেছিলেন। শেষ রাতে এল। দীর্ঘ বিনিদ্র রজনী। চিন্তার অক্টোপাশ আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল। চিন্তা আর ক্রমাগত মশার কামড়ে ঘুম পালিয়ে ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল মাওসেতুঙের সেই বিখ্যাত উক্তি: 'এক ঝাঁক গুলি, বধ্যভূমি আর জেলখানা হচ্ছে বিপ্লবীদের পরীক্ষা ক্ষেত্র।'

সেন্ট্রাল দেওয়ালে অজস্র নাম ঠিকানা ও বিভিন্ন কথা লেখা হঠাৎ এক জায়গায় চোখ থমকে গেল। আরে এ কি লেখা: 'ফাঁকো ফাঁকো' এই দেহ চলি যাবো কাঁহরে'। এযে একেবারে ঘুরিয়ে গীতার দর্শন। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোহ পরানি।' হয়তো কোন বন্দী প্রচণ্ড মার খেয়ে এ জীবন কিছুই না এই চরম ও পরম উপলব্ধিতে এসে এই কথা লিখেছিল। শুনেছি দুঃখের সময় নাকি শেষ হতে চায় না। আমার কিন্তু রাত্রিকে আজ বেশ ভালই লাগছে। সময় তো মহাকাল, ইতিহাস,-তাকে কি আর আমি মাপতে পারবো। শুধু আমার সত্তা ও চেতনা যে সময়টুকুর সাক্ষী রইলো আমি তারি কথা বলছি। এখানকার প্রহরায় আছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ান দু'ঘণ্টা অন্তর তাদের ডিউটি পরিবর্তন হচ্ছে তা থেকেই বুঝছি রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে।

ভোর হয়ে গেল অর্থাৎ ২৮ অক্টোবর প্রত্যুষ ছোঁয়া দিল আমার জীবনে। ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাইরের রক্ষীদের কথাবার্তায় ঘুম ভাঙল। লক-আপ খুলে দুজন সশস্ত্র পুলিশ, একজন হোমগার্ড ও একজন ওয়াচারের তত্ত্বাবধানে বন্দীদের প্রাতাহিক কর্মের জন্য বার করা হল। অবশ্যই হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে। আমাকেও সেইভাবে বার করা হল। একটু পরেই আবার চালান হয়ে গেলাম লক-আপে। ঢুকে চা আর বিস্কুট খেয়ে একটু চাংগা হলাম। এখন হাতে আর কোন কাজ নেই শুধুই প্রতীক্ষার পালা। অবশেষে ডাক এলো বেলা দশটা নাগাদ। লক-আপ খুলে একজন সি আই ডি কনস্টেবল ও একজন সশস্ত্র পুলিশ আমাকে হাতকড়া পরাল। আমার গন্তব্য স্থল ওপরের ঘর। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। দোতলায় সিঁড়ির ডান দিকে পরপর কটা ঘর। আর ঠিক সিঁড়ির শেষ প্রান্তে মুখোমুখি একটা ঘর। এই ঘরটার দরজায় একটা কাগজে লেখা নকশাল সেল। আমি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকলাম। ঘরটাতে তিনটে বড় বড় টেবিল ও ছ'খানা চেয়ার। শেষ প্রান্তে দু'খানা বইয়ের আলমারিতে গাদা গাদা বাজেয়াপ্ত নকশালী বই-পুস্তিকা। আমাকে শেষ প্রান্তের টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বসতে বলা হল। এখন আমার পাশে ও মুখোমুখি কয়েকজন সি আই ডি অফিসার। এদের মধ্যে একজন নকশাল সেলের ও সি। আমাকে যথেষ্ট ভদ্রতা দেখিয়েই তিনি জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। প্রথমত, আমার রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসকে নিয়েই প্রশ্নের সূত্রপাত। তারপর নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশ্ন। ইতিমধ্যে আই বি থেকেও অফিসাররা এসে গেছেন এবার তাঁদের পালা। এইভাবে সন্ধ্যে হয়ে এল। এমন সময় পাশের ঘরে আমার ফোন এল। ফোন করছেন স্পেশাল সুপার রজত মজুমদার। উনি আমাকে এস এল আর ওয়াকি টকি পিস্তল জাতীয় ভয়ানক ভয়ানক কিছু আগ্নেয়াস্ত্রের নাম করে বললেন আমি যেন তা পুলিশকে দিয়ে দিই। কি সর্বনাশ! আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি। এসব কোথা থেকে পাবো। উনি আমাকে ফোন ছেড়ে দিতে বললেন এবং নকশাল সেলের ও সি-কে ফোনে কিছু নির্দেশ দিলেন। ফোন রেখে অফিসার আমায় বললেন – চলুন আপনাকে মারতে হবে।'

আমি আগের ঘরে ফিরে এলাম। আমার সামনেই এবার দু-তিনজন মিলে একটা মোটা দড়ি, পুরু লোহার রড আর বেতের লাঠি নিয়ে এল। একটা জিনিস কিন্তু এখানে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় তথাকথিত ভালবাসা মানবিক সম্পর্কের অসাড়তা। মাও-সে-তুঙের 'Love has been divided into classes' কথাটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। তাই আমি এক অপরিচিত যুবক যার সাথে এদের কোন ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই সেই ব্যক্তি 'আমি'কে ছাড়িয়েও তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি 'নকশালপন্থী' আমি। এটাই তাদের কাছে শেষ কথা। এবার একজন আমায় প্যান্টটা খুলে ফেলতে বলল এবং অন্য একজন খুলে দিল এর

পরের ঘটনা গতানুগতিক সেই হাত পা বেঁধে উল্টিয়ে ঝুলিয়ে পেটানো। প্রথম বেশ কিছুক্ষণ আমাকে যে মারছে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। আমি তখন কেমন আচ্ছন্ন। বেশ খানিকক্ষণ পরে প্যান্ট পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিচে নামলাম। আবার আমাকে সেলে ঢুকিয়ে দেয়া হল। আমি চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। সহবন্দী আমার সমস্ত শরীর জল দিয়ে মালিশ করে দিতে লাগলো। সেলের আলো-আঁধারির মাঝে শুয়ে শুয়ে সারাদিনের কথা ভাবতে লাগলাম। এর কয়েকদিনের মাথায় আমি ভবানী ভবন, সি আই ডি অফিসের বিশেষ অতিথি হলাম। কোমরে দড়ি বাঁধা আর সামনে-পেছনে গোয়েন্দা পরিবৃত হয়ে সি আই ডি অফিসের সামনের বারান্দায় আমাকে বসানো হল। তারপর কোমরের দড়ি খুলে ডি আই জি-র ঘরে ঢোকানো হল। কেন্দ্রীয় সংগঠনি ব্যুরোর (COB) একজন প্রতিষ্ঠাতা নেতা হিসাবে ডি আই জি-র কাছে তারা আমার পরিচয় দিলেন। সেদিনের সাক্ষাৎকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডি আই জি (সি আই ডি) বিহার।

এদিন ভোর রাতেই ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। ৪ নভেম্বর সকালে ঘুম ভাঙার সাথে সাথেই লক্ষ্য করলাম রিট্রিট হাউসের এক বিশেষ ব্যস্ততা। এত সকালে সাধারণত গোয়েন্দারা কেউ এখানে হাজির থাকে না। কিন্তু আজ এত ভোরেই যেন কিসের একটা ব্যস্ততা মনে হচ্ছে। ওপরের ঘরে ফোন হচ্ছে এত জোরে যে, আমরা নিচের তলা থেকেও তা শুনতে পাচ্ছি। 'হ্যালো আসানসোল......হ্যালো......।' সম্ভবত ট্রাংক কল হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার কৌতূহল দূর হল। জানতে পারলাম আজ ভোর রাত্রে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে আটজন বিচারাধীন নকশাল বন্দী পালিয়েছেন। সেই দিনই আমাকে আবার ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু জেল পালানোর বিষয়ে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করেনি কেউ। মজার বিষয়, পরে জানতে পারি, গোয়েন্দা অফিসাররা নাকি আমার গ্রেপ্তারের সাথে জেল পালানোর একটা সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন বলে কাগজে জানিয়েছিলেন। ৭০-৭১ সালে বা ৭৬ সালেও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেল থেকে বহু নকশালপন্থী বন্দী পালিয়েছেন। সর্বশেষে ৮৫ সালে কোচবিহার জেল থেকেও আটজন কমরেড পালানো বা অন্ধ্রপ্রদেশের হাসপাতাল থেকে ৮৩ সালে কোন্ডাপল্লী সীতারামাইয়ার পালানোর বিষয় বার বার এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় জেল থাকলে জেল পালানোও থাকে। সি ও বি অবশ্য জেল পালানোকে পীড়কের বিরুদ্ধে পীড়িতের বিদ্রোহ হিসাবেই দেখেছে।

পুলিশ হাজত থেকে জেলে যাবার পর একদিন কাগজে একটা নতুন ধরনের খবর পড়লাম। অন্ধ্রে ছ-জন বিচারাধীন নকশাল বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে পিপলস ওয়ার গ্রুপ আটজন আই এ এস অফিসারকে বন্দী করে রেখেছে। আমাদের সেল ব্লকে এই খবর নিয়েই তখন সব সময় আলোচনা হচ্ছে। আমরা আমাদের কাছে আসা প্রতিটি খবরের কাগজই তখন খুঁটিয়ে পড়ছি। কাগজে দেখলাম কেন্দ্র কমান্ডো পাঠিয়েছে আই এ এস উদ্ধারে। এ এক নতুন ঘটনা প্রকৃত পক্ষে সি পি আই (এম-এল)-এর ইতিহাসেই এক নতুন মাত্রার সংযোজন। অবশেষে অন্ধ্র সরকার হার স্বীকার করলেন এবং নকশালপন্থী বন্দীরা মুক্তি পেলেন। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার এক খবর। দমদম জেল পলাতক গৌতম চক্রবর্তী আরামবাগ থেকে ধরা পড়েছে। এই আলোচনা চলতে চলতেই গৌতম একদিন আমাদের সেলে এসে হাজির। অর্থাৎ তাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আনা হল। সংগে আরেক কমরেড নারায়ণ মাইতি। গৌতমের শরীর অসুস্থ। ওর মাথার মধ্যে ৩৮ রিভালবারের একটা গুলি রয়েছে। '৮২ সালে মালদা জেলার এক গ্রামে পুলিশের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষের সময় গৌতমের চোখে এই গুলি লাগে এবং আজ পর্যন্ত তা মাথার মধ্যে রয়ে গেছে, ওর একটা চোখও তাই নষ্ট। ওকে নিয়ম করে এখন ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হয় তবুও মাঝে মাঝে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে।

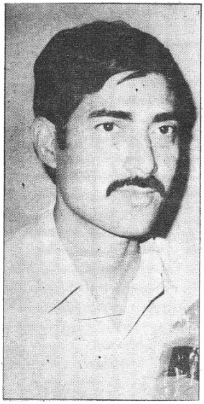
১৯ ফেব্রুয়ারি গৌতমকে একটু সুস্থ দেখে ওকে আমার ঘরে গল্প করতে ডাকলাম। ওদের জেল পালানোর বিষয়ে যদিও আমার ভীষণ কৌতূহল ছিল। যা থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক তবুও বিপ্লবী শৃংখলার জন্য সে কথা একটি বারও উচ্চারণ না করে বরং ওদের ধরা পড়ার ঘটনা শুনতে চাইলাম। ও বলল, আরামবাগ থেকে প্রায় দশ মাইল দক্ষিণের এক গঞ্জ অঞ্চল থেকে ও আর নারায়ণ মাইতি ধরা পড়ে। এলাকার নাম ডংকল। সেখানে একটা বাড়িতে ওদের সন্ধ্যার সময় যাবার কথা ছিল। সন্ধ্যাবেলায় ওরা সেই বাড়িতে গিয়ে দেখে গৃহস্বামী বাড়িতে নেই। বাড়িটি মাটির দোতলা। নিচে বাড়ির ভদ্রমহিলা রান্না করছেন। ওরা ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গৃহস্বামী কোথায় গেছেন জানতে না পেরে ওরা ওপরের ঘরে চলে গিয়ে অপেক্ষা করছিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি না আসায় ওরা বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক এই সময় এক দংগল লোক লাঠি, বর্ষা প্রভৃতি নিয়ে বাড়ি ঘেরাও করে এবং কয়েকজন সরাসরি ওপরে চলে গিয়ে ওদের নামিয়ে নিয়ে আসে। এই দলে সেই গৃহস্বামীও ছিল। বেগতিক দেখে ওরা ছুটতে থাকে। ওখান থেকে ওদের পিছু ধাওয়া করে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে সশস্ত্র জনতার হাতে ধরা পড়ে।

একটা ছোট্ট ঘটনা একটু পিছনে ফেলে এসেছি। ঘটনাটি হয়ত ছোট কিন্তু আমার ওপর তার প্রভাব অনেক গভীর। তাই ঘটনাটা একটু বলি। ৩১ জানুয়ারি-বিকেলে নিতান্ত ঠাট্টা করেই কয়েকজন কমরেডকে বললাম, 'কাল আমার জন্মদিন'। এই ঠাট্টার এক মারাত্মক ফল হয়েছিল তা বুঝলাম পরের দিন। রোজকার মত আজও সকালে সবাই মিলে চায়ের আসর বসিয়েছি হঠাৎ রবিদা (৬ বছর বিনা বিচারে আটক) বলে উঠলেন, আজ আমাদের কবির জন্মদিন। এই দিনটিকে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার জন্মদিন পালনের বিরোধী। কিন্তু আজ একটা নকল জন্মদিন কমরেডের ভালবাসার আবেগে অনুভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এতে বাধা দেবার-মত সমস্ত ভাষা তখন আমার রুদ্ধ হয়ে গেল। সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিকভাবেই কমরেডরা জন্মদিন পালন করলেন। গোল হয়ে বসে সুশৃংখলভাবে সবাই বক্তব্য রেখেছিলেন সেদিন। রবিদা, অমিত বোস, অরুণ, বাদল, যোগেশ, বর্মনদা সবাই সেদিন আনন্দে অংশ নিয়েছিলেন। আমার সেলের লোহার দরজাটার ওপর তারা টাঙিয়ে দিয়ে গেল 'কবির শুভ জন্মদিন'। রাতে সেলে নিঃসংগ আমি চোখে পড়ল মাঘের হিমেল হাওয়ায় লেখাটা দুলছে। সে দৃশ্য দেখে সেদিন আমার মনে হয়েছিল আমার কমরেডদের ভালবাসা ওই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্ট লোহার গরাদকে বিদ্রূপ করে যেন বলছে – দেখ তোমার শৃংখলের থেকেও আমাদের ভালবাসা অনেক শক্তিমান।

এই জেলেই এখন বন্দী জয়ন্ত দাস, অরুণ হালদার, যোগেশ দাস, অনন্ত বর্মন, ডাঃ অসিত বোস, মন্টু প্রামাণিক, বাদল সাহা, কাবুল দে ও আজিজুল হক। আর মাত্র কিছুদিন আগে হাইকোর্টের অর্ডারে ছাড়া পেয়েছে, সাজাপ্রাপ্ত সেবিকা ঠাকুর। জেলখানায় এখন অলিখিত বহু নির্দেশ চালু আছে। জেলর সুপারকে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, 'এগুলো ওপর তলার ভারবাল ইনস্ট্রাকশন'। জেলে নকশালপন্থী বন্দীরা সবাই বিচারাধীন (UT) ওই সরকারি আইনেই বলা আছে, বিচারাধীন বন্দীদের ক্ষেত্রে যতক্ষণ না তাদের দোষ প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ নির্দোষ হিসাবেই ভাবা হবে। অথচ আমাদের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারটা ঠিক উল্টো। সাধারণ বিচারাধীন বন্দীদের মত আমাদের জেলের ভেতরে সর্বত্র যাতায়াতের কোন অধিকার নেই। আমরা আমাদের সেল ব্লকে সব সময় বন্দী থাকি। এমনিতেই তো আমরা সেল ব্লকে বন্দী তার ওপর আবার দিনে দু বার লক-আপ। বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলে তো তিনবার লক-আপে যেতে হয় দিনে। আমাদের চা, জল গরমের জন্য সেল ব্লকে একটা হিটার রাখা হয়েছিল কিন্তু আই জি প্রিজন ডি সি (সাউথ) ও আরও উচ্চপদস্থরা একদিন সেলে ঘুরে যাবার পর সেটুকুও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অমিতের বন্ধুরা একটা রেডিও দিয়ে গেছিল। প্রায় দুমাস টালবাহানা করার পর একদিন জিজ্ঞাসা করায় সুপার জানালো আই জি অনুমতি দেননি। মজার বিষয় হচ্ছে জেলর বা সুপারের কার্যকরী ভাবে সিদ্ধান্ত নেবার সমস্ত ক্ষমতাই হ্রাস করা হয়েছে। তা না হলে ভাবুন একটা কবিতার বই আমি জেল লাইব্রেরিতে উপহার দিয়েছিলাম কিন্তু লাইব্রেরিয়ান, জেলর, সুপারের হাত ঘুরে সেটাও প্রায় দু মাস বাদে ফেরত এল আমার কাছে কারণ আই জি অনুমতি না দিলে বইটি লাইব্রেরির জন্য সুপার অনুমোদন করতে পারছেন না। শিক্ষানুরাগী সরকার ও তাদের আমলাদের কী সুন্দর নিষ্ঠা। জেমস হেডলী চেজ-এর স্বল্পবাস রমণীর ছবি আঁকা বই যাঁরা অবলীলাক্রমে ছাড়পত্র দিচ্ছেন তাঁরা একটা সামান্য কবিতার বই নিজ দায়িত্বে লাইব্রেরিতে রাখতে অনুমতি দিতে পারলেন না। বইটির অপরাধ একটাই সেটা হচ্ছে বইটির 'দাতা' ছিলেন একজন নকশালপন্থী।

আমাদের সেল ব্লকে একটা ছোট লিচু গাছ, দুটো অড়হরের গাছ আর কিছু শাক-কুমড়োর গাছ কমরেডরা করেছিলেন। মাঝে মাঝেই আমরা শুনতাম ওই গাছ সব কেটে দেওয়া হবে তারপর একদিন দুপুরে লক-আপের সময় বুঝলাম বাইরের লোক সেল ব্লকে ঢুকেছে আর লক-আপ খোলার পর দেখলাম লিচু গাছের ডাল কাটা, অড়হরের গাছটাই কাটা, আর কুমড়ো গাছটাও তথৈবচঃ। বিন্দুমাত্র সবুজের স্পর্শও বুঝি তারা রাখতে দেবেন না এই সেলে। ব্লাড ব্যাংকের গাড়ি মাঝে মাঝে জেলে আসে আর সাজাপ্রাপ্ত বন্দীরা রক্ত দেয়। বিষয়টা একদিন এক সাজাপ্রাপ্ত বন্দীকে জিজ্ঞাসা করায় পরিষ্কার হল। আসলে এই রক্তের বিনিময়ে বন্দীদের ২০ দিনের সাজা মকুব হয় তাই পাইকারী হারে এই রক্ত দেওয়া।

জেলে টাকায় তিনটে ডিম, সরষের তেল ১০ টাকা কিলো, মাংস ১০ টাকা এই তো অবস্থা আর ওষুধ বিক্রি – তা সর্বজনবিদিত। কেবল আলিপুর জেলেই ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা ওষুধের বিল হয়েছিল। বর্তমান ডাক্তার বাসুদেব মুখার্জি সেটা কমিয়ে সম্ভবত ৫০-৬০ হাজারে এনেছেন। এর জন্য তাকে সিপাহীদের কাছ থেকে যথেষ্ট গালাগাল সহ্য করতে হয়েছে, যা আমার নিজের চোখেই দেখা। সমস্ত নকশাল বন্দী থাকে তিন নম্বর সেলে অসুস্থ আজিজুল হক থাকেন এক নং সেল ব্লকে। উনি আমার পূর্বপরিচিত, তাই ওনাকে দেখতে মাঝে মাঝে ওনার সেলে যেতাম। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের কথাবার্তা হত। গণ কাজে অংশ নেওয়া যে উচিত একথা উনি বারে বারে বলতেন। জামিন নেবার বিষয়টি উনি একপেশে ভাবে দেখেন না বলে জানিয়েছেন। দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির উনি নেতা থাকাকালীন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সংগঠন ব্যুরোর সাথে ওঁদের আলোচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে বিপ্লবী সরকারের শ্লোগান নিয়ে বিতর্ক আর একটু বেড়ে যায়। চারু মজুমদারের মৃত্যুর পর থেকে আজ অবধি চারু মজুমদারপন্থী হিসাবেই কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি দল নিজেদেরকে দাবি করে সি ও বি ও দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি এদের মধ্যে অন্যতম। চারু মজুমদার ১৯৭২-এর ২৮ জুলাই শহীদ হবার পর ঐ বছরেই ৫/৬ ডিসেম্বর শর্মা-মহাদেব মুখার্জি কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠিত করে সুনীতি ঘোষকে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বাদ দেন। সুনীতি ঘোষের রাজনৈতিক লাইন কী ছিল তা পার্টি সদস্যদের কাছে জানানো হয়নি। ফলে দু লাইন পরিচালনার ক্ষেত্রে এক অশুভ রীতি পার্টিতে চলে আসল। ঠিক একই রকমভাবে কিছুদিন বাদে শর্মাকে বাদ দিয়ে মহাদেব মুখার্জি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক হলেন। ১৯৭৩ সালে চীনা পার্টির দশম কংগ্রেসের পর লিন-পিয়াও প্রশ্ন নিয়ে পার্টিতে আবার বিতর্ক শুরু হল এবং ১৯৭৪-এর ২৮ জুলাই জহর দত্ত, মহাদেব মুখার্জির কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন কেন্দ্র তৈরি করলেন; জহরের মৃত্যুর পর বিনোদ মিশ্র বর্তমানে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মহাদেব মুখার্জি ১৯৭৩ সালে ১২জন সদস্যকে নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি বানিয়েছিলেন। ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে দেগংগা মিটিংয়ে কেবল ১জন ছাড়া সেই কমিটির প্রত্যেক সদস্যই তৎকালীন পার্টি পলিসি নিয়ে



মহাদেববাবুর বিরোধিতা করেন। ফলে মহাদেব মুখার্জিকে কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকের পদ থেকে সরে যেতে হয় এবং ওই পদে 'সূরজ' মনোনয়ন পান। পরবর্তী ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে চলে ৭৫ সালের প্রথমে মহাদেববাবু শিলং থেকে গ্রেপ্তার হলেন এবং ঐ একই সময়ে প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যই গ্রেপ্তার হলেন। জেলের পুরাতন কমরেডরা বেশির ভাগই মহাদেববাবুর লাইনকে সমর্থন করলেন নিশীথ ভট্টাচার্য ও আজিজুল হকদের নেতৃত্বে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর ক্ষমতায় আসার পর যখন রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয় তখন দেখা যায় নিশীথবাবুরা মহাদেব মুখার্জিকে সম্পাদক করে কেন্দ্রীয় কমিটি বানালেন আর মহাদেববাবুর পুরাতন কেন্দ্রীয় কমিটির বেশ কিছু সদস্য এক হয়ে তৈরি করলেন পার্টি ইউনিট। আর দেগংগার মিটিংয়ের লাইনকে সমর্থন করে যারা বাইরে কাজ করেছিলেন তারা নিজেরা আঞ্চলিক ব্যুরো নাম নিলেন। এই আঞ্চলিক ব্যুরো পরবর্তী ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সংগঠনি ব্যুরো নাম নেয়। যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গে এদের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু কাজ আছে। ১৯৮২ সালে পুলিশ দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের গ্রেপ্তার শুরু করে এবং প্রায় সমস্ত প্রথম সারির নেতা গ্রেপ্তার হন। ৮৫ সালের আগস্ট থেকে পুলিশ সি ও বি-র কর্মী ও কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। সেপ্টেম্বরে স্টেটসম্যান পত্রিকায় এ সম্পর্কে পুলিশ একটি বিবৃতি দেয় এবং এই গ্রেপ্তারকে তারা 'মেজর ব্রেক থ্রু' বলে অভিহিত করে। আগস্ট মাসে তারা বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করে এবং তারপরেই নদীয়া, ২৪ পরগনা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বেশ কিছু যুবককে। অক্টোবরের ২ তারিখে গোয়েন্দারা ছদ্মবেশে হালিশহর থেকে গ্রেপ্তার করে এক যুবককে। আর তার কাছেই পাওয়া যায় তেলেগু ভাষায় লিখিত দক্ষিণ ভারতের নকশালপন্থী নেতা আবদুর রউফ ও সীতা রামাইয়ার কাছে পাঠানো এক চিঠি। এই সম্ভাব্য যোগাযোগ ভেঙে দিতে পারায় পুলিশ ২৭ নভেম্বর '৮৫-তে টেলিগ্রাফ পত্রিকায় এক বিবৃতি দেয় এবং ঘোষণা করে আমাকে খুব শীঘ্রই ধরার বিষয়ে তারা আশাবাদী এবং আমি নাকি কেন্দ্রীয় সংগঠনি ব্যুরোর নেতা।

এদিকে নদীয়া জেলার পুলিশ সুপার চৌধুরী মোহন জটুয়া (আই পি এস) ২৭-১১-৮৬ সালে 'সি পি আই (এম-এল) সি ও বি দলের নদীয়া জেলার নেতা ও সদস্যদের প্রতি আবেদন' বলে একটি খোলা প্রচারপত্র ছড়ান এবং সি ও বি-র সদস্যদের 'খুনের রাজনীতি' ছেড়ে দিতে বলেন। সি ও বি অবশ্য বহু পূর্বেই 'মেশিনারি'র ভূমিকা ও স্টেট টেররের বিষয়ে তার বক্তব্য রেখেছিলেন এবং এই সত্যকে তুলে ধরেছিলেন যে জনগণ শান্তি চাইলেও এই শান্তির অসাড়তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে এদেশের বুকে। এদেশের বুকে তাই নির্বিবাদে ঘটে চলে আরওয়াল, কানসারা কোকড়াঝাড়, শান্তিপুরের মত ঘটনা। Annihilation line-কে সি ও বি কখনই Only Form of Struggle বলে ভাবেনি। সি ও বি চারু মজুমদারের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছে Annihilation হচ্ছে higher form of class Struggle. এদিক থেকে মনে হয়েছে অন্ধ্রে পিপলস ওয়ার বা বিহারের পি ইউ বিভিন্ন কায়দায় এর শ্রেণী সংগ্রাম নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষায় কিছুটা সফল হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এখন বিপ্লবী শক্তির ঐক্যের বিশেষ প্রয়োজন। বিশাল এদেশ, ভারতবর্ষ এর সমস্যাও অত্যন্ত জটিল। সি ও বি-র পার্টি মুখপত্র 'ইশতাহার'-এ পার্টি সম্পাদক তাই এ সম্পর্কে এক আহ্বান জানিয়েছিলেন সমস্ত ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কাছে। তাতে বলা হয়েছিল 'কমরেডগণ আসুন আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে সফল করে তুলি শহীদের স্বপ্নকে' আমি বিশ্বাস করি নকশাল বাড়ি মরেনি, মরতে পারে না। নির্জন সেলের মধ্যে একলা বসে সুখী, সুন্দর ভারতবর্ষের কথা স্বপ্নে ভাবে।

আমি এক স্বপ্ন দেখেছি মুক্ত জীবনের স্বপ্ন
আমি এক ভালবাসার অনুভূতি পেয়েছি
জীবনের গৌরবে যা ধন্য
বন্দী জানোয়ারদের মত দুর্বিষহ জীবন
যেদিন মানুষের শেষ হবে
অন্ধকারের শেষে, বন্দী জীবনের দ্বার খুলে
মানুষ যেদিন রক্তিম অরুণোদয়ের স্পর্শে
ভরে নিতে পারবে তার মন
স্বপ্নের রঙের সেই প্রজাপতির
চঞ্চল নৃত্যের অপেক্ষায় তার গুটিগুলিকে আমি
হৃদয়ের উষ্ণতায় সযত্নে রক্ষিত করেছিলাম।
হে আমার প্রিয় স্বদেশবাসী
তোমরা শুনে রাখো
শুধু এই, এই মাত্র অপরাধে ওরা আমায়
বন্দী করে রেখেছে
মৃত্যুর অন্ধকারে মুছে দিতে চাইছে
আমার স্বপ্নকে। □

বিচিত্র খবর

স্মৃতিচারণায় জন্মদিন

মানুষ নানা উপায়ে তার জন্মদিন পালন করে থাকে। কারো কারো জন্মদিনে বার্থডে কেক কাটা হয়, আর সবাই তা মজা করে খায়। বয়স্ক লোকেদের জন্মদিন তত ঘটা করে পালন করা না হলেও, জন্মদিনে অন্তত ভাল ভাল খাবার খাওয়ানো হয়। সংগে মিষ্টি, পায়েসও থাকে। কেউ কেউ আবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় বেড়াতে গিয়ে জন্মদিনটা পালন করে। আবার বাড়িতে পার্টি দিয়ে লোক খাইয়েও কোনো কোনো ভাগ্যবান নানা রকমের দামী উপহার পেয়ে থাকে। কেউ তার জন্মদিন পালন করেছে ১০৩ মিটার উঁচু একটা দুর্গের চূড়ায় উঠে, এমন ঘটনার কথা শুনলে কিছুটা অবাক হতে হয় বৈ কী! তাও আবার ৭৫ বছর বয়সের এক বৃদ্ধ!

সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিনগ্রাদে ফিরসোভা নামে এক ভদ্রলোক সংগী সাথীদের নিয়ে তাঁর ৭৫তম জন্মদিনে সোজা দড়ি বেয়ে উঠে গেলেন সেন্ট পিটারও পল দুর্গের ১০৩ মিটার উঁচু চূড়ায়। দুর্গের চূড়ায় আরোহণটা ছিল তাঁর জন্মদিন পালনের একটা অভিনব পন্থা। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঐ ভদ্রলোক ঐ দুটি ইমারতের উঁচু চূড়াগুলো ক্যানভাসে ঢেকে দিয়েছিলেন অন্যান্য সংগীদের নিয়ে। শত্রুপক্ষ যাতে বোমা মারার জন্য লক্ষ্যবস্তু ঠিক করতে না পারে, তার জন্য ওভাবে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঐ আরোহী ভদ্রলোক তাঁর সেই কাজের স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্য এভাবে ৭৫তম জন্মদিনটি পালন করলেন।

ডাক চলাচলে এখনো পায়রা

কে একজন যেন বলেছিলেন, বর্তমান যুগটা গতির যুগ। গরুর গাড়ির পরিবর্তে এখন গ্রামগঞ্জে ছুটে চলেছে বাস-মোটর। আকাশে উড়ছে দ্রুতগামী বিমান। ডাক চলাচলের ক্ষেত্রেও এসেছে বিপ্লব। যুগটা অত্যন্ত দ্রুতগতির ডাক চলাচলের যুগ। এয়ার মেল, কুইক মেল সার্ভিস প্রভৃতি অনেক কিছুই এখন চালু হয়েছে। অথচ ওড়িশার পুলিশ বিভাগ এখনও ডাক নিয়ে যাবার জন্য পায়রাকে ব্যবহার করছেন।

কটকে পুলিশের সদর দপ্তরে পায়রা-ডাক চালু হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। এখন ওড়িশার পাঁচটি পুলিশ কেন্দ্রে ডাক বহনের কাজে ৭৪০টি পায়রা নিযুক্ত রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি হল কটক, ছত্রপুর, কেন্দুপাড়া, সম্বলপুর ও ঢেংকানল। পায়রাগুলোর পায়ের সংগে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে চিঠির ক্যাপসুল। তারা খুব উঁচু দিয়ে দ্রুতগতিতে উড়ে যাবার ফলে বাজ বা শিগরোর কবলে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

১৯৪৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওড়িশার সম্বলপুর জেলার হীরাকুদ থেকে কটকে একটা জরুরি বার্তা পাঠাবার জন্য পায়রার সাহায্য নিয়েছিলেন। তাই এখন বলতে হয় – ওড়িশায় সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

সাপ খাওয়া নেশা!

যে বিষধর সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু হতে পারে, সেই বিষধর সাপ খাবার কথা কোন মানুষ চিন্তা করতে পারে, ভাবলে কিছুটা অবাক হতে হয় বৈকী! ইঁদুর খাওয়া, ব্যাঙ খাওয়া, আরশোলা খাওয়া – এ সবের কথা না হয় শোনা গেছে। কিন্তু জ্যান্ত সাপ, বিশেষ করে বিষধর সাপ খাওয়ার কথা শুনলে



আমাদের গাটা কেমন যেন শিরশির করে ওঠে! অথচ চীনের ওয়াং বিয়াও নামে এক কৃষক প্রতিদিন একটা করে জ্যান্ত বিষাক্ত সাপ খেয়ে থাকেন। আসলে মিঃ বিয়াও এটা খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সাপ খাওয়া তাঁর নেশায় পরিণত হয়েছে বলতে পারা যায়। যেদিন তিনি সাপ খেতে পারেন না, সেদিন তাঁর কেমন যেন অস্বস্তি লাগে, মাথাটা ঝিমঝিম করে। নেশার জিনিস না পেলে মানুষের যে অবস্থা হয় তাঁরও ঠিক সেই অবস্থা।

অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, কেন মিঃ বিয়াও-এর এই বিচিত্র নেশা হল? বেচারার কোন দোষ নেই। অল্প বয়সে তিনি আক্রান্ত হলেন তড়কা রোগে। আর দিন দিন তা বেড়েই চলল। অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখিয়েও কোন ফল হল না। এই দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে তাঁকে বাঁচতেই হবে। বন্ধু-বান্ধবদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত তিনি শরণাপন্ন হলেন এক হাতুড়ে চিকিৎসকের। চিকিৎসক ভদ্রলোক ভালভাবে পরীক্ষা করে নিদান দিলেন – তাঁকে দৈনিক একটা করে জ্যান্ত বিষাক্ত সাপ খেয়ে যেতে হবে। শুধু দু'চারদিন খেলেই চলবে না, একটানা এক বছর ধরে এটা খেয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের নিদান শুনে তো মিঃ বিয়াও-এর চোখ কপালে ওঠবার উপক্রম। তবুও কী আর করবেন, রোগ তো সারানো চাই! তাছাড়া রোগের যন্ত্রণা থেকে তাঁকে যে করেই হোক মুক্তি পেতে হবে। ডাক্তারের আরো ফরমান – ঐ এক বছর বিয়াওকে ডাক্তারের হেফাজতে থাকতে হবে। এমনি করে ডাক্তারের দাওয়াই খাওয়া শুরু হল। আর আশ্চর্য, ঐ এক বছরে বিয়াও-এর রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেল। কিন্তু রোগ সারলে কী হবে – সাপ খাওয়া যে তাঁর একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাঁর অবস্থা এখন সাপের ছুঁচো গেলার মত। সাপ খাওয়া ছাড়তে পারছেন না কিছুতেই। রোজ তাঁর একটা করে জ্যান্ত বিষাক্ত সাপ খাওয়া চাই-ই চাই।

কাকের মাংস খাওয়া?

'কাক কাকের মাংস খায় না' – এমন একটা প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে বটে। কিন্তু মানুষ কাকের মাংস খায়। হয়তো অনেকে অবাক হচ্ছেন। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে সত্যি। মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কাঁথি আর মেদিনীপুর সদর মহকুমার 'আহীর' সম্প্রদায়ের প্রায় এমন কিছু মানুষ আছেন যারা কাক মেরে তার মাংস খেয়ে থাকেন। কাকের মাংস এঁদের খুব প্রিয় খাদ্য। এঁদের আদি নিবাস নাকি অন্ধ্রপ্রদেশে। তাঁরা জাতিতে হিন্দু। কালী, চণ্ডী, গণেশ আর শীতলা এঁদের উপাস্য দেব-দেবী। এঁরা মেদিনীপুর জেলার ঐ তিনটি মহকুমার ২৬টি গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। প্রায় ৫০টি পরিবারের মোট জনসংখ্যা সাতশোর কাছাকাছি। গরুর মাংস ছাড়া এঁরা আর সব রকমের মাংসই খেয়ে থাকেন। পুজোতে শুয়োর, হাঁস, মুর্গি বলি দিয়ে থাকেন। কাক মারার জন্য এঁরা মাটিতে ফাঁদ পাতেন এবং মাটি দিয়ে তা ঢেকে রাখেন। ফাঁদের



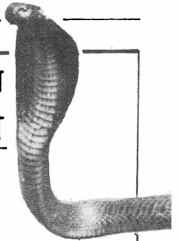
ভেতর খাবার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কাকের দল সেই খাবার খেতে ফাঁদের মধ্যে ঢুকে ধরা পড়ে। অমনি সেই কাকগুলোকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে ঝলসে কাকমারিয়েরা তা খেয়ে থাকেন।

এঁদের বিয়েতে কন্যাপণ দেবার রীতি প্রচলিত আছে। তবে কোন লোক একসংগে একটার বেশি মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন না। কন্যাপণ ধরাবাঁধা ১৪ টাকা মাত্র। এই পণের টাকা না দিলে অবশ্য বিশেষ আপত্তি ওঠে না। বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া মেয়েকে অন্য কোন লোক অনায়াসে বিয়ে করতে পারেন। আপত্তি নেই। বিয়ে দেন সর্দার। সর্দারকে তাঁরা খুব মেনে চলেন। তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে নেন। পুজোর জন্য পুরোহিত নির্বাচিত করেন তাঁরা নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই। জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাই-বোনদের মধ্যে বিয়ের সম্বন্ধটা এঁদের কাছে সবচেয়ে ভাল সম্বন্ধ। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হলে বা খুব বেশি অলস হলে কিংবা ব্যভিচারিণী হলে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। স্বামী ব্যভিচারী হলে স্ত্রীও ইচ্ছে করলে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে।

তবে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা কিন্তু খুব ঘন ঘন থুথু ফেলে থাকেন, যা দেখলে খুব নোংরা বলে মনে হবে। কাক মেরে খেলেও পেশায় এঁরা কিন্তু ভিখিরি। ভিক্ষা করার সময় আলাদা পোশাক পরে থাকেন। গলায় মালা, হাতে লোহার বালা আর ছুরি। মাথায় উষ্ণীষ। হাতের ছুরিটা লোহার বালায় মেরে মুখে সীতারাম বলে গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষে চান। ভিক্ষে না দিলে শাপান্ত করতেও ছাড়েন না। এমনকি নিজের উরু কেটে রক্তপাত ঘটান। তাই ভয়ে লোকে এঁদের ভিক্ষে দেয়। □

বরুণ মজুমদার

ব্যংগচিত্র : শংকর



সাপুড়েদের টিকে থাকার সংকট তীব্র

একটা সময় ছিল, যখন সাপের খেলা দেখতে লোকে ভিড় জমাতো, খেলাশেষে হাসি মুখে খুচরো পয়সা দিত সাপুড়ে বা বেদেকে। শিশুরা ভয়ংকর সাপের নানা অ্যাক্রোবাট দেখে পুলকে হাততালি দিয়ে উঠত। দিন পাল্টেছে, সময়ও হয়েছে মহার্ঘ। তাই এখন আর সাপের খেলায় ভিড়ের ঘনত্ব বাড়ে না। পাতলা ভিড়ে মেলে না মুঠো মুঠো খুচরো দক্ষিণা।

তবু ওরা অর্থাৎ সাপুড়েরা চোদ্দপুরুষের পেশা ছেড়ে দিতে পারেনি। এ পেশা ওদের পেট পুরে খেতে না দিলেও, ওরা বিনম্র শ্রদ্ধায় এখনও সাপের ঝুড়ি নিয়ে পথে বেরয়। হাঁক ছাড়ে ডমরু বাজিয়ে – 'সাপের খেলা'।

সাপুড়েদের এখন সময় ভাল যাচ্ছে না। আয় রোজগার কমার সংগে সংগে শুরু হয়েছে তাদের টিকে থাকার সংকট। বিষধর সাপের সংগে বন্ধুত্ব করার মত সাহসী হওয়া সত্ত্বেও আজ অধিকাংশ সাপুড়েই বাস্তবের কঠিন থাবায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করাই এখন কঠিন কাজ।

পেশা হিসেবে সাপ ধরা ও সাপের খেলা দেখানো এখন মোটেই লাভজনক নয়। তাই অনেক সাপুড়েই সাপ ধরা ছেড়ে কৃষি মজুরের খাতায় নাম লিখিয়েছে। আবার, কেউ বা চালাচ্ছে রিক্সা। কিন্তু সবার পক্ষেই চোদ্দপুরুষের 'গর্বিত পেশা' ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

এই তো সেদিন বজবজে গিয়েছিলাম সাপুড়েদের হালচিত্র প্রত্যক্ষ করতে। ওখানে এখনও বহু সাপুড়ে বা বেদে বসবাস করে। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তারা আজও পথে বেরয় সাপের ঝুড়ি নিয়ে।

(বজবজের) চড়িয়ালে৬ নম্বর ওয়ার্ডের মালপাড়ায় নামকরা সাপুড়ে গোলাম মুস্তাফার ঝড়ির খোঁজ করতেই একজন অল্পবয়সী ছেলে হাত দেখিয়ে দিল ঐদিকে। গোলামের সংগে দেখা হল। কিন্তু বিস্তারিত জিজ্ঞাস্য বিষয় নিয়ে কথা তুলতে গোলাম ইতস্তত করলেন। গোলামের সংগে পাড়াপ্রতিবেশীরাও এসে ভিড় জমাল। যখন শুনল সাপুড়েদের নিয়ে লেখা হবে তারা বলল না, তা হবে না। কারণ, উল্টোপাল্টা লিখলে খারাপ হয়ে যাবে। গোলাম শেষ পর্যন্ত সবার অমতেই তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

মাটির দাওয়া, টালির ছাদ, সামনের উঠোনে তুলসীর বন, আর টলটলে পুকুরের জল, ভারি সুন্দর জায়গাটা। গোলামের সংগে কথা হচ্ছিল তাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে। গোলামের স্ত্রী এসে এক গ্লাস জল আর সামান্য কিছু খাবার দিলেন। সবেমাত্র জলটা মুখে তুলব ভাবছি এমন সময় গোলামের বউ চিৎকার করে উঠলেন – হেই মাগো। এত্তবড় কাল নাগ। কুথা থেকে আইল! গোলাম আস্তে ঠেললেন আমায় – বাবু সরে যান বলেই নেমে এলেন উঠানে। দৃশ্যটিতে যা দেখা গেল তা হল বিশাল একটা সাপ ফণা তুলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে দাওয়ার দিকে। যেন, মহারাজ তার খাদ্যের দিকে মন্থর গতিতে চলেছেন। গোলাম এগোতেই তাঁর বৌ তাঁর হাত চেপে ধরলেন – থাক। ঐ রোগা পটকা বউটি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় ধরে ফেললেন সাপটিকে এবং ভরে ফেললেন ঝাঁপির মধ্যে। গোলামের দিকে সপ্রশ্ন চাইতেই তিনি জানালেন, বাবু, এ আমাদের নিত্যকার ঝামেলা। কোথা থেকে না কোথা থেকে হরেক রকম সাপ এসে পড়ে। কখনও ঝাঁপি খোলা পেলেই বেরিয়ে পড়ে। এটা কারুর ঝাঁপি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

গোলামের স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন – বাবু আমাদের ঘরের মেয়ে-ছেলে সবাই সাপ ধরতে জানে। তবে বাইরে এরা যায় না। আমরা পুরুষরাই বাইরে যাই। এই লাইনটাই হল বিপদের। প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকতে হয়।



বর্তমানে আপনাদের দিন কিভাবে চলছে, কেমন আছেন আপনারা? এই প্রশ্নের উত্তরে গোলাম জানালেন – না মরে বেঁচে আছি বাবু। কোনমতে দিন কাটে আমাদের। এই লাইনে আয় রোজগার কমে আসছে। রোজগারে আজকাল ভীষণ টান ধরেছে। আগে মানুষ সাপের খেলা দেখে আনন্দ পেত, পয়সা দিত। এখন তেমন করে কেউ দেখে না আর পয়সাও দিতে চায় না। তাই সাপের সংগে বানর এবং অন্যান্য জীবজন্তুও আমায় রাখতে হয়। যে পরিশ্রম করে আমরা দুটো পয়সার জন্য বাঁশি বাজিয়ে খেলা দেখাই, সেই অনুপাতে আমাদের রোজগার হয় না। তাই আমাদের অনেকেই এই ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছেন। হয়ত আমাকেও দিতে হবে। খুব বেশি হলে মাস গেলে ৬০০-৭০০ টাকা আসে।

সাপুড়েরা এখন মোটেই ভালো নেই। এদের সামনে এখন দারুণভাবে টিকে থাকার সংকট। লোকদেখানো, লোকভোলানো নানান বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাদের সেরকম কিছু রোজগার হচ্ছে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সংগে সংগে মানুষ বুঝতে শিখেছে যে, বুজরুকির দিন শেষ হয়েছে। তাই আজ আর সাপ খেলা, সাপুড়েদের ওষুধ এসবে তেমন কেউ আকৃষ্ট হয় না। ফলে এই ব্যবসা আজ লোপ পাবার পথে।

গোলাম জানালেন, এই ব্যবসা আঁকড়ে আছি শুধুমাত্র একটাই কারণে, এ আমাদের পিতৃপুরুষের ব্যবসা। আর অন্য একটি কারণেও এই ব্যবসা ধরে আছি তা হল, ছোটবেলা থেকে এই সাপ নিয়েই আছি, অন্য কোনও ব্যবসা তো শিখিনি, তাই স্বভাবতই এই ব্যবসাতে একটা টান পড়ে গেছে।

আপনারা সুযোগ পেলে অন্য ব্যবসা

করবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, আমি হয়তো সুযোগ পেলেও অন্য ব্যবসা করতে পারব না। কারণ আমার এই সাপের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তবে অন্যরা যারা এই লাইনে আছে এবং অল্প বয়স তারা সুযোগ পেলে অন্য কোনও ব্যবসা বা চাকরি করতে পারে।

গোলাম মুস্তাফা তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কথা জানালেন অত্যন্ত করুণভাবে। বললেন, নিজেদের খাবারের কথা চিন্তা করতেই উদয়অস্ত কেটে যায়, এর ওপর আবার পড়াশুনা। তবে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করে দিয়েছি সামনের একটা স্কুলে। ওদের এই লাইনে আনার ইচ্ছে একেবারে নেই।

আর একজন সাপুড়ে সালাম মাল। পরিচয়টা তাঁর সঙ্গে ঘটল খানিকটা মন কষাকষির মধ্য দিয়ে। বয়সে তরুণ, সর্বাঙ্গে রাত্রি জাগরণ ও অত্যাচারের ছাপ স্পষ্ট। হঠাৎ দেখলে তাঁকে তালপাতার সেপাই বলে মনে হবে। প্রথম প্রশ্নটি শুনেই তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন – আপনার কী দরকার এসব খবরে? তাঁকে বোঝানো হল, কোনও ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে আসা হয়নি। কথা প্রসঙ্গে বললেন, এই ব্যবসা করতে হয় পেটের দায়ে। তাও রোজ খাবার জোটে না। তার ওপর বাবা, মা, ভাই, বোন, বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় সংসার। তাই এতগুলো পেট চালাতে যদি ভাল কোন চাকরি বা ব্যবসার জন্য ঋণ পাই তাহলে অন্য চেষ্টা করে দেখতে পারি। একই জবাব পাওয়া গেল শেখ সামসেরের কাছ থেকে। একই জবাব, সুযোগ পেলে ভিন্ন পেশা গ্রহণে তাঁদের আপত্তি নেই। সাপ ধরা ও সাপের খেলা দেখিয়ে এখন আর সংসার চলছে না।

হাল আমলের সাপুড়েদের বর্তমান চিত্রটা সর্বত্রই প্রায় এইরকম। এক হিসেবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে মোট ৪৩২টি পরিবার সাপ ধরা ও সাপ খেলা দেখানোর পেশার সঙ্গে জড়িত। সবচেয়ে বেশি সাপুড়ে অধ্যুষিত অঞ্চল ২৪ পরগনা এবং সবচেয়ে কম সাপুড়ে এই কলকাতায়। বর্ধমান, হাওড়া, ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় সাপুড়েদের ডেরার খোঁজ পাওয়া যায়। কাছাকাছি বর্ধমানের রায়না গ্রামে মালপাড়া অঞ্চলে, হাওড়ার মাজুতে, বেগমপুরে, বারুইপুরের শাহজাহান রোডে এদের আসল ডেরার খোঁজ মেলে। আর কলকাতায় উল্টোডাঙ্গা পুলিশ স্টেশনের কাছে, খিদিরপুরের নতুন ব্রিজের তলায়, এবং মাঝেরহাট স্টেশনের গায়ে এদের ক্ষণস্থায়ী বাসস্থানেরও সন্ধান মেলে।

প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায়, হিমালয় থেকে একদল আদিম মানুষের কোনো এক রহস্যময় শক্তি নিয়ে আগমন ঘটেছিল। এই প্রাচীন সাহিত্য থেকে আরও জানা যায় যে, সাবর জাতি বলে তখন এক জাতি ছিল। এরাই সাপুড়েদের পূর্বপুরুষ। এই সাবর জাতি থেকে পশ্চিমবঙ্গের 'মাল' সাপুড়ে এবং বাংলাদেশের 'বেদিয়া' জাতের উৎপত্তি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে 'মাল' গোষ্ঠীর সাপুড়েদের দেখা পাওয়া যায়। সাপুড়েদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন –

(১) মেতেল বেদে, (২) বিষ বেদে ও (৩) ইসলামিক বেদে।



মেতেল বেদে : মেতেল বেদেরা মাটিতেই তাদের কাজ কারবার সীমাবদ্ধ রাখে। জলে তারা পারে না। মাটির কাছাকাছি থাকে বলেই তাদের এই নাম। সাপে কামড়ালে বা সাধারণ অসুখবিসুখে এরা হাতুড়ে চিকিৎসা করে। শীতের সময় এরা ঘরে ফিরে আসে এবং নিজেদের জায়গাতেই তারা চাষবাস করে দিন কাটায়। এরা হল অন্য স্তরের বেদে।



বিষ বেদে : সাপুড়েদের মধ্যে সবচাইতে শীর্ষস্থানীয় শ্রেণী হল এই বিষ বেদেরা। তীব্র বিষ নিয়ে এরা প্রতিনিয়তই কাজ-কারবার করে। তাই এদের বলা হয় বিষ বেদে। বিষ বেদেদের নিয়ে নানা উপাখ্যান চালু রয়েছে। যেমন তারা দাবি করে যে, তারা নাকি চাঁদ সদাগর লখীন্দরের জন্য লোহবাসর বানিয়েছিল। কিন্তু লখীন্দরকে সাপে কামড়ালে চাঁদ সওদাগর তাঁদের তাড়িয়ে দেন। তখন তারা নৌকা করে গঙ্গায় চলে আসে এবং মনসার আশীর্বাদে তারা শুরু করে তাদের সাপ ধরার জীবিকা। বছরের ছয় মাস তারা ডাঙায় বাস করে। তারপর নাগ পঞ্চমীর দিনে তারা মনসাদেবীর পূজা করে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। জলে বেড়াতে বেড়াতে কোন শহরে এসে তারা খেলা দেখাতে শুরু করে।

ইসলামিক বেদে : মুসলমান সাপুড়েদের বলা হয় ইসলামিক বেদে। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় এদের দেখা যায়। মূলত পূর্ববঙ্গের সাপুড়েরাই ইসলামিক বেদে হিসেবে পরিচিত। □

দেবাশিস মুখার্জি

ঝুমুর গান এখন গণচেতনা বিকাশের হাতিয়ার

অযোধ্যা, বাগমুন্ডি, পাঞ্চেত, দলমা, বাদামপাহাড়, জারগআ, বেলা, জনা, সেঁওআতি, কিরিবুরু, পরেশনাথ, শুশুনিয়া, সিমলিপাল, সিঁদুরপুর, গহিরা ইত্যাদি অগুনতি ছোটবড় পাহাড় রিসিট্টংরি, শীতলপুর বওআ, মাগুড়া, কঁচআ নামের অগুনতি ছোটবড় টিলা, ডুংরি ভরা চড়াই-উৎরাই ভূমি, লাল কাঁকুরে মাটি আর সুবর্ণরেখা, দামোদর, কাঁসাই, শিলাই কুমারি, দ্বারকেশ্বর, শংখ, করকরি, আরও কত অসংখ্য খরস্রোতা নদীর সংগে ছড়িয়ে আছে শাল, সিয়াল, মহুল, পলাশ, কেঁদ, ভেলুআ, ভুড়ুর, কুল, শাহড়া, ধাধকি, ধআ, সিধা, নিম, আসন, জইড়, বড় অর্জুন, কৌ, করঞ্জা, আম, জাম, কাঁঠাল, হাজারো রকমের গাছপালা ইত্যাদি নিয়েই ভারতের আদিবাসী অঞ্চলের একটি আলাদা চরিত্র গড়ে উঠেছে। এখানকার মানুষও লালন করে এসছে এক ভিন্নধর্মী জীবনযাত্রা, ভাবাবেগ, সামাজিক সংগঠন ,ভাষা, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, মূল্যবোধ, যুগযুগ ধরে এবং জন্ম দিয়েছে এক স্বতন্ত্র নৃত্যগীতধারার যা এদের অকৃত্রিম হৃদয়বৃত্তির অনবদ্য সৃষ্টি, যা এদের জীবন, জীবিকা ও আত্ম বিকাশের ক্ষেত্রে একান্তই অপরিহার্য।

যে সংগীতধারা এই এলাকার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় অপ্রতিহত গতিতে, যে সংগীতের মায়ায় এই রুক্ষ কর্কশ মাটি নূপুরের মত বেজে ওঠে, যে সংগীতধারা এই কঠিন মাটির কঠোর হৃদয়ে ছন্দময় হয়ে ওঠে। সেই সংগীতধারারই বিতর্কিত নাম 'ঝুমুর'। ঝুমুরের প্রখ্যাত গবেষক গিরীশচন্দ্র মোহান্ত এই এলাকাকে, ছোটনাগপুর মালভূমি নয়, জংগলমহল নয়, ঝাড়খন্ড নয়, তিনি অভিহিত করেছেন 'ঝুমুর দেশ' নামে।

পুরুলিয়া সংলগ্ন এলাকার লোকনৃত্য, লোকসংগীত, লোক সাহিত্য, লোকভাষা, লোক সংস্কৃতি এক কথায় লোকজীবনের কোন অংগকেই ঝুমুরকে বাদদিয়ে ভাবা যায় না। ঝুমুরের প্রভাব এখানকার জনজীবনের সবকটি প্রশাখাতেই অপরিসীম। করমগীত একান্তভাবেই মেয়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মতাদর্শীদের প্রভাব ওতে পড়েনি। কিন্তু ঝুমুর এই এলাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় লোকমাধ্যম এজন্য প্রায় সমস্তপ্রকার, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রচারকগণ দ্বারা ঝুমুর ব্যবহৃত হয়েছে। তাই ঝুমুর, বিষয়বস্তু, সুরবৈচিত্র্য রচনাশৈলী, ভাষা, আঙ্গিক ইত্যাদি নিয়ে এক বিশাল ভান্ডারে পরিণত হয়েছে।

করমপরব যেদিন শেষ হয় সেইদিন থেকেই 'ডাইড়ঝুমুর' বা 'ডাইর-নাচের' আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সর্বত্রই মেয়েরা এই ডাইড়নাচে অংশগ্রহণ করত। এখনও কোথাও কোথাও তাও প্রচলিত আছে। করমগীতে যদিও বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় না। তবুও বহু করমগীত 'ডাইড়-ঝুমুর' হিসেবে ডাইড়-নাচে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বেশ কিছু ঝুমুরে করমের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন –

অজইধ্যা নগরে করমা ভেলে
রাজা, চালা হো করমা খেলে যাব্।

তাছাড়া করমগীতের ভাষা এবং পুরনো ভাদরিআ বা ডাইড়ঝুমুরের ভাষা ও রচনাশৈলীর সাদৃশ্যের জন্যে অনেকে করমগীতকেই ঝুমুরের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঝুমুরের আদিরূপ যে ভাদরিআ ঝুমুর বা.ডাইড়-ঝুমুর একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ভাদরিআ ঝুমুরের মধ্যে ঝিঙাফুলিয়া, মুদিআলি, টামড়িয়া, গোলআরি, পাটিআমেধা, আড়খেমটা, ঝুটিআমাজ্ঞা, রসরসিয়া, রসপখিয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন সুর ও তাল আছে কিন্তু ঝুমুরের আদিভাষা ছিল কুড়মালি এবং এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাই ছিল এর বিষয়বস্তু। যেমন

১। মঞ তঅ গাঁও জাম
বিহানে জনহাইর কুটি দিহা।

২। মাঞ বেটি নিদাই গেল্
ফড়কি তঅ নেহি দেল্
খুখড়ি কটাইসে লেগি দেল্ গে সজনি।

৩। দিন গেলা চলিরে মন
দিন গেলা চলি,
[illegible] রে মানুষ জনম,
ঝিঙা ফুলেক কলি রেমন
দিন গেলাচলি

৪। মওহা ভুজইতে খাপইর ফুটি গেল্
মুহজারাঞ পুঁঠাঞ পিটি দেল্।

প্রথম গানটির বিষয়বস্তু হল আমি অন্য গ্রামে অর্থাৎ কুটুম্ববাড়িতে যাব, সকালে জনার অর্থাৎ ভুট্টার ছাতু তৈরি করেদিও। দ্বিতীয় গানটির বিষয়বস্তু – মা ও মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, 'ফড়কি' অর্থাৎ বাঁশের তৈরি দরজাবন্ধ করল না, সুযোগ পেয়ে 'কটাস' অর্থে 'খটাস' (বিড়াল জাতীয় প্রাণী) ঘর থেকে মুরগি নিয়ে পালাল। তৃতীয় গানটিতে এখানকার অশিক্ষিত জনগণের জীবনদর্শনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। গানটিতে লোককবি বলছেন দিন চলে যাচ্ছে, এই মনুষ্য জনম্ ঝিঙাফুলের কলির মতই অনিত্য। ঝিঙা ফুল যেমন সন্ধ্যের সময় ফুটে সকালে ঝরে যায়, তেমনি এই জীবনও ঝরে যাবে। চতুর্থ গানটির বিষয় হল – মহুয়ার ফুল ভাজতে গিয়ে খাপইর (মাটির পাত্র) আগুনের তাতে ফেটে গেল তাতে রুষ্ট হয়ে মেয়েটির স্বামী তার পুঁঠায় (কোমরের ওপরে পিঠের দিকে) লাঠি দিয়ে পেটাল।

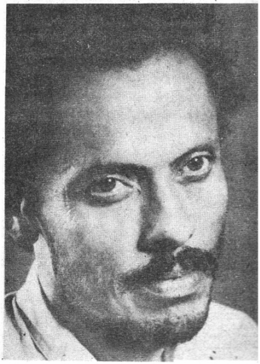
এই গানগুলিতে এতদঞ্চলের মানুষের নিরাভরণ জীবনযাত্রার চিত্রটি অনবদ্যভাবে ফুটে উঠেছে এবং অতি তুচ্ছ বিষয় থেকে জীবনবোধের চূড়ান্ত ভাবনা কত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই ভাদরিআ ঝুমুরগুলি একান্তভাবেই লোকসংগীত। এগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক রূপরেখা।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে 'ভাদরিআ' ঝুমুর, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ্য মাসে, চৈতালী, উধওআ, আষাঢ় শ্রাবণে কবিঝুমুর এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুরের ঝুমুর তোআছেই, নাচনিশালিয়া বা দরবারি ঝুমুর গাওয়া হয় সারা বছর ধরেই। তাছাড়া ডাইড়-



নাচনি ও রসিক

ঝুমুরের লড়াকু শিল্পী কুচিল মুখার্জি



নাচ, পাঁতা নাচ, কাঠি-নাচ, নাচনি নাচ, বাঈ নাচ, মলহরিয়া নাচ, ঘোড়া নাচ, ভগতা নাচ, ছও-নাচ, মাছানি, বুলবুলি, বাসধারী ইত্যাদি সর্বত্রই বিভিন্ন সুরের ঝুমুর ব্যবহৃত হয়। এজন্য বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ইত্যাদি বিভিন্ন মত ও আদর্শের প্রচারকগণের দৃষ্টি সহজেই ঝুমুরের ওপর পড়েছে এবং বহু মত ও আদর্শের প্রচারমাধ্যম হিসেবে ঝুমুর ব্যবহৃত হয়েছে।

এতদঞ্চলে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের পর ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিষয় যুক্ত হয়! লোককবিদের প্রেম ভাবনায় জুড়েআছে রাধাকৃষ্ণের লীলা। কীর্তনের সুরের সংগে, 'ভাদরিআ', চৈতালী, উধওআ, কবি, করম, বিহাগীত, বাঁদনাগীতের সুর সহযোগে



প্রেমের ঝুমুর



নাচনি

এক নতুন ধরনের ঝুমুরের আবির্ভাব ঘটে যাকে নাচনি শালিআ বা দরবারি ঝুমুর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দরবারি ঝুমুর নাচনি বা বাঈদের আবির্ভাবের পর রাজা, জমিদারদের দরবারে শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে যুক্ত হয় ও সুরবৈচিত্রে সমৃদ্ধ হয়। ভাংগরিআ ঝুমুরের কুড়মালি ভাষার পরিবর্তে ঝুমুরের ভাষা হয়ে যায় বাংলা, হিন্দি ওড়িয়া। ভবপ্রীতানন্দ ওঝা, রামকৃষ্ণ গাংগুলি, দীনাতাঁতি, বরজুরাম, ভীমা, তুলসীদাস, বাউলদাস, উদয়কামার, চামু কামার, গৌরাঙ্গিয়া মালহার, পরেশকামার, অক্ষু প্রমুখ লোককবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহ তথা রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির কাহিনী নিয়ে ঝুমুরের ভান্ডার ভরে দেন।

বিনন্দ সিং, রামেশ্বর সাধু, সৃষ্টিধরসিং মাহাত প্রমুখ সন্তকবিরা বাউল তথা সুফী সম্প্রদায়ের দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়েও প্রচুর ঝুমুর গান রচনা করেন। এইভাবে ঝুমুরের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে এক ধর্মীয় প্রতিযোগিতা। যার মাধ্যমে এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অধ্যাত্মবাদ, দেহতত্ত্ববাদ, নিরাকারবাদ, পিন্ড ব্রহ্মান্ড, নিবর্তনতত্ত্ব, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে থাকেন।

ঝুমুর গবেষক গিরীশ মোহান্ত এই সময়টাকে ঝুমুরের ''স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ঝুমুরের সৃষ্টিক্ষেত্রে এই সময়টাতে এক সামাজিক পট পরিবর্তন ঘটে। রক্ষনশীলতার প্রভাবে মেয়েরা বিদায় নেয় নৃত্যের প্রাংগণ থেকে। ঝুমুর আশ্রয় পায় নাচনি বা বাঈদের কণ্ঠে। সংগীতবিদ্যার চূড়ান্ত অধ্যয়নের ফলে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতকে আধার করে সুর বৈচিত্র্য এবং ভাব, ভাষা ও আলংকারিক ক্ষেত্রে যদিও ঝুমুরের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে যায় তবুও নর্তকীরগৃহে লালিত হওয়ার জন্য ঝুমুর কিছুটা অপাংক্তেয়ও হয়ে পড়ে।

ঝুমুর গাইছেন অধ্যাপিকা বীণাপাণি মোহান্ত



এইসময় রাজা জমিদারদের অনুকরণে সামন্ত তথা সাধারণ সমাজেও নাচনি বা বাঈ রাখার চল শুরু হয়। কিছু প্রতিভাহীন কবি যখন প্রেমসংগীতের নামে উৎকট যৌনগন্ধী রচনায় মনোনিবেশ করে তখন ধীরে ধীরে ঝুমুর নিন্দিত হতে থাকে সভ্য সমাজে। একসময় ঝুমুর অশ্লীলতার চূড়ান্ত হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এবং প্রায় সর্বস্তরে বর্জিত হয়।

অধুনা কিছু লোকসংস্কৃতি-গবেষক ঝুমুরের সুরবৈচিত্র্য, ভাব, ভাষা বিষয় আঙ্গিকের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে এর বিশাল ভান্ডারের উন্মোচন ঘটান। জনসংযোগ, জনপ্রিয়তা এবং জন মনোরঞ্জনে ঝুমুরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন। শুরু হয় ঝুমুরের সপক্ষে প্রচারাভিযান। কিছু প্রতিভাবান কবি সামাজিক, অন্যায়-অবিচার, বঞ্চনার ছবিতুলে ধরতে থাকেন ঝুমুরের মাধ্যমে। নতুন বিষয়ের সংযোজনে ঝুমুর হয়ে ওঠে গণচেতনা বিকাশের হাতিয়ার। এদের মধ্যে উড়িষ্যার গিরীশচন্দ্র মোহান্ত, জামশেদপুরের বিপিনমুখী, ধানবাদের গৌরীনাথ মাহাত, জগন্নাথ মাহাত, ঝাড়গ্রামের ভবতোষ সৎপথি, পুরুলিয়ার কৃত্তিবাস কর্মকার, সুনীল মাহাত, হাজারী রাজোয়াড়, মনোরঞ্জন পান্ডে ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। কিছু প্রতিভাবান কণ্ঠশিল্পী আত্মনিয়োগ করেন ঝুমুরকে আবার জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে ধরতে, এদের মধ্যে পশুপতিপ্রসাদ মাহাত, বিজয় মাহাত, সদানন্দ মাহাত, বীণাপাণি মোহান্ত, অঞ্জলি মাহাত, ধরণী চক্রবর্তী, মিহির লাল সিংদেও কর্মবীর মাহাত, কৃত্তিবাস কর্মকার, সুবল রাজোয়াড়, গোলাপী মাহাত, সুধারানী মাহাত, মীনু মাহাত প্রমুখ।

হাজার হাজার ঝুমুর শিল্পী আছেন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে কিন্তু রেডিও, টেলিভিশন, রেকর্ড সিনেমা এদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল এবং আজও আছে কিন্তু একটা জিনিস এদের হাতের কাছে পৌছে গেছে। সেটি হোল টেপ-রেকর্ডার। কোন স্টুডিও নয় সাধারণ টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা ক্যাসেট কপিরপর কপি হতে হতে কুশ্রী আওয়াজে গানের মাধুর্য কোথায় বিদায় নিচ্ছে।

অংশুমান রায়, স্বপ্না চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তীদের মত কিছু লোক যাঁরা ঝুমুর শিল্পী হিসেবে পরিচিতি নিয়েছিলেন এবং একধরনের অদ্ভুত গানকে ঝুমুর বলে চালাচ্ছিলেন সত্যিকারের ঝুমুর শিল্পীদের আবির্ভাবের ফলে তাঁরাও বিদায় নিয়েছেন। ঝুমুরদেশের মানুষের রক্তের মধ্যেই যেন মিশেআছে ঝুমুরের সুর। ◻

সুনীল মাহাত

ফটো : সংগৃহীত

আমাশয় সারে ঠিকমত চিকিৎসা করালে

এনটামিবা হিস্টোলাইটিকা এখন ঘরে ঘরে এসে গেছে প্রবল প্রতাপে। অণুকে দেখা যায় না, এখন আবার সানাইয়ের পোঁ পরমাণু জুটেছে সংগে, কল্যাণে ব্যবহার করলে ঠিক আছে। কিন্তু অকল্যাণের জন্য তোড়জোড় চলছে দেখে বিশ্বজুড়ে ধুন্ধুমার কান্ড। কিন্তু পরমাণুকেও হার মানাচ্ছে ওই এনটামিবা হিস্টোলাইটিকা, মানে আমাশয় সৃষ্টিকারী প্যারাসাইট। চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপিক, কখন জলের সংগে সুড়ুৎ করে শরীরে ঢুকে পড়বে কে জানে! আপনি হাইজিন মানলে, বেশ তো মানুন না, কিন্তু কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা সরকার, কিন্তু তেমনভাবে মানেন না, তবে কাগজে কলমে একেবারে তিলোত্তমা, খুঁত নেই কোনও।

এই তো সেদিনের ব্যাপারটা মনে করুন, খুব তাড়া ছিল জরুরি কাজে। বিড় বিড় করে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে সবে পা বাড়িয়েছেন বাড়ি থেকে, অমনি অমোঘ ডাক এলো পেট থেকে। শুধু সবার অলক্ষ্যে কুঁইকুঁই করা যন্ত্রণা, ব্যাস হয়ে গেল কাজে যাওয়া, ছুটলেন ল্যাট্রিনে। তারপর যদিও বা বেরোলেন, যেখানেই যান চোরাগোপ্তা বুদ্ধি খাটিয়ে আগে জেনে নিলেন আসল বাঁচ ঘর মানে ল্যাট্রিনটা কোথায় আছে! নইলে কেলেংকারী হয়ে যাবে যে! সারা ভারতে আমাশার রূপকথা তো লেখাই আছে, বাংলায় বারো মাসে ষোল পার্বণের মতো এনাদের রমরমা বেশি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করুন, দশে সাত জনের বয়স ঠাউর করতে পারবেন না। কেমন রোগা রোগা বেতালো শরীর, হাতের ওপর নদী শাখা নদীর মতো শিরা, গেঁটো খসখসে আঙুল, আর মুখ বড়ো কচি কচি, বয়সের জল সরেছে, টেরটিও পাবেন না। দুটো ভালো কথা বলতে যান, দাঁত ছিরকুটে রাজ্যের বিরক্তি প্রকাশ করবেন। ঘরে যান, দেখবেন স্বামীর মেজাজের জন্য স্ত্রীর ব্যাজার মুখ। ঘরে সারাদিনই চলছে চারা মাছের সংগে কাঁচকলার ডবগা ঝোল, কি বাহার তার – উফ, কদ্দিন আর গেলা যায় বাবা! কিন্তু উপায় নেই – কত্তা রাতদিন পুচ পুচ করে হাঁসের মতো ছ্যারাচ্ছে – অম্বলে বুক ধড়ফড় নইলে মাথা ধরেছে, সংগে শব্দকল্পদ্রুম, ঢাই ঢাই করে বায়ু সরছে নিম্নগামী নইলে কাতলা মাছের মত হাঁ করে ঊর্ধ্বগামী মেঘের গর্জন চলছে চলবে। সেদিন প্রতিবেশীর বাড়িতে গেছলেন, উপায় নেই দেখে স্বামী মহারাজ ছাড়লেন বিকট বিশেষত্বময় ধ্বনি। মেয়েরা দেয়ালের ননীচোর কেষ্টর দিকে তাকিয়ে হাসি চাপলেন। পুরুষরা প্রসংগ বদলে সামাল দিলেন পরিবেশ। আপনি মনে মনে বললেন, কি অসভ্য ভাই। এমনিভাবেই শতকে দশক রেখে ভুগে ভুগে জেরবার হয়ে অসভ্য হয়ে যাচ্ছে মানুষ। তবে ভাববেন না সুরাহা করতে এনটামিবা হিস্টোলাইটিকা নিয়ে লড়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা। রাশিয়ার বিজ্ঞানী লোশ প্রথম মল থেকে এই পরভোজীটির সন্ধান দিলেন। ১৮৮৩ সালে কক ইজিপ্টে কলেরা জার্মের সংগে এনটামিবার 'প্রেজেন্ট ম্যার' চেনালেন, তার সংগে আর এক দোসর ই কোলাইকেও ধরে ফেললেন। ফলে মানুষের পরভোজীদের বাড়তি সংখ্যা নিদ্রাহরণ করল। ১৮৮৭ সালে কার্তুলিস লিভারের পুঁজ থেকে দেখালেন সেখানেও এনটামিবা। ১৮৯০ সালে অসলার তার বালটিমোরের লোকেদের মলে আমাশার পরভোজীদের দেখতে পেলেন। কিন্তু কাউনসিলম্যান ও ল্যাফলিফ্যুর যত্ন করে আমাশয় (Amebiosis) নামটা দিলেন সংগে ইপিকাকুহানা ওষুধের নামটি বাতলে স্মরণীয় হয়ে রইলেন। ১৯০২ সালে রোগার্স ভারতবর্ষের মানুষদের ওপর নিরীক্ষা চালিয়ে বললেন, ইপিকাকুহানা অন্ত্র ও যকৃতের আমাশার জন্য অব্যর্থ ওষুধ। আবার একই রোগার্গ ১৯০৬ সালে ভিন্ন সুরে গান গাইলেন। বললেন, এ্যাসপিরিন ট্যাবলেট আর ইপিকাকুহানা বেশি মাত্রায় খেলে নাকি যকৃতে পুঁজ হয় আমাশয়ের দরুন (Liver Abscess)। সতিই নাছোড়বান্দা ছিলেন রোগার্স, ১৯১২ সালে ইপিকাকুহানা থেকে তৈরি করলেন এমিটিন ইঞ্জেকশন।

এবার এনটামিবার কার্যকলাপ দেখুন, Cyst আকারে জল বা খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে ঢুকল, বেশ বাবা, পরের দিন মলের সংগে বেরিয়ে যা – না তা হবার নয়। বৃহৎ অন্ত্রে ৮-১০ দিন ধরে বংশ বিস্তারের সংগে সাবমিউকাস স্তর খুঁড়ে ঘা করে ফেলবে। এরকম অজস্র ঘা বা ক্ষত করার দরুন হজমের জন্য মিউকাস স্তর কমে গেল। শিশুর মায়েরা বলেন, বাচ্চার মলের সংগে সর্দি বেরুচ্ছে বা আপনারা বলেন আম পড়ছে, যে যেভাবেই বলুন না কেন, হড়হড়ে পদার্থটি হল আপনার অন্ত্রের মিউকাস লেয়ার। এখানে ক্ষতি করেও ওরা চুপ থাকবে না, রক্তের গাড়ি চেপে যাবে লিভার বা যকৃতে, ফলে যকৃৎ বেড়ে যেতে পারে। এর নাম অ্যামিবিক হেপাটাইটিস। সুচিকিৎসা হলে ভাল, নইলে সবেধন নীলমণি একটা মাত্র যকৃৎকে পচিয়ে পুঁজ সৃষ্টি করে বাঁচাও বলে যন্ত্রণায় ডাকছাড়া। এরপরও রেহাই নেই এনটামিবার সখ হতেই পারে হাওয়া মহলে হাওয়া খাওয়া, অর্থাৎ মস্তিষ্কের কোষে হানা দিয়ে সেখানেও পচন ধরিয়ে একটা কান্ড কারখানা লাগিয়ে ছাড়বে। ফলে বাড়বে মানসিক অস্থিরতা, যন্ত্রণা।

এবার আমাশার কমপ্লিকেশনগুলো একবার শুনিয়ে রাখি। এই এনটামিবার ঘন বসতি বৃহৎ অন্ত্রে। দীর্ঘদিন ধরে অচিকিৎসিত থাকলে খাদ্যনালী অর্থাৎ বৃহৎ অন্ত্র ছ্যাঁদা করে সিক্যাল অঞ্চলে ক্ষত ও পুঁজ সৃষ্টি করতে পারে। যাকে বলে Post Colic Abscess। অ্যামিবিক গ্র্যানুলোমা বা অ্যামিবোমা হতে পারে অর্থাৎ সিক্যাল অঞ্চলে টিউমারের মত শক্ত mass সৃষ্টি করে যা শত সহস্রবার সার্জেনের হাতে ক্রনিক অ্যাপেনডিসাইটিস বলে ভুল হয়েছে। এক্ষেত্রে সিক্যাম মোটা হয়ে যাওয়ার দরুন এই বিভ্রাট এবং অপারেশনের পরেও সেই একই প্রবলেম দেখা গেছে।

ভয়ের ব্যাপারই বটে। এমিটিন ইঞ্জেকশন আবিষ্কারের আগে ২০-৪০ শতাংশ আমাশয় রোগীর ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটত। এমিটিন এদের ধনে-প্রাণে বাঁচিয়েছে – সত্যি ভাল ওষুধ, একেবারে অব্যর্থ। বিশেষ করে অ্যামিবিক হেপাটাইটিস ও আবসেস হয়েছে যাদের। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই ইঞ্জেকশন নেওয়া উচিত নয়, সংগে সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। কুর্চি গাছের ছাল দিয়ে চিকিৎসা একসময় শুরু হয়েছিল। কিন্তু দুটো শিশুর মৃত্যু ওষুধটাকে তেমন লাই পেতে দেয়নি। ডি হাইড্রো এমিটিন ট্যাবলেটও বাজারে পাওয়া যায়। একটা করে ৩ বার ৭ দিন খেলে ভালো ফল। এন্টেরোকুনল বা এনাপেক বা এনটাকন আগে ভীষণ চলত কিন্তু একমাত্র ভারত আর দু-একটা দেশ বাদে বিশ্বের সমস্ত দেশে এর ব্যবহার Toxicity-র জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভারতে Toxicity-র তেমন রিপোর্ট নেই বলে মুড়িমুড়কির মত চলছে। হরদম কিনছে মানুষ, সঠিক ডোজের মাত্রা না জেনে, দু একদিন খাচ্ছে।

মেট্রোনিডাজোল (ফ্ল্যাজিল, মেট্রোজিল, এনটামিজোল ইত্যাদি) ৪০০ মিলিগ্রাম করে দিনে ৩ বার ৭ দিন খেলে অন্ত্রের সংগে লিভারের অ্যাটাকও যাবে। আমাশার ওষুধের সংগে তিন থেকে ৫ দিন সালফা বা টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় ওষুধ খাবেন। হিস্টোলাইটিকার সংগে অন্ত্রের অন্যান্য জীবাণুদের সখ্যতার কারণে আমাশা নিধনে বাধা দেয়। ঘি, পনির, মদ খাবেন না। টাটকা চারা মাছের ঝোল ভাত খান। দেখবেন ভালো হয়ে যাবেন। □

ডাঃ আশিস মন্ডল

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই



ফটো : এ বি সম-এর সৌজন্যে

'যন্ত্র' যে কী নির্মোহ দাপটে 'কণ্ঠ'কে ম্লান করে দিতে পারে – সেদিন সে অভিজ্ঞতাই হল কলামন্দিরে এক অভিনব অনুষ্ঠানে। দাপট যখন, 'যন্ত্রী'র কৃতিত্ব তো আছেই, কিন্তু তা আরও স্পষ্টব্যঞ্জক হয়ে ওঠে 'কণ্ঠী'দের নিরুত্তাপ বর্ণহীন পরিবেশনে। আয়োজক ছিলেন এশিয়ান পেন্টস। সংগঠনে ক্যালকাটা ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন। উপলক্ষ : শিরোমণি পুরস্কার। পরপর দুদিনের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার প্রথম দিনটিতে ছিল রবীন্দ্রসংগীত-সরোদের যুগলবন্দী। কিন্তু আমজাদ আলি খাঁর টংকারের সংগে টক্কর দেবার মত কেউই ছিলেন না সেদিন। অবশ্য সুচিত্রা মিত্র ছিলেন – ছিলেন মঞ্চে তাঁর উপস্থিতির গরিমা নিয়েই। কিন্তু এও তো ঠিক – তাঁর রোদে টান টান শরতের নিকিয়ে নেওয়া উঠোনের মত গলায় এখন শেষ বিকেলের ছায়া। আর এককভাবে সুচিত্রা কয়েক ক্ষেত্রে গেয়েছেন তো দু-এক কলি, কিন্তু তাঁর সহশিল্পীরা সেই উচ্চতায় পৌঁছলেন কোথায় যা আমজাদের লালিত্যের সংগে মিশে এক অন্বয়ী নিটোলতার জন্ম দিতে পারে!

শুরুতে আমজাদের বিনম্র স্বীকৃতি রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে আগে তাঁর সেরকম কোন ধারণাই ছিল না। কিন্তু এখন যত দেখছেন রবীন্দ্রনাথের সংগীত সৃষ্টির ঐশ্বর্যে তিনি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান গুরুদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'কবিতার সহচর সংগীতকে শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া।' ঐতিহ্যনিষ্ঠ শাস্ত্রীয় ঘরানার প্রতিভূ হলেও আমজাদ কী সাবলীল নৈপুণ্যেই না ছুঁলেন সেই মেল-বন্ধনের নন্দন-স্তর। সুচিত্রা ও তাঁর সঙ্গিনীরা গাইলেন আর আমজাদ তাকে মূর্ত করলেন সরোদে, ছড়িয়ে দিলেন বিস্তারে। না, শাস্ত্রীয় নিগড়ের শুদ্ধ মৌল বিস্তার নয় – বরং রবীন্দ্র-সৃষ্টির পথ বেয়ে সেই গানের ধ্রুপদী আদলের উধাও বিহার। তারপর ফিরে এসে গানের মুখড়াটি ধরিয়ে দিলেন গায়িকাদের। এতে কোথায় শুদ্ধ ধা'র ব্যবহারে সূক্ষ্ম ব্যত্যয় ঘটেছে, কোথায় আরোহণে শুদ্ধ নি'র আকাঙ্ক্ষা, কেনই বা অবরোহণে কোমল নি'তে প্রশান্তি – সে বিচারের ভার সূক্ষ্ম ভাবুক রসজ্ঞের। আমাদের পাওনা আঙুলের টানে প্রাণের উচ্ছ্বাস – যার ঘাটতি ছিল না কোথাও।

প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরী পূরবীর বিষণ্ণতা ঝরে পড়ল 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা'য়। শুধু আমজাদই জানিয়ে দিলেন 'অন্তরে জাগিছে অন্তরযামী', নইলে সুমিত্রার গায়ন দৈন্যতায় সে বার্তা চাপাই থাকত। সুচিত্রা ধরলেন 'কোন খেলা যে খেলব কখন' বা 'আর নাইরে বেলা' – কিন্তু কণ্ঠ-অরণ্যে হারিয়ে গেল সে পেলব লাবণ্য। মঞ্চে পুতুল – পুতুল উপস্থিতির সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায় গাইলেন – 'আকাশ জুড়ে শুনিনু'। কেন যে গাইলেন, 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' – রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদী তালের ভৈরবী-ভিত্তিক এই গান – আমজাদের কথায়, 'এক্স্ট্যাসি অব হিজ মুজিক্যাল থট'। বিমোহন নৈপুণ্যে তাঁর যন্ত্রে আমজাদ তা ফুটিয়ে তুললেন তাই, নইলে সুমিত্রা রায়ের জোলো যান্ত্রিক পরিবেশনায় সাধারণ শ্রোতাদের কি তা বোঝার উপায় ছিল। তবুও কণ্ঠশিল্পীদের মধ্যে একজনের প্রশংসা করতেই হয়। তিনি রমা মণ্ডল। সুচিত্রার ছিন্ন পর্ব নিটোলতার সংগে সরোদীয় কর্তৃত্বের পাশে একমাত্র রমাই ছিলেন মানানসই। ফলে তাঁর গাওয়া 'ওগো শোন কে বাজায়' ও 'ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে' যুগলবন্দীতে কিছুটা বাঞ্ছিত মাত্রা যোগ করতে পেরেছিল। দিনের শেষ নিবেদন 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ'। প্রতিভা যে দীপ্ত উচ্ছ্বাসে কোন ধারাতেই প্রকাশমান – শেষের শুরুতে এই সহজ সত্য আবার বুঝিয়ে দিলেন আমজাদ।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে ছিল রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে নৃত্য। গানে সুদেষ্ণা মুখোপাধ্যায় ছাড়া আগের দিনের আর সব শিল্পীরাই ছিলেন। আর ছিলেন পূর্বা দাম ও অর্ঘ্য সেন। নাচে সংযুক্তা পাণিগ্রাহী (ওড়িশি), চিত্রা বিশ্বেশরণ (ভরত নাট্যম) ও মালবিকা মিত্র (কথক)। সংযুক্তা সেই স্তরের শিল্পী নাচ যাঁর কাছে শুধু ধারাবাহী বিন্যাসের অনুশীলিত সঞ্চালন মাত্র নয়, অভিব্যক্তির সৌকুমার্য, বিভঙ্গের স্বাচ্ছন্দ্য ও নৃত্যের সহজ সৌন্দর্যের ফলে তা সব সময়ই একটা বাড়তি আবেদনে ভরা থাকে। 'দে তোরা আমায়', 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে', 'রোদনভরা এ বসন্ত' – এসবের ভাব-ছন্দের ভিন্নতা তাঁর বর্ণময় পরিবেশনে যেন 'শরীরী' হয়ে ওঠে। 'প্রথম আদি তব শক্তি' গানের সংগে মালবিকার নাচ দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। দৃষ্টিনন্দন ছিল তাঁর পরিবেশনা। তাঁর প্রকরণগত দক্ষতাও দৃষ্টি এড়াবার নয়। সবচেয়ে সার্থক লাগে 'ঝুলন' কবিতার সংগে তাঁর নাচ। সুচিত্রার ঝকঝকে আবৃত্তি মালবিকার কাজকে আরও সহজ করে তোলে। চিত্রা বিশ্বেশরণের নৃত্য স্বাচ্ছন্দ্যে দীর্ঘ রেওয়াজের নিঃসংশয় ছাপ আছে। 'গহন

কুসুম কুঞ্জ মাঝে' তিনি অনবদ্য। কিন্তু 'তিমির অবগুণ্ঠনে' কোথায় যেন পরিস্ফুটনের খামতি থাকে। সবশেষে 'নৃত্যের তালে তালে' তিন শিল্পীর সম্মেলক নৃত্য। তিন ভিন্ন নৃত্য ধারা আপন বৈশিষ্ট্যে নিষ্ঠ থেকেও মেলে ধরবে এক সমন্বয়ী মাত্রা – এক্ষেত্রে এমনটিই ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু তা আর পূরণ হল কই! এই অনুষ্ঠানের পর সংযুক্তা, চিত্রা ও মালবিকা আলাদাভাবে ওড়িশি, ভরতনাট্যম ও কত্থক পরিবেশন করেন। সুরদাসের এক ভজনের সংগে নেচে উৎসবের সমাপ্তি টানেন মালবিকা। পূর্বা ও অর্ঘ্যর সংযোজন আগের দিনের তুলনায় গানকে সুখশ্রাব্য করেছে। আর দু'দিনের যন্ত্রশিল্পীদের সহযোগিতার সপ্রশংস উল্লেখ না করলে প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। □

সাধন ভাদুড়ী

পি এ ডি'র আলোকচিত্র প্রদর্শনী

শাটার টিপলেই ছবি তোলা যায়। কিন্তু ভাল ছবি তুলতে গেলে শুধু আঙুল নয়, দরকার বুদ্ধি ও মনন। শুধুমাত্র অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে ছবি তোলা যায় না। দরকার শিক্ষা ও নিবিড় অনুশীলন। ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অব দমদম, সংক্ষেপে 'পি এ ডি' এই সত্য প্রতিষ্ঠা করেছে বিগত চল্লিশ বছরের পরিশ্রমের পর।

গত ১৪ মে থেকে ২১ মে পর্যন্ত আশুতোষ সেন্টিনারি হলে প্রদর্শিত হল পি এ ডি'র ৩৫ জন ছাত্রের ৮৬টি আলোকচিত্র। প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই কমবেশি বুদ্ধিদীপ্ত, ফটোগ্রাফি নিয়ে শিক্ষিত ভাবনা-চিন্তার ফল। বিশেষ করে উল্লেখ করা উচিত 'হোয়াট এ পিকচার' ছবিটির কথা। সরল আঙ্গিকে এক মজার কম্পোজিশন। আলোকচিত্রীর রসবোধ প্রশংসনীয় যা দর্শকদের নিজস্ব রসবোধকে উস্কে দিতে পারে।

কথায় বলে হাজার শব্দেও যা বোঝান যায় না, একটা মাত্র ছবিই তা প্রকাশ করতে পারে। এই মাধ্যম নাকি দর্শক ও চিত্রীর মধ্যে দ্রুত এক প্রত্যক্ষ সহযোগ তৈরি করতে পারে। তাই যদি সত্যি হয় তবে 'ডার্করুম কায়দা' দিয়ে ছবির সরলতাকে নষ্ট করা কেন? অতি কথনের মতই এইসব কায়দা-কানুন ছবিকে সূক্ষ্মতার বদলে অনেকাংশে ভোঁতা করে দেয়। একটি আলোকচিত্রের প্রাণ অন্তর্নিহিত থাকে তার বিষয়গত বিশালতার মধ্যে, আঙ্গিকের কলা-কৌশলে নয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আলোকচিত্রের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে না। হবে, তবে তা যেন ছবির বিপুল প্রাণশক্তিকে ভারাক্রান্ত না করে। প্রদর্শনীর এই পর্যায়ের ছবির মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম সন্দীপ বসাকের 'রিদিম' ছবিটি – যা এক কথায় দৃষ্টিনন্দন।

ভাল লাগা ছবির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ্য ভাস্কর ঘোষের লিভিং স্কালপচার। অব-বিট অ্যাংগেলে তোলা ছবিটির কম্পোজিশন এক জীবন্ত শরীরকে প্রায় ভাস্কর্যের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। অভিজিৎ সাহার 'অ্যাট রেস্ট' ছবিটিও উল্লেখ্য। শান্ত নদীর পাড়ে গুটিকয় নৌকো যেন শুয়ে আছে বিশ্রামরত ভঙ্গিমায় অবশ্যই ভাল ছবি।

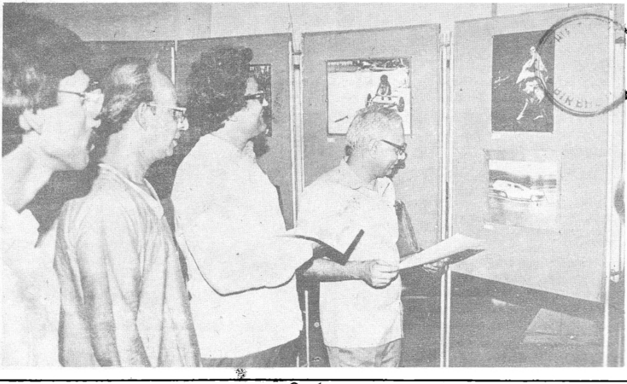
প্রখ্যাত আলোকচিত্রী বেণু সেনের আটটি ছবির প্রত্যেকটিই সরলতায় উজ্জ্বল। ছবিতে অহেতুক কোন টেকনিকাল গিমিক নেই। উল্লেখ্য ছবি 'ইনভাইটেশন'। সমুদ্রের আছড়ে পড়া ঢেউ যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে তীরে পড়ে থাকা তিনটি নির্জন নৌকোকে। টপ অ্যাংগেল থেকে তোলা ছবিটি প্রায় নির্জন কোন কবিতা। অনুভূতিপ্রবণ দর্শককে এই ছবির বিশালতা স্পর্শ করবেই।

কমিউনিস্ট পরিবার ও রক্তের অক্ষরে

গত ২৩ মে গিরিশ মঞ্চে মঞ্চস্থ হল লাইফ থিয়েটার গ্রুপের 'কমিউনিস্ট পরিবার' ও অর্ণব ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির 'রক্তের অক্ষরে।'

প্রথম নাটক কমিউনিস্ট পরিবার সম্বন্ধে আরো অনেকের মত এই প্রতিবেদকও দ্বিধাগ্রস্ত। নাটকটি কি প্রগতিশীল সাহসী ব্যতিক্রম? নাকি বৃহত্তর কমিউনিস্ট ঐক্য গড়ার অন্তরায় বিষয়টা আগ্নেয়। তাই কোন সিদ্ধান্তে পৌছনোর আগে নাটকের মূল কাহিনীটি জেনে নেওয়া ভাল।

বাবা মহীতোষ কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ সদস্য। মূল্যবোধ টান টান। ঋজু। পার্টির বর্তমান ভোটসর্বস্ব দেউলিয়া রাজনীতির লাইন সম্পর্কে হতাশ। কিছুটা ক্ষুব্ধও। বড় ছেলে নিখিলেশ পার্টির সক্রিয় কর্মী। সদা



নির্বাচিত এম এল এ। আর ছোট ছেলে অনিমেষ সত্তরের দশকের নকশালপন্থী। (যদিও এ ব্যাপারে নাটকে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই, তবুও নাট্যকারের ইঙ্গিত বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।) একদা পাড়াছাড়া অনি যেদিন ঘরে ফিরে এল সেদিনই নির্বাচনে জয়ী হয়ে এম এল এ হল নিখিলেশ। দুই ভাইয়ের দেখা হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সংঘাত শুরু হয় আদর্শের প্রশ্নে। অন্যদিকে দ্বিধাগ্রস্ত মহীতোষ তাঁর বন্ধুর কাছে আক্ষেপ করেন 'পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে চলা কথাটা নতুন নয়। শুধু ব্যাখ্যাটা নিয়েই গোলমাল।' মহীতোষ আজকের নেতৃত্বের কাছে ষাটের দশকের চিন্তায় ডুবে থাকা মানুষ। অনির কাছে নিখিলেশ নীতিভ্রষ্ট সংসদীয় রজনীতির শিকার। নিজের পার্টির হয়ে ঘোষিত শিক্ষানীতির বিরোধিতা করে ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ায়। অনি যখন নিখিলেশকে বলে 'কে ভুল কে ঠিক সেটা সময়ের উপর ছেড়ে দে। তবে আমার মতামত যদি জানতে চাস তো বলি, পুরনো আদর্শকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়েছে, তবে তোদের পথকেও বিকল্প হিসেবে মেনে নিতে পারছি না', তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সত্তরের দশকের আগ্নেয় দিনগুলির বিচ্যুতি সম্বন্ধে সে সচেতন। আবার অন্য দিকে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় লাইনকেও মেনে নিতে পারছে না। তবে নাট্যকার যদিও শেষ দৃশ্যে বৃহত্তর কমিউনিস্ট ঐক্যের ডাক দিয়েছেন 'নয়া ফ্যাসিবাদ আসছে। এখন দরকার এক হয়ে চলা' তবুও দর্শকদের একাংশের মতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি কটাক্ষ বিরোধী শক্তির 'হাত'কেই শক্তিশালী করবে।

তবুও ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আস্থা যাদের কাছে ঈশ্বরের বিশ্বাসের মত তারা যদি প্রশ্নহীন আনুগত্যের বর্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন তবে হয়তো ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার অ-কমিউনিস্ট সুলভ বিচ্যুতিগুলি মুছে ফেলা সম্ভব।

এই প্রযোজনার প্রায় সব অভিনেতা অভিনেত্রীই ভালো অভিনয় করেছেন। তবে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয় শংকর দাস ও শ্রাবণী বকসীর নাম।

সময়োচিত এই বিতর্কিত বিষয়ের উপস্থাপনার জন্য নাট্যকার ও পরিচালক বিজয় ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় নাটক অর্ণব ফাইন আর্টস অ্যাকাডেমির 'রক্তের অক্ষরে' সম্পর্কে বেশি কিছু বলার নেই। নাটকের বিষয়বস্তু মুখের ভাষার মর্যাদা ও অধিকার বজায় রাখার সংগ্রাম। এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য নাট্যকার ও পরিচালককে ধন্যবাদ। □

সৌগত রায় বর্মন

'তোমারি নাম বলবো'

মধ্য কলকাতার যুব সংঘ সম্প্রতি এক মনোজ্ঞ সন্ধ্যা উপহার দিলেন পূর্ব রেলের নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা।

এইদিন সন্ধ্যার মুখ্য অতিথি তারক মিত্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানান স্বরচিত কবিতায়। 'পাগলা দাশু' নামে খ্যাত এই কবি পাঠ করলেন 'জন্মদিনের কবি/আপন ছন্দে মেতে ওঠে/জানায় প্রভাত রবি/ জোড়াসাঁকোর বাড়ি/শুনতে ভালো লাগে। পরে সমবেত সংগীত 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে'।

পরে বিনু দে, মঙ্গল দত্ত, কমল দত্ত, প্রশান্ত দত্ত কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন। এর মধ্যে প্রথমজনের 'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি' সুখশ্রাব্য।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের কয়েকটি গান ও সেই সংগে নাচ পরিবেশিত হয়। শুনতে ভালো লাগে 'কত দিন দেখিনি তোমায়' ও 'প্রিয় যাই যাই বোলো না'।

সুকুমার ভৌমিকের হাস্যকৌতুক মনোগ্রাহী। তবে কল্যাণ মিত্র প্রযোজিত, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'একটি অবাস্তব গল্প' নাটক মঞ্চস্থ করার আগে অনুশীলনের দরকার ছিল। কারণ, যত্ন, রুচির ছাপ দর্শকেরা আশা করতে পারেন নিশ্চয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন স্থানীয় পুরপিতা প্রদীপ ঘোষ।

দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়

গল্পপত্র প্রকাশের আনুষ্ঠানিক সভা

সিদ্ধির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন বিমল কর। তিনি যা চেয়েছেন মোটামুটি তাই পেয়েছেন দীর্ঘ চার দশকের সাহিত্য রচনায়। কিন্তু তবু কোথায় যেন অতৃপ্তি বুকের অগোচরে থেকে গিয়েছিল এই দীর্ঘকাল। প্রাতিষ্ঠানিক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি বুঝেছেন, কিছু কিছু জায়গায় আপস করতেই হয় অনিচ্ছাতেই, আর তার ফলে এমন কিছু লেখা যোগ্যতার বিচারে উত্তীর্ণ হয়েও প্রকাশের ছাড়পত্র পায় না। কিন্তু হতাশা, বেদনার বাষ্প স্বতঃই জন্ম নেয়, যা থেকে অতৃপ্তি নিজেই তার প্রেক্ষাপট ছড়িয়ে দেয়।

এ কারণে সাহিত্যসেবার মাধ্যমে বিমল কর বার বার বিদ্রোহী হতে চেয়েছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের বাইরে এমন এক প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছেন, যেখানে গল্প ছাপার প্রথম শর্ত হবে যোগ্যতা।

পাঁচমিশেলি, বত্রিশভাজা পত্রপত্রিকা সেই দায় যে বহন করবে না এটা স্বাভাবিক। তাই বিমল করের চোখে স্বপ্ন ছিল শুধুমাত্র ছোটগল্পের একটি কাগজ করা।

এই স্বপ্নের বাস্তব রূপ প্রথম দেখা গিয়েছিল 'ছোট গল্প নতুন রীতি' পত্রিকা প্রকাশে। অর্জুনের মত সামনে আমাদের শিখণ্ডী রেখে বিমল কর গাণ্ডীবে টংকার দিয়েছিলেন, কিন্তু তার সময়সীমা ছিল স্বল্পায়ু। পাঁচটা সংখ্যার বেশি 'ছোট গল্প নতুন রীতি' প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এই পাঁচটি সংখ্যাই বুঝিয়ে দিয়েছিল ছোটগল্পের ভিত্তিভূমি। এরপর দীর্ঘকাল ব্যর্থতা বুকে নিয়ে বিমল কর নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন সাহিত্য রচনায়। মাঝে কিছুদিনের জন্য অন্য এক প্রকাশকের বকলমে একটি পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন। সেখানেও খুব বেশিদিন বিমল কর টিকতে পারেননি।

আবার ছেদ পড়ল। কিন্তু যন্ত্রণাটা ভেতরে তেমনিই ছিল। যন্ত্রণা ছিল বলেই বিমল কর আবার এগিয়ে গেলেন আর একটি গল্পের কাগজের জন্ম দিতে। এবারও কিন্তু সামনে সেই শিখণ্ডী। বরেন গংগোপাধ্যায় ও অতীন বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'গল্প বিচিত্রা'।

তবু আশা করা গিয়েছিল কাগজটা থাকবে। কিন্তু থাকল না। ব্যবসায়িক ব্যর্থতা, দেখাশোনার লোকের অভাব, অর্থের যোগান তিন দিক দিয়েই কাগজটি কয়েক সংখ্যা বেরিয়ে রক্তাল্পতায় ভুগে চিরনিদ্রায় চলে পড়ল।

এবার বোধহয় তা নয়। অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল বিমল কর শুরু করলেন 'গল্পপত্র'। শিখণ্ডী রেখে নয়। অর্জুন নিজেই সামনে এলেন। সম্পাদক বিমল কর। গল্পপত্র প্রকাশিত হল আনুষ্ঠানিকভাবে।

গল্পপত্রের আত্মপ্রকাশ নিয়ে মহাবোধি সোসাইটি হলে প্রকাশক গৌরাংগপ্রসাদ ঘোষের (যোগমায়া প্রকাশনী) তত্ত্বাবধানে ২৯ তারিখ একটি সভার আয়োজন হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিমল কর। বাংলা ছোটগল্পের অনেক 'তরুণ বন্ধু' ও তরুণতর গল্পকাররা পত্রিকাটিকে স্বাগত জানান।

এই সভায় বক্তব্য রাখেন বরেন গংগোপাধ্যায়, দিবেন্দু পালিত ও সম্পাদক বিমল কর। বিমল কর তাঁর বক্তব্যে বলেন, ষাটোত্তীর্ণ বয়সে এই তাঁর শেষ প্রচেষ্টা। যদিও তাঁর এই বক্তব্যের সংগে একমত নই। কোন শেষই শেষ নয়। আমার মতে অন্য এক শুরুর আহ্বান। তাই শুরুতেই এই দ্বিমাসিক গল্পপত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করি। আশা করি, সকলের সহযোগিতায় বিমল করের শেষ প্রচেষ্টা বাংলা সাহিত্যে অনিঃশেষ হয়ে থাকবে। □

অজয় দাশগুপ্ত



লড়াই



হিন্দি ছবির নায়িকাদের ইঁদুর দৌড়ে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্থানটি ডিম্পলের। ওঁর থেকে কয়েক হাত এগিয়ে শ্রীদেবী। পয়লা নম্বর আসনটি যে শ্রীদেবীর দখলে তাতে সন্দেহ নেই। তবে এক নম্বরে পৌঁছনোর জন্য ডিম্পল যেভাবে দাঁত-মুখ চেপে দৌড়চ্ছেন তাতে শ্রীদেবীর যথেষ্ট শঙ্কিত হবারই কথা। বোম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির খবরাখবর অনুযায়ী শ্রীদেবী ও ডিম্পল দুজনেই চূড়ান্ত প্রোফেশনালিজিমে বিশ্বাসী। ঘড়ি ধরে শুটিংয়ে আসা, পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী ঘাম ঝরিয়ে অভিনয় করা এবং প্রাপ্য পারিশ্রমিক কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করা – এর সবেতেই দুজনার ভেতরে এক অদ্ভুত মিল। দুজনে আবার পরস্পরের শক্ত প্রতিযোগীও বটে। 'মিঃ ইন্ডিয়া' এবং 'নাগিনা' সুপারহিট হবার পর শ্রীদেবী ওঁর এক নম্বর আসনের চারপাশে শক্তপোক্ত দেওয়াল দিতে পেরেছেন। শ্রীদেবীর মতন ডিম্পলও 'ইনসাফ', 'কর্জ' এইসব ছবি করার পর পার্মানেন্ট সাফল্যের মুখ দেখেছেন। শ্রীদেবীর পরই বাজার দর বেঁধে ফেলতে পেরেছেন। পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা এমনই যে, 'শেরনী'-তে ডাকাত রানীর চরিত্রে শ্রীদেবী অভিনয় করলেন তো ডিম্পলও 'কালীগংগা' ছবিতে ডাকাতরানীর অফারটা লুফে নিলেন। দুজনার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের কড়াই ক্রমশই তেতে উঠছে।



ঠান্ডা গরম

প্রবল বর্ষায় কলকাতা জল থৈ-থৈ, পথচারীরা নাজেহাল, তখন পাইকপাড়ার 'মল্লিকবাগান স্পোর্টিং ক্লাব'-এর কর্মকর্তাদের মাথায় হাত। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থে জলসার আয়োজন করেছে ক্লাব। কিন্তু যা বৃষ্টি তাতে শতাব্দী রায়, বিপ্লব চ্যাটার্জি, সুব্রত ভট্টাচার্য (খেলোয়াড়), শক্তি ঠাকুর এলে হয়! প্রচণ্ড উৎকণ্ঠায় আয়োজকদের কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ প্রায়। এমনি অবস্থায় ঠিক সময়েই শিল্পীরা সদলবলে অনুষ্ঠানে এসে হাজির। আয়োজকদের মুখে হাসি ফুটল, শিল্পীদের গরমাগরম চা জুটল। ঠান্ডা-গরমে জমে উঠল আসর।

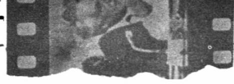


ফটো : সুমিত দাস

সীতার শেষ, দ্রৌপদীর দিন



দূরদর্শনের প্রাইম টাইম, তাও আবার কিনা রোববারের সকালের আধ ঘণ্টা দেশসুদ্ধ লোকের মনটা কেড়ে নিয়ে দেড় বছরের কাছাকাছি দাপটে রাজত্ব করে যাওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। আর মাসখানেকের ভেতরেই সীতা অর্থাৎ দীপিকার এই রাজপাট শেষ হচ্ছে। শুরু হচ্ছে আরেক নারীর রাজত্বের দিন, দ্রৌপদীবেশী জুহি চাওলার। আগস্ট থেকে প্রতি রোববার সকাল সাড়ে নটার স্লটে রামায়ণের বদলে মহাভারত দেখানো শুরু হবে। দীপিকা সীতার চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ যখন পেয়েছিলেন, তখন ওঁর পরিচিতি বলতে 'চীখ' নামের হরার গোছের একটি হিন্দি ছবি এবং কিছু বিজ্ঞাপন ছবি। রামায়ণের নির্মাতা রামানন্দ সাগরই দীপিকাকে ব্যাপক পরিচিতির সুযোগটা পাইয়ে দেন। 'মহাভারত'-এর দ্রৌপদীরূপী জুহি চাওলার ভাগ্য দীপিকার মতনই। নাসির হুসেনের 'ক্যায়ামত সে ক্যায়ামত তক' ছবিটিই জুহির এ অব্দি একমাত্র রিলিজ হওয়া ছবি। '৮৩-র 'মিস ইন্ডিয়া' জুহি সাবান, জামাকাপড়ের নামী মডেল। মহাভারতের নির্মাতা বি আর চোপড়ার চার আঙুল ধরে আসা মেয়েটি তা বছর দুয়েক ভারত শাসন তো করবেনই। □



সুপ্ত

যৎ কিঞ্চিৎ



পৃথিবীতে পাকিস্তানই সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক।

রাজীব গান্ধী



এই দাবি (গোর্খাল্যান্ড) অযৌক্তিক হতে পারে, প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে, এমনকি এই দাবি ভারতের ক্ষতিও করতে পারে। কিন্তু একে আমি কখনই দেশবিরোধী বলতে পারব না।

জ্যোতি বসু



আমি জ্যোতি বসুর শাসনের চেয়ে নরবাহাদুর ভান্ডারির শাসনে অনেক নিরাপদে থাকতে পারব।

সুবাস ঘিসিং



হাতি যেরকম নিজের শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয় সেরকম বহুজন সমাজ পার্টিও নিজের শক্তি এখনও বুঝতে পারেনি। যেদিন পারবে সেদিন গোটা দেশকে গ্রাস করে নেবে।

কাঁসিরাম (এলাহাবাদ উপনির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী জনসভায়)



রাজীব যদি আন্তুলেকে ক্যাবিনেটে নেন তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেটের মর্যাদা বাড়বে।

রাম জেঠমালানি



আমি সারাজীবন অন্যদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। এই প্রথম সুবিচারের আশায় নিজের জন্য লড়াই করছি।

কিরণ বেদি



রাজ্যগুলো ক্রমশই দিল্লির মুঘল দরবারের দাসে পরিণত হয়েছে।

এন টি রামা রাও

পরিবর্তন

সংযুক্ত সম্পাদক : ঊষা ভৌমিক
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

চিফ এগজিকিউটিভ,
বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ :
সি এইচ বসু, কলকাতা
সার্কুলেশন কন্ট্রোলার : প্রসাদ চন্দ্র দত্ত

সম্পাদকীয় দফতর ও রেজি: অফিস :
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২, ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১১৮০, ২৬ ১৬৮১
Telex 021-5092 IPPL-IN

দিল্লি অফিস :
বিশেষ সংবাদদাতা :
প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলী
সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২, ১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০ ০০১, ফোন : ৩৩১-৭০২৪

জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন :
ওয়াই এ শেঠি, দিল্লি
জনসংযোগ অফিসার :
শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, দিল্লি

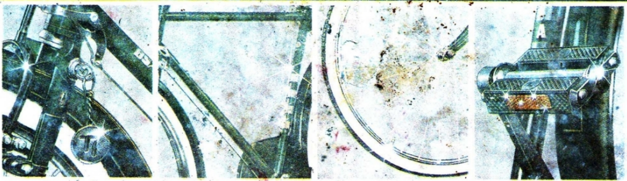
বোম্বাই বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি :
ভি সত্যমূর্তি
বোম্বাই অফিস :
বিশাল বিজনেস সেন্টার, ওয়ারডেন হাউস, দ্বিতল, সার পি এম রোড, ফোর্ট, বোম্বাই-৪০০ ০০১
Gram VIBICENT
Telex 001-5726 AMSL-IN.
ফোন : ২৮-৭২২৯৫, ২৮-৭২৩৩৪, ২৮-৭১৩৩৮

বাঙ্গালোর প্রতিনিধি : সি আর ভরত
১৫৯ এন জি ই এফ কলোনি
রাজামহল বিলাস, এক্সটেনশন II স্টেজ
বাঙ্গালোর-৫৬০ ০২৪
মাদ্রাজ প্রতিনিধি : পি এস রামমূর্তি
৩৭ পেরুমল স্ট্রিট, পুরসাওয়াকম্, ফ্লাওয়ার্স রোড পোস্ট
মাদ্রাজ-৮৪, ফোন : ৬৬-৪৭২১

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯) থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭২ থেকে প্রকাশিত।

[redacted]





1+ ফর্ক লক—অধিক নিরাপত্তার জন্যে

2+ অ্যাক্রিলিক পেণ্ট—বহুদিন ঝকঝকে থাকার জন্যে

3+ সাদা সাইডওয়াল টায়ার—দারুণভাবে আকর্ষণীয়

4+ রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল—রাতে নিরাপদে চলাচলের জন্যে

নিজেই দেখে নিন ঃ

এখন বি এস এ ডিলাক্স-এ যে ৪টি অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা অন্য আর কোনো সাইকেলেই খুঁজে পাবেন না।

১। নতুন ফর্ক লক
সাইকেল লক করার এক একেবারে নতুন উপায়।

২। দেখতে ঝলমলে উজ্জ্বল ক'রে তোলার জন্যে অ্যাক্রিলিক পেণ্ট।

৩। তকতকে মসৃণ সাদা সাইড-ওয়াল টায়ার

৪। রাতে নিরাপদে সফর করার জন্যে অনুপম রিফ্লেক্টর প্যাড্‌ল

তার সঙ্গে
- ক্রোমপ্লেটেড স্পোক্‌স
- ব্রুক স্যাড্‌ল
- ডানলপ রিম
- উন্নত এক ব্রেকিং সিস্টেম

নতুন বিএসএ ডিলাক্স

এর চেয়েও কম কি নিতে চাইবেন?

BSA Deluxe

LINTAS M.BSA D4 2719 Bg